সেরা তাফসির
সেরা মুফাস্‌সির

সংকলন

আবদুস শহীদ নাসিম

সেরা তাফসির সেরা মুফাস্‌সির

গবেষণা প্রবন্ধ সংকলন

সংকলন

আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

সেরা তাফসির সেরা মুফাস্‌সির
গবেষণা প্রবন্ধ সংকলন

ISBN : 978-984-645-081-8
শ. প্র.: ৭৬

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট, ঢাকা- ১২১৭
ফোন: ৮৩১৭৪১০, মোবাইল: ০১৭৫৩৪২২২৯৬
ই-মেইল: shotabdipro@yahoo.com

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০১২ ঈসায়ী

কম্পোজ
মুর্তজা হাসান খালেদ
Saamra Computer

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য: ২০০.০০ টাকা মাত্র

SHERA TAFSIR SHERA MUFASSIR Published by Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217. Bangladesh. Phone : 8317410. Mob.- 01753422296. E-mail : shotabdipro@yahoo.com. First Edition : December 2012.

Price Tk. 200.00 only.

আমাদের কথা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। কুরআন সুন্নাহ্‌র আলোকে ইসলামকে নির্ভুলভাবে উপস্থাপনই এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। ইসলামের উপর অতীত মনীষীগণের অবদান সমূহের অনুবাদ, গবেষণা, গ্রন্থ রচনা, প্রকাশনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, গোলটেবিল বৈঠক মতবিনিময় সভা প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে একাডেমী তার লক্ষ্য হাসিলের প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে।

২০০৫ সাল থেকে একাডেমী গবেষণা স্টাডি বৈঠক নামে একটি গবেষণামূলক বৈঠকের আয়োজন করে আসছে। প্রতিটি বৈঠকে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ, বৈঠকে তাদের আহবান জানানো হয় এবং আলোচ্য বিষয় পূর্বেই জানিয়ে দেয়া হয়।

বিষয়ের উপর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। অংশগ্রহণকারীগণ প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠকে আসেন এবং জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বক্তব্য, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, ক্রস আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রবন্ধের বিষয়বস্তুকে পরিষ্কার করে তুলে ধরা হয়।

এই প্রবন্ধগুলো তথ্যবহুল এবং চিন্তাশীল, জ্ঞানী-গুণী ও বিদগ্ধ পাঠকদের জন্যে আকর্ষণীয়।

প্রবন্ধগুলো পর্যায়ক্রমে আমরা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করছি। এরিমধ্যে 'ইসলামি শরিয়া মুলনীতি বিভ্রান্তি ও সঠিক পথ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ হয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় সেরা মুফাস্‌সিরদের জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করা হয়। প্রবন্ধগুলোর উপর আনুষ্ঠানিক পর্যালোচনা শেষে 'সেরা তাফসির সেরা মুফাস্‌সির' শিরোনামে এখন সেগুলোর সংকলন প্রকাশ করা হচ্ছে।

আশা করি বিদগ্ধ পাঠক সমাজ গ্রন্থটি পাঠে উপকৃত হবেন। আর সে আশা নিয়েই প্রবন্ধগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হলো।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী
ডিসেম্বর ২০১২ ঈসায়ী

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

بسم الله الرحمن الرحيم

তাফসির শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ ও বিশেষজ্ঞ শ্রেণী

আবদুস শহীদ নাসিম

১. সাহাবায়ে কিরাম রা.

সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে নিয়ে সব যুগেই কুরআন মজীদের শিক্ষক ও মুফাসসির হিসেবে এক দল লোক বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে উঠেন। তাঁদের মাধ্যমেই কুরআনি জ্ঞানের প্রবহমান স্রোতস্বিনী অনন্তকালের দিকে বয়ে চলেছে নিরবধি।

সকল যুগেই মুসলিম বিশ্বে কুরআন বিশেষজ্ঞদের গবেষণার ধারা অব্যাহত ছিলো এবং থাকবে। প্রতি যুগেই বিরাট সংখ্যক মুফাসসিরে কুরআন মৌখিকভাবে কুরআন শিক্ষাদানে নিরত ছিলেন এবং বিশেষজ্ঞগণ কুরআনের তাফসির লিখেও গিয়েছেন। এ ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে।

এভাবে সকল যুগেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিরাট সংখ্যক আলিমকে কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শিতা দান করেছেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যাঁরা কুরআনের বিশেষজ্ঞ, মুফাসসির ও তাফসির সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনাকারী ছিলেন, তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হলেন :

১. আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু (প্রথম খলিফা)।
২. উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহু (দ্বিতীয় খলিফা)।
৩. উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু (তৃতীয় খলিফা)।
৪. আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু (চতুর্থ খলিফা)।
৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু।
৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু।
৭. উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু।
৮. যায়িদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু।
৯. আবু মূসা আশয়ারি রাদিয়াল্লাহু আনহু।
১০. আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু।

এ ক'জন ছাড়াও আরো বেশকিছু সংখ্যক সাহাবি থেকে কম-বেশি তাফসির সংক্রান্ত রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন :

১১. আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু।
১২. আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু।
১৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু।
১৪. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু।
১৫. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু।

২. শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী মুফাসসিরগণ

সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের পর তাবেয়ীগণের মধ্যে কুরআন পাকের তাফসিরের ক্ষেত্রে খ্যাতিমান ব্যক্তিগণ সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. তাঁর উসূলুত তাফসিরের মুকাদ্দিমায় লিখেছেন: তাবেয়ীদের মধ্যে সর্বাধিক তাফসির জানতেন মক্কাবাসীরা। কেননা তাঁরা সরাসরি ইবনে আব্বাস রা. থেকে তাফসির শিখেছেন। এদের মধ্যে মশহুর ছিলেন :

১. মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১০৩ হিজরি।
২. আতা ইবনে আবি রাবাহ রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১১৪ হিজরি।
৩. ইকরিমা রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১০৫ হিজরি।
৪. তাউস রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১০৬ হিজরি।
৫. আবুশ্ শা'ছা রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৯৩ হিজরি।
৬. সায়িদ ইবনে জুবায়ের রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৯৫ হিজরি।

কুফাবাসী তাবেয়ীগণ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে তাফসির শিখেছেন। তাঁদের মধ্যে খ্যাতিমান ছিলেন :

৭. আলকামা ইবনে কায়েস রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১০৬ হিজরি।
৮. আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৭৫ হিজরি।
৯. ইবরাহিম নাখয়ী রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৭৫ হিজরি।
১০. আমের আশ শা'বি রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১০৫ হিজরি।
১১. মাসরূক রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৬৩ হিজরি।
১২. মুররা আল হামাদানি রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৭৬ হিজরি।
১৩. হাসান বসরি রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১১০ হিজরি।

এছাড়া মদিনা এবং অন্যান্য স্থানের খ্যাতিমান তাবেয়ী মুফাসসিরগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন:

১৪. যায়িদ ইবনে আসলাম রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১৩৬ হিজরি।
১৫. আবদুর রহমান ইবনে যায়িদ রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১৮২ হিজরি।
১৬. আবদুল্লাহ ইবনে ওহাব রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১৯৯ হিজরি।
১৭. দাহ্হাক ইবনে মুযাহিম রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১০৫ হিজরি।
১৮. কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১১৭ হিজরি।
১৯. আতা ইবনে আবু সালামা খুরাসানি রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১৩৫ হিজরি।
২০. মুহাম্মদ ইবনে কা'ব রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১১৭ হিজরি।
২১. আবুল আলিয়া রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৯০ হিজরি।
২২. আতিয়া আল আওফি রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১১১ হিজরি।
২৩. আবু মালিক রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু
২৪. রবি' ইবনে আনাস রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১৩৯ হিজরি।
২৫. মালিক ইবনে আনাস রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১৭৯ হিজরি।
২৬. আস সুদ্দি আল কবির রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১২৭ হিজরি।

৩. শ্রেষ্ঠ তাবে তাবেয়ীন মুফাসসিরগণ

তাবে তাবেয়ীন মুফাসসিরগণের অধিকাংশই কুরআন পাকের তাফসির লিখে গেছেন। তাঁদের তাফসির মূলত তাবেয়ী এবং সাহাবিগণের বর্ণনার সংকলন। তাঁদের মধ্য থেকে খ্যাতিমান মুফাসসিরগণের নাম উল্লেখ করা হলো :

১. সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১৯৮ হিজরি।
২. ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ্ রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১৯৭ হিজরি।
৩. শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১৬০ হিজরি।
৪. ইয়াযিদ ইবনে হারূন রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১১৭ হিজরি।

৫. আবদুর রাযযাক রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ২১১ হিজরি।
৬. আদাম ইবনে আবু ইয়াস রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ২২০ হিজরি।
৭. ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়হ রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ২৩৭ হিজরি।
৮. রাওহ ইবনে উবাদা রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ২৮৫ হিজরি।
৯. আব্‌দ ইবনে হুমায়েদ রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ২৪৯ হিজরি।
১০. আবু বকর ইবনে আবি শাইবা রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৩৩৫ হিজরি।
১১. মুহাম্মদ ইবনে জারির আত তাবারি রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৩১০ হিজরি।
১২. ইবনে আবি হাতিম রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৩২৭ হিজরি।
১৩. ইবনে মাজাহ রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ২৭৫ হিজরি।
১৪. হাকেম রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৪০৫ হিজরি।
১৫. ইবনে মারদুইয়া রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৪১০ হিজরি।
১৬. ইবনে হিব্বান রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৩৫৪ হিজরি।
১৭. আবু ইসহাক রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৩১০ হিজরি।
১৮. আবু আলী আল ফারেসি রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৩৭৭ হিজরি।
১৯. আবু বকর আন নাক্কাশ রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৩৫১ হিজরি।

সাহাবি, তাবেয়ী এবং তাবে তাবেয়ীগণের মধ্যে এঁরা ছিলেন মশহুর তাফসির বিশারদ। এখানে নাম উল্লেখ হয়নি এরকমও অনেকে ছিলেন। তবে এঁরা ছিলেন খ্যাতিমান। পরবর্তীকালে জন্ম হয়েছে আরো অসংখ্য মুফাসসিরের। এখানে কেবল মুতাকাদ্দিমিন (প্রাচীন) মুফাসসিরগণের নামই উল্লেখ করা হলো।'[১]

৪. তাফসিরুল কুরআনের ক্রমবিকাশ

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যাঁরা তাফসির বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাঁরা কুরআনের কোনো তাফসির গ্রন্থ লিখে যাননি। এ ধরনের রেওয়াজও তখন চালু ছিল না। তবে কোনো কোনো সাহাবি বিচ্ছিন্নভাবে কুরআনের মর্যাদা ও কিছু কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত রসূলুল্লাহ্ সা.-এর বাণী লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

তাবেয়ীগণের অবস্থাও ছিলো প্রায় সাহাবিগণের মতোই। তাঁরা মৌখিকভাবেই কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। তবে তাঁদের কেউ কেউ কুরআন এবং কুরআনের তাফসির সংক্রান্ত বিভিন্ন রেওয়ায়াত (হাদিস) লিপিবদ্ধ করেছেন। তাছাড়া, তাঁরা কুরআনের যেসব ব্যাখ্যা ও তাফসির প্রদান করেছেন, তাঁদের অনেক ছাত্রই সেগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন।

তাবে' তাবেয়ীদের সময় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রন্থাকারে কুরআনের তাফসির লেখা হতে থাকে। অত:পর প্রতি শতাব্দীতেই ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন দেশে তাফসির গ্রন্থ লেখা হয়ে আসছে। এর অধিকাংশই আরবি ভাষায় লিখিত। অবশ্য বিভিন্ন দেশে কিছু কিছু তাফসির স্থানীয় ভাষায়ও লেখা হয়েছে।

বিগত তেরশ বছরব্যাপী রচিত তাফসিরসমূহের মধ্যে অনেকগুলোই বিশ্বব্যপি খ্যাতি অর্জন করেছে। যেমন :

১. সাহাবি, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীন মুফাসসিরগণের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে রাগিব আত তাব্বাখের আস সাকাফাতুল ইসলামিয়া গ্রন্থের সূত্রে।

১. মুহাম্মদ ইবনে জরির আত তাবারির (মৃত্যু ৩১০ হিজরি) আল-জামেউল বায়ান ফী তাফসিরি আয়িল কুরআন (বা তাফসিরে তাবারি)।

২. নসর ইবনে মুহাম্মদ সমরকন্দির (মৃত্যু ৩৭৩ হিজরি) বাহরুল উলুম বা তাফসিরে সমরকন্দি।

৩. আহমদ ইবনে আলী আল জাস্‌সারের (মৃত্যু ৩৮০ হি.) আহকামুল কুরআন।

৪. আহমদ ছা'লাবি নিশাপুরির (মৃত্যু ৪২৭ হিজরি) আল কাশফু ওয়াল বায়ান।

৫. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আন্দালুসির (মৃত্যু ৫৪১ হিজরি) আহকামুল কুরআন বা তাফসিরে ইবনুল আরাবি।

৬. আবদুল হক আন্দালুসির (মৃত্যু ৫৪৬ হি.) আল মুহাররিরুল আযীয ফী তাফসিরিল কিতাবিল আযিম বা তাফসিরে ইবনে আতিয়া।

৭. মুহাম্মদ ইবনে উমর আর রাযির (মৃত্যু ৬০৬ হিজরি) মাফাতিহুল গায়েব বা তাফসিরে কবীর।

৮. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ কুরতবির (মৃত্যু ৬৭১ হিজরি) আল-জামে লি আহকামিল কুরআন বা তাফসিরে কুরতবি।

৯. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর বায়দাবির (মৃত্যু ৬৮৫ হিজরি) তাফসিরে বায়দাবি।

১০. ইমাদুদ্দিন ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসির দিমাস্কির (মৃত্যু ৭৭৪ হি.) তাফসিরুল কুরআনিল আযিম বা তাফসিরে ইবনে কাসির।

১১. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ খাযেন-এর (মৃত্যু ৭৪১ হি.) তাফসিরে খাযেন।

১২. আবদুর রহমান ছা'লাবির (মৃত্যু ৮৭৬ হি.) তাফসিরুল জাওয়াহের।

১৩. জালালুদ্দিন সুয়ূতির (মৃত্যু ৯১১ হি.) আদ্ দুররুল মানছূর ফিত্ তাফসির বিল মাছূর।

১৪. জালালুদ্দিন মাহাল্লি এবং জালালুদ্দিন সুয়ূতির যৌথ রচনা তাফসিরে জালালাইন।

১৫. মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ তাহাবির (মৃত্যু ৯৫২ হি.) তাফসিরে আবিস্ সুউদ।

১৬. শিহাবুদ্দিন মুহাম্মদ আলুসির (মৃত্যু ১২৭০ হি.) রূহুল মা'আনী।

বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে মুসলিম দেশগুলো স্বাধীনতা লাভ করতে শুরু করলেও তার আগের প্রায় দুই শতাব্দী ছিলো বিজাতীয়দের দ্বারা মুসলিম জাতিসমূহের পদানত থাকার যুগ। এ সময় বিভিন্ন মুসলিম দেশকে বৃটিশ ও ফরাসিরা এবং তাদের মানসিক গোলামরা বিভিন্ন মেয়াদে কবজা করে রাখে। এ সময় তারা মুসলিম দেশসমূহে তাদের নিজ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে তাদের ইসলাম বিরোধী কালচার মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়।

বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে যখন মুসলিম দেশগুলো স্বাধীন হতে শুরু করলো তখন দেখা গেলো, প্রতিটি মুসলিম দেশেই আলো আঁধারের খেলা। তিন ধারার কালচার প্রবহমান। সেগুলো হলো :

১. পাশ্চাত্যের পুশ করা ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদী কালচার,

২. ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা মিশ্রিত জগাখিচুড়ি শঙ্কর কালচার এবং

৩. ইসলামি কালচার।

অবশ্য বিশ শতকের প্রথমার্ধেই হিমালয়ান উপমহাদেশে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ., মধ্যপ্রাচ্যে শহীদ হাসানুল বান্না রহ. এবং এশিয়া মাইনরে সাইয়েদ জামালুদ্দিন নুরসি রহ. ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে মজবুত ইসলামি আন্দোলনের সূচনা করেন যা আজ বিশ্বব্যাপী পরিচিত।

৫. আধুনিক কালে লেখা কয়েকটি শ্রেষ্ঠ তাফসির

বিশ শতকে ইসলামের পুনর্জাগরণ শুরু হবার সাথে সাথে অনেকগুলো তাফসিরও রচনা করা হয়। এর কয়েকটি খ্যাতনামা তাফসির হলো :

১. আল মানার (আরবি) মুহাম্মদ রশিদ রেজা রাহেমাহুল্লাহ।
২. তাফসিরে কাসেমি(আরবি) জামালুদ্দিন কাসেমি রাহেমাহুল্লাহ।
৩. তাফসিরুল মারাগি (আরবি) আহমদ মুস্তফা মারাগি রাহেমাহুল্লাহ।
৪. তাফহীমুল কুরআন (উর্দু) সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রাহেমাহুল্লাহ।
৫. ফী যিলালিল কুরআন (আরবি) সাইয়েদ কুতুব রাহেমাহুল্লাহ।
৬. তাফসিরুল ওয়াহেদি (আরবি) মুহাম্মদ মাহমুদ হেজাযি রাহেমাহুল্লাহ।
৭. তাফসিরে জাওহারি (আরবি) তানতাবি জাওহারি।
৮. তাফসিরে ওয়াজেদি (আরবি) ফরিদ ওয়াজেদি রাহেমাহুল্লাহ।
৯. সফওয়াতুল বয়ান (আরবি) হাসনাইন মাখলুফ রাহেমাহুল্লাহ।
১০. ফাতহুল বায়ান (আরবি) সিদ্দিক হাসান খান রাহেমাহুল্লাহ।
১১. বয়ানুল কুরআন (উর্দু) আশরাফ আলী থানবি রাহেমাহুল্লাহ।
১২. তাফসিরে ফারাহি (উর্দু) হামিদুদ্দিন ফারাহি রাহেমাহুল্লাহ।
১৩. মাআরিফুল কুরআন (উর্দু) মুফতি মুহাম্মদ শফী রাহেমাহুল্লাহ।
১৪. তাদ্দাব্বুরে কুরআন (উর্দু) আমিন আহসান ইসলাহী রাহেমাহুল্লাহ।
১৫. আল মিযান (আরবি) তাবাতাবায়ি (শিয়া) রাহেমাহুল্লাহ।
১৬. সাফওয়াতুত তাফাসির (আরবি) মুহাম্মদ আলী আস সাবুনি রাহেমাহুল্লাহ।
১৭. তাফসিরে মাজেদি (উর্দু ও ইংরেজি) আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদি রাহেমাহুল্লাহ।
১৮. তরজমানুল কুরআন (উর্দু) আবুল কালাম আজাদ রাহেমাহুল্লাহ।
১৯. তাফসিরে উসমানি (উর্দু) শাব্বির আহমদ উসমানি রাহেমাহুল্লাহ।

এছাড়াও আরো বহু তাফসির রয়েছে, দীর্ঘায়িত হবার ভয়ে সেগুলোর নাম উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি।

৬. উলূমুল কুরআন ও উসূলুত তাফসির সংক্রান্ত মশহুর গ্রন্থাবলী

১. আল বুরহান ফী উলূমিল কুরআন, বদরুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ যারকাশি।
২. মাওয়াকেউল উলূম মিন মওয়াকিয়িন নুজুম,জালালুদ্দিন আবদুর রহমান।
৩. আত তাহবির ফী উলুমিত তাফসির, জালালুদ্দিন সুয়ূতি।
৪. আল ইতকান ফী উলুমিল কুরআন, জালালুদ্দিন সুয়ূতি।
৫. মুকাদ্দিমা উসুলুত তাফসির, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া।
৬. মানাহিলুল ইরফান, শাইখ আবদুল আযিম যুরকানি।
৭. মাজাযাতুল কুরআন, ইয্য ইবনে আবদুস সালাম।
৮. মুকাদ্দিমাতুত তাফসির, আল্লামা রাগিব ইসফাহানি।
৯. আল ফাওযুল কাবির, শাহ অলিউল্লাহ দেহলবি র.।
১০. ফাদায়েলুল কুরআন, হাফেয ইবনে কাসির।
১১. ই'জাযুল কুরআন, কাযি আবু বকর বাকেল্লানি।

১২. ফুনুনুল আফনান ফী উলুমিল কুরআন।
১৩. আল মুরশিদুল আযিয, আবু শামাহ।
১৪. আল বুরহান ফি মুশকিলাতিল কুরআন, আবুল মায়ালি।
১৫. আত তাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন, ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয যাহাবি।
১৬. আত তিবয়ানু ফী উলুমিল কুরআন, মুহাম্মদ আলী আস সাবূনি।
১৭. মুকাদ্দিমা তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।
১৮. মাবাহিছ ফি উলূমিল কুরআন, মান্না' আল কাত্তান।
১৯. দিরাসাতুন ফী উলুমিল কুরআন, ড. আমের আবদুল আযিয।
২০. উলূমুল কুরআন, মুহাম্মদ তকি উসমানি।

৭. বাংলাদেশে কুরআন চর্চা

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আল্লাহ্‌র কালাম আল কুরআনের ব্যাপক চর্চা তথা কুরআন গবেষণা, অনুবাদ, তাফসির ও কুরআনের শিক্ষা প্রশিক্ষণ চলে আসছে। বাংলা ভাষায় কুরআনের চর্চা হচ্ছে দীর্ঘদিন থেকেই। বাংলাদেশে কুরআনের চর্চা হচ্ছে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়। যেমন :

১. আল কুরআনের পাঠ ও পঠন শিক্ষাদান।
২. তাজবিদের নিয়মানুসারে সহীহভাবে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দান।
৩. হিফযুল কুরআন (স্মৃতিতে কুরআন ধারণ করা)।
৪. বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে কুরআনের অংশবিশেষের অর্থ ও ব্যাখ্যা শিক্ষা দান।
৫. মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাফসিরুল কুরআন শিক্ষাদান।
৬. আল কুরআনের বংগানুবাদ।
৭. বাংলা ভাষায় আল কুরআনের তাফসির লিখন।
৮. আরবি ও উর্দু ভাষায় প্রণীত তাফসির গ্রন্থাবলীর বংগানুবাদ।
৯. উলূমুল কুরআন সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী রচনা।
১০. কুরআন মজিদ থেকে বিষয় ভিত্তিক গ্রন্থ রচনা।
১১. সাধারণ জনগণকে শুনানো ও শিক্ষাদানের জন্যে তাফসিরুল কুরআন মাহফিলের আয়োজন।
১২.পরিবারে, মসজিদে, অফিসে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দরসুল কুরআন অনুষ্ঠানের আয়োজন।
১৩. প্রিন্টিং ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় কুরআনের শিক্ষা ও ব্যাখ্যা প্রচার।

এভাবে বাংলাদেশে আল কুরআনের শিক্ষা ও তাফসিরুল কুরআনের ব্যাপক চর্চা চলছে। কুরআনের শিক্ষা-প্রশিক্ষণে উদ্যোগ নিচ্ছে বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি। কুরআন চর্চা ও তাফসিরুল কুরআনের ইতিহাসে বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের কথা একদিন তাফসীরের বিশ্ব ইতিহাসে লেখা হবে ইনশাআল্লাহ।

❖❖❖

(২)

ইবনু জারীর আত্ তাবারী ও তাফসির আত্ তাবারী

ড.আ.ছ.ম.তরীকুল ইসলাম

ভূমিকা: দীন ইসলাম হলো কালোত্তীর্ণ একমাত্র পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এই জীবন ব্যবস্থার মূল উৎস হলো সর্বশেষ আসমানী কিতাব মহান স্রষ্টার মহান বাণী মহাবিস্ময় আল-কুরআনুল কারীম। এই মহাগ্রন্থ মানব জাতির হিদায়াতের উৎস। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ এই মহাগ্রন্থের অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। এই অলৌকিক কিতাবকে কেন্দ্র করে অসংখ্য অভিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছে। তন্মধ্যে তাফসির অভিজ্ঞান হচ্ছে অন্যতম। মহামহিম আল্লাহর এই বাণী মানুষ যাতে পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করে ধন্য হতে পারে, সেই অভিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই কিতাবের ব্যাখ্যা হিসেবে অসংখ্য তাফসির গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এইসব তাফসির গ্রন্থের মধ্যে তাফসিরুত তাবারী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাফসির চর্চার স্বর্ণযুগ হিজরি তৃতীয় শতকে এই শাস্ত্রের ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী র. বিস্তারিত অথচ মৌলিক তাফসির গ্রন্থটি রচনা করেন। এই নিবন্ধে প্রথমে এই জ্ঞান তাপসের জীবনী ও পরবর্তীতে তাঁর অনবদ্য তাফসির গ্রন্থ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে।

ইবনু জারীর আত্ তাবারী রহ. নাম ও বংশ পরিচয়: তিনি হচ্ছেন আবু জা'ফার মুহাম্মাদ ইবনু জারীর ইবনু ইয়াযীদ ইবনু কাছির ইবনু গালিব আত্ তাবারী রাহিমাহুল্লাহ।[১] তিনি আব্বাসী খলীফা আল-মু'তাসিম বিল্লাহ-এর রাজত্বকালে কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্তী তাবারীস্তানের আমুল শহরে জন্মগ্রহণ করার কারণে তাবারী নামে খ্যাতিলাভ করেন।[২]

জন্মকাল: তিনি ২২০ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন।[৩] ইবনুছ সালাহ রাহিমাহুল্লাহ তার জন্ম সন ২২৪ হিজরি/৮৩৮ খৃঃ বলে উল্লেখ করেছেন।[৪] এই দ্বিতীয় মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য।

শিক্ষা গ্রহণ : তিনি সাত বছর বয়সে আল-কুরআনুল কারীম হিফজ করেন। নয় বছর বয়সে তিনি হাদীছ লেখা শুরু করেন। ১২ বছর বয়সে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে রায় শহরে এবং পরবর্তীতে তদানীন্তন সাংস্কৃতিক রাজধানী বাগদাদ নগরীতে গমন করেন। সেখানকার প্রথিতযশা মনীষীদের নিকট থেকে তিনি তাফসির, হাদিস, ফিকহ, আরবি ভাষা-সাহিত্য, ইতিহাস, উছূলুল ফিক্হ, নাহু-ছরফ প্রভৃতি বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি মূলত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল র. নিকট হাদীছ অধ্যয়নের জন্য বাগদাদে আসেন। তবে দুঃখের বিষয়, তিনি সেখানে পৌছানোর পূর্বেই আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। বাগদাদের পর তিনি

---

১. আল-কিফতী, জামালুদ্দীন, ইনবাউর রুওয়াত 'আলা-আনবাহিন নুহাত, বায়রূত, ১৪২৪ হি. ২খণ্ড ১৪২ পৃ.।
২. আল-আদনারবী, আহমদুবনু মুহাম্মাদ, তাবাকাতুল মুফাসসিরীন, মাদীনাহ, ১৯৯৭খৃ., ৪৭ পৃ.।
৩. আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা', ১৪১৩ হি. বায়রূত ১খৃ. ২৬৭ পৃ.
৪. ইবনুছ ছিলাহ,তাবাকাতুল ফুকাহায়িশ শাফিয়্যাহ, ১৯৯২, বায়রূত ১খৃ. ১০৬ পৃ., ইবনি খাল্লিকান, ওফয়াতুল আ'যান ওয়া আনরাউ আবনায়িয যামান, বায়রূত, তাবি ৪খৃ. ১৯১ পৃ.

অদম্য জ্ঞানপিপাসা নিবারণের জন্যে বসরা, কুফা, খুরাসান, দামিস্ক ও মিসরও ভ্রমণ করেন। তবে তিনি তার শেষ জীবন বাগদাদেই অতিবাহিত করেন।

শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দ : তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী হচ্ছেন আহমাদ ইবনু মানি' (মৃত্যু ২৪৪ হিঃ), আবী কুরায়িব, হান্নাদ ইবনুস সারী (মৃত্যু ২৪৩ হিঃ), ইউনুস ইবনু আব্দিল আ'লা (মৃত্যু ২৪৫ হিঃ)[৫], আল-হাসান ইবনু মুহাম্মাদ আল-জা'ফারানী, আব্দুল হাকীম মুহাম্মাদ, আব্দুর রাহমান, আব্দুল ওয়াহহাব, মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার (মৃত্যু ২৫২ হিঃ), ইবনু দার, মুহাম্মাদ ইবনু মুসান্না র. প্রমুখ। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্র হচ্ছেন- কাজী আবূ বাকর আহমুদুবনু কামিল, আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ আত্ তাবারী, আবূ ইছহাক ইবনু ইবরাহীম আত্ তাবারী, আবুল হাসান আহমাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া, আবূ বাকর আহমাদুবনু মূসা, আবুল কাসিম সুলায়মানুত তাবারানী রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ।[৬]

ইবনু জারীর রাহিমাহুল্লাহ ও ফিক্হ শাস্ত্র : প্রথমদিকে তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের ফিক্হ শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট পণ্ডিত হিসেবে পরিচিতি লাভ করনে। তবে কিছুদিন যেতে না যেতেই তিনি মাযহাবী দৃষ্টিভংগি বর্জন করে মুজতাহিদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি তখন থেকেই সকল মাযহাবের উর্ধ্বে উঠে, যে মতকে আল-কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য মনে করতেন, সেটাকেই অগ্রাধিকার দিতেন। সেই সময়ে ইরাকে হাম্বালী মাযহাবই অনুসৃত হতো। তিনি কোনো বিশেষ মাযহাবকে অনুসরণ না করার কারণে হাম্বালী মাযহাবের অনুসারীদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট নিগৃহীত হন। এর ফলে সকলেই তাকে বর্জন করে এবং তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপবাদ ছড়ানো হয়। এক পর্যায়ে তাকে শিয়া বলেও অভিযুক্ত করা হয়।[৭] আসলে তিনি কখনো শিয়া ছিলেন না। শিয়াদের মধ্যে সে সময়ে আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইবনু জারীর ইবনু রুস্তাম[৮] নামে অন্য এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আমাদের আলোচিত ইবনু জারীর র. ও উক্ত ব্যক্তির নামের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকার কারণেও অনেকেই এই ইবনু জারীরকে শিয়া বলে ধারণা করে থাকেন, যা আসলে ঠিক নয়।

ইবনু জারীর র.-এর রচনাবলী : তাঁর উল্লেখযোগ্য কিতাবসমূহ হচ্ছে :

০১. আল জামি'উল বায়ান আন তা'বিলি আয়িল কুরআন (তাফসিরুত তাবারী)
০২. তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক (তারিখুত তাবারী)
০৩. কিতাবু আদাবিন নাফসিল জায়িদাতি ওয়াল আখলাকিন নাফীসাহ
০৪. ইখতিলাফু 'উলামায়িল আমছার ফি আহকামি শারায়ি'ইল ইসলাম
০৫. ছারিহুস সুন্নাহ
০৬. আল-ফাসলু বায়নাল কিরাআত
০৭. আদাবুল কুদাত
০৮. আদাবুন নুফূস

---

৫. আল-আদনারবী, ৪৭ পৃ.
৬. আল-হাওশান, য়ূসুফুবনু ছামূদ, আল-আছারুল ওয়ারিদাহ আনিস সালাফি ফিল য়াহূদি ফি তাসফিরিত তাবারী, রিয়াদ, ১৪২৪ হি. ১১পৃ.
৭. আয-যাহাবী, ১৪খণ্ড ২৭৭ পৃ.
৮. প্রাগুক্ত, ১৪ খণ্ড ২৭২ পৃ.

০৯. আদাবুল মানাসিক

১০. ফাদাইলু আবী বাকর ওয়া 'উমার রাদিআল্লাহু 'আনহুমা [৯] প্রভৃতি।

তিনি ছিলেন মূলত একজন বিদগ্ধ লেখক। তাঁর সম্পর্কে আলী ইবনু উবাইদিল্লাহিল লুগাবী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন-

"মুহাম্মাদুবনু জারীর রাহিমাহুল্লাহ চল্লিশ বছর পর্যন্ত প্রতিদিন চল্লিশ পৃষ্ঠা করে লিখতেন।"[১০] নিঃসন্দেহে তাঁর এই আন্তরিক অধ্যবসায় তাঁকে ইলমের আকাশে এক উজ্জ্বল তারকার আসনে সমাসীন করেছে।

মৃত্যুবরণ : ইবনু জারীর তাবারী র. ৩১০ হিজরি সন/ ৯২৩ খৃ. জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাগদাদ নগরীতে ইনতিকাল করেন।[১১]

জামি'উল বায়ান 'আন তা'বিলি আয়য়িল কুরআন

جامع البيان عن تأويل آي القرآن **ইবনু** জারীর তাবারী র.-এর একটি অনবদ্য তাফসির গ্রন্থ। এটি সনদ ভিত্তিক তাফসিরের অগ্রদূত ও পথিকৃৎ। তাফসির শাস্ত্রে এই গ্রন্থটি আছার ভিত্তিক সর্বপ্রথম রচিত প্রামাণ্য তাফসির। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মনীষিগণ একে প্রথম যুগের তাফসিরুল মা'ছূর[১২] হিসেবে গণ্য করে থাকেন। বিদগ্ধ মুফাসসির ইবনু জারীর তাবারী র. তাঁর এই অসাধারণ তাফসির গ্রন্থটিকে ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করার পরিকল্পনা তাঁর সাথীদেরকে জানিয়েছিলেন। তারা তাঁর আয়ুষ্কালের মধ্যে এটি পরিপূর্ণতা লাভ না করার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। তখন তিনি এটাকে সংক্ষিপ্ত করে তিন হাজার পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ করেন।[১৩]

তাফসিরুত তাবারীর রচনা পদ্ধতি: স্বয়ং ইবনু জারীর তাবারী র. তাঁর এই তাফসির গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে অবলম্বনকৃত পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন, "আমি আল কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে এবং তার অর্থসমূহের বর্ণনায় ইনশাল্লাহ এমন এক গ্রন্থ রচনা করতে চাই, যা মানুষ এ সম্পর্কিত যে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তার সবকিছুই সেখানে সন্নিবেশিত হবে। এটি পূর্বে রচিত সকল গ্রন্থ থেকে মুখাপেক্ষহীন। মতভেদপূর্ণ বিষয়ে এই উম্মাহ সর্বশেষ প্রামাণ্য দলিলের উপর ভিত্তি করে যার উপর একমত হয়েছেন, এ গ্রন্থ সেই তথ্য উপস্থাপন করবে। প্রতিটি মাযহাব যে কারণকে সামনে রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার মতামত প্রদান করেছে এখানে তার আলোচনা আসবে এবং তন্মধ্যে বিশুদ্ধতর মতটির প্রতি ইঙ্গিত করা হবে।[১৪] এখানে তাঁর কথা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, তিনি এই তাফসিরে আল-কুরআন অনুধাবনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা অতি সংক্ষেপে বিভিন্ন মনীষীর মতামতসহ পেশ করার চেষ্টা করেছেন। তা ছাড়াও তাঁর তাফসির গ্রন্থ একাগ্রচিত্তে মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করলে তার যে বিন্যাস কৌশল, উপস্থাপনা ও অনিন্দ্য সুন্দর পদ্ধতিকে উপলব্ধি করা যায় তা নিম্নরূপ:

---

৯. আল-হাওশান, য়ূসুফ ১৮ পৃ.

১০. আয-যাহাবী, ১৪খণ্ড ২২ পৃ.

১১. ইবনু মানযুর, তাবাকাতুল ফুকাহা', ১৯৭০, বায়রূত, ১খণ্ড ৯৩ পৃ.

১২. লেখক নিজের মতের উপর ভিত্তি করে রচনা না করে যে তাফসীরে আয়াত, হাদীছ ছাহাবী রাদি আল্লাহু 'আনহুম, তাবিঈ ও তাবি-তাবিঈ রাহিমাহুল্লাহের বক্তব্যকে উপস্থাপন করেন তাকে তাফসীরুল মা'ছুর বলে।

১৩. ইবনুস সিলাহ, তাবাকাতুল ফুকাহাইশ-শাফি'আহ, বায়রূত, ১৯৯২, ১খণ্ড ১১০পৃ.

১৪. আত-তাবারী,জামি'উল বায়ান ফী তাফসীরি আয়িল কুরআন, দারু হিজর, তাবি ১খণ্ড ৭ পৃ.

১. আয়াত উপস্থাপন : তাফসির শুরু করার পূর্বে তিনি সর্বপ্রথম এক বা একাধিক আয়াত উদ্ধৃত করেছেন।

২. আয়াতের ব্যাখ্যায় আয়াতের উদ্ধৃতিদান : তারপর তিনি উক্ত আয়াত অথবা এর অংশবিশেষের ব্যাখ্যার জন্যে কোনো আয়াত পেলে তা উল্লেখ করে এর ব্যাখ্যা আয়াতের দ্বারাই স্পষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছেন, যেমন মহান আল্লাহ বলেন- وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ . অর্থ: "তোমরা দু'জন এই গাছের নিকটবর্তী হয়ো না।"[১৫] এখানে الشَّجَرَةَ শব্দটির অর্থ স্পষ্ট করার জন্য তিনি বলেন-والشجر في كلام العرب: كلّ ما قام على ساق- "আরবের বাগধারায় যা কাণ্ডের উপর স্থির দাড়িয়ে থাকে তাকে الشجر বলে।" যেমন মহান আল্লাহ বলেন- وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ

"আর তারকা ও গাছপালা সিজদা করে।"[১৬] এখানে النجم হচ্ছে লতাগুল্ম যা জমিনের উপরে বিছিয়ে রয়েছে আর الشجر হচ্ছে যে গাছ কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।[১৭] এখানে তিনি الشجر শব্দটির তাফসিরে যে অন্য আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা স্পষ্ট।

৩. আয়াতের ব্যাখ্যায় অন্যান্য উৎসের ব্যবহার : এরপর তিনি উল্লিখিত আয়াত অথবা তার অংশবিশেষের তাফসির করতে গিয়ে সাহাবা রাদিআল্লাহু 'আনহুম, তাবিঈন, তাবি তাবিঈন ও সালফে সালিহীন র.-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। পরবর্তীতে এই আয়াত অথবা এর অংশবিশেষের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য কারো কোনো বর্ণনা পাওয়া গেলে তা উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে কখনো কখনো তিনি বর্ণনাসমূহকে সমালোচনা করে যাচাই-বাছাই ও যুক্তির মাপকাঠিতে কোনো কোনো বর্ণনাকে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে অনেক সময় আবার সনদ যাচাই-বাছাই করেননি।[১৮] তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবা রাদিআল্লাহু 'আনহুম ও তাবিঈগণ র. থেকে সরাসরি বিভিন্ন বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে ইবনু 'আব্বাস রাদিআল্লাহু 'আনহুমা হতে পাঁচটি সূত্রে, সাঈদ ইবনু জুবায়ির র. হতে দু'টি সূত্রে, মুজাহিদ র., কাতাদা ইবনু দি'আমাহ র., হাসান বসরি র. এবং 'ইকরিমাহ র. থেকে তিনটি সূত্রে, আদ-দাহহাক ইবনু মুযাহিম থেকে দু'টি এবং আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ রাদিআল্লাহু আনহু হতে একটি সূত্রে বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।[১৯]

৪. অন্যান্য তাফসির থেকে তথ্য উপস্থাপন: তিনি আব্দুর রাহমান ইবনু যায়িদ ইবনু মুসলিম, ইবনু জুরায়িজ ও মুকাতিল র.-এর তাফসির গ্রন্থ থেকে তথ্য গ্রহণ করেছেন এবং তার উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। মূলত এই তাফসিরকারগণ বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ ইবনু সাইব কালবি, মুকাতিল ইবনু সুলায়মান এবং মুহাম্মাদ ইবনু আমর ওয়াকিদী র.-কে আস্থাযোগ্য মনে না করার কারণে তাদের গ্রন্থ থেকে কোনো তথ্য গ্রহণ করেননি।

৫. বিভিন্ন কিরাআত সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন: মহাগ্রন্থ আল কুরআনের অনেক জায়গায় বিকল্প পাঠকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অনুমোদন দিয়েছেন।

---

১৫. সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৩৫
১৬. সূরা আর-রাহমান, আয়াত: ০৬
১৭. আত-তাবারী ১খ. ৫১৬ পৃ.
১৮. আয-যারকানী, মানাহিলুল ইরফানি ফী উলূমিল কুরআন, মিশর. তৃতীয় সংস্করণ, তাবি.২খণ্ড ২৯ পৃ.
১৯. আল-হাওশান, য়ূসুফ, ২২ পৃ.

ইবনু জারীর তাবারী র. তাঁর গ্রন্থে এই সকল কিরাআত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং এগুলোর অর্থের ভিন্নতাকেও ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। যেমন:

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ.

"অতঃপর শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটালো। এরপর তারা যাতে ছিলো তা থেকে সে তাদেরকে বের করে দিলো।"[২০] বাক্যটির (أَزَلَّ) শব্দ সম্পর্কে তিনি বলেন: এই শব্দটিকে সাধারণত সকলেই লামকে তাশদীদ সহকারে (أَزَلَّ) (আযাল্লা) পড়েছেন, যার অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে সে (শয়তান) ভুল করিয়েছে। অন্যান্যরা (أَزَلَّ) কে (أَزَالَ) পড়েছেন, যার অর্থ কোনো কিছু হতে কোনো কিছুকে অপসরণ করা।[২১]

৬. কাব্য থেকে উদ্ধৃতি দান: কুরআনের কোনো শব্দের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য ইবনু জারীর তাবারী র. কখনো কখনো কবিতার অংশবিশেষের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ .

"আর আমি বললাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং তা থেকে আহার করো স্বাচ্ছন্দ্যে তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী, এবং এই গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না, তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[২২]

ইবনু জারীর তাবারী র. এই আয়াতের رَغَدًا শব্দটির অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমরুল কায়িসের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, رَغَدًا -এর অর্থ হচ্ছে জীবনযাত্রায় সচ্ছলতা, যা মানুষকে স্বাচ্ছন্দ দান করে। যেমন ইমরুল কায়িস বলেন-

بَيْنَمَا الْمَرْءُ تَرَاهُ نَاعِمًا... يَأْمَنُ الأَحْدَاثَ فِي عَيْشٍ رَغَدْ.[২৩]

৭. ফিকহী মাসআলা উপস্থাপন: কোনো আয়াত ফিকহী মাসআলা সংশ্লিষ্ট হলে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত ফিকহী বিষয়টির উল্লেখ করেছেন। এই বিষয়ে মতভেদ থাকলে তা বর্ণনা করে একটি মতকে প্রাধান্য দিয়ে নিজে সেই মত অবলম্বনের স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহ্ বলেছেন-

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ .

"আর (তিনি সৃষ্টি করেন) ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা, তোমাদের আরোহণ ও শোভার জন্য এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন কিছু, যা তোমরা জানো না।"[২৪]

আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন-

وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

"আর গবাদি পশুগুলো তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাতে রয়েছে উষ্ণতার উপকরণ ও বিবিধ উপকার এবং তা থেকে তোমরা আহার গ্রহণ কর।"[২৫]

---

২০. সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৩৬
২১. আত-তাবারী, ২খণ্ড ৫২৪ পৃ.
২২. সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৩৫
২৩. আত-তাবারী ১খণ্ড ৫১৫ পৃ.
২৪. সূরা আন-নাহাল, আয়াত: ০৮

এখানে প্রথমোক্ত আয়াতে ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাকে আরোহণ ও শোভার জন্য এবং দ্বিতীয় আয়াতে গবাদি পশুগুলোকে উষ্ণতার উপকরণ ও বিবিধ উপকারের জন্য সৃষ্টি করার স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। এদ্বারা ফকীহদের একপক্ষ বলেছেন যে, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা যেহেতু শুধুমাত্র আরোহণ ও শোভার জন্য সেহেতু তা খাওয়া হালাল নয়। পক্ষান্তরে অন্যান্য চতুষ্পদ প্রাণী যেহেতু উপকারার্থে ও খাওয়ার জন্য সেহেতু সেগুলো খাওয়া বৈধ। ফকীহদের অপরপক্ষ বলেছেন, অন্যান্য চতুষ্পদ প্রাণীর সাথে সাথে ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশত খাওয়া বৈধ। মূলত এই সূরাতে মহান আল্লাহ তার অন্যান্য নিয়ামতের সাথে সাথে এই প্রাণীগুলোকে সৃষ্টির উদ্দেশ্যও বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তাঁর অনুগ্রহকে বান্দার নিকট পরিচিত করানো।

এদ্বারা প্রথম আয়াতে উল্লিখিত ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাকে আরোহণ ও শোভাবর্ধন ব্যতীত অন্য উপকারে ব্যবহার করা যাবে না, তেমনটি নয়। মূলত সেগুলোর গোশতও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ। ইবনু জারীর তাবারী র. এই উভয় পক্ষের মতামত নামসহ বিস্তারিতভাবে উপস্থাপনের পর, তাঁর নিজস্ব মত উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, "এ সম্পর্কে আমার নিকট দ্বিতীয় পক্ষ যেটি বলেছেন, অর্থাৎ ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশত খাওয়াকে বৈধ বলে মনে করা সঠিক। কেননা আরোহণ করার কথা দ্বারা এগুলো অন্য উপকারে ব্যবহার বৈধ নয়, এটি সঠিক নয়। তাহলে অর্থ দাঁড়াবে, যেগুলো উষ্ণতার উপকরণ এবং উপকার ও খাদ্য হিসেবে গ্রহণের জন্য বলে উল্লেখ হয়েছে, সেগুলোতে আরোহণ করাও বৈধ হবেনা, অথচ উম্মাতের ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে এই কথার উপর যে, থাকলে তা অবশ্যই হারাম বলে গণ্য হবে।[২৬]

সুতরাং এদ্বারা প্রমাণিত হলো, ইবনু জারীর তাবারী র. তাঁর তাফসির গ্রন্থে অভিনব পদ্ধতিতে ফিকহী মাসআলাগুলোও উপস্থাপন করেছেন এবং কোন মতটি প্রণিধানযোগ্য তাও যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

৮. বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মতামত খণ্ডন: ইবনু জারীর তাবারী র. তাঁর তাফসির গ্রন্থে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সাথে সাথে বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মতকে কুরআন, সুন্নাহ ও যুক্তিতর্ক দ্বারা খণ্ডন করে ভ্রান্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। 'মানুষ পরিপূর্ণ স্বাধীন, তাদের উপর আল্লাহর কোনো কর্তৃত্ব নেই' কাদারিয়াহ (অদৃষ্টবাদী) সম্প্রদায়ের এই ভ্রান্ত মতকে তিনি সূরা ফাতিহার শেষ আয়াতের তাফসিরে উপস্থাপন করে তার যথোচিত উত্তর দিয়েছেন।[২৭]

৯. ইসরাঈলী বর্ণনার উদ্ধৃতিদান: মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মহান আল্লাহ ৫০০টি জায়গায় বানূ ইসরাঈল তথা ইয়াহুদিদের নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা মূলত কুরআনের আলোচনার এক-পঞ্চমাংশ। মাক্কী সূরাসমূহের মধ্যে সূরা আল-আ'রাফ, ইউনুস, বানূ ইসরাঈল, ত্বহা, আশ-শূরা, আল-কাসাস, মু'মিন, আদ-দুখান এবং মাদানী সূরার মধ্যে আল-বাকারাহ, আলে-ইমরান, আল-মায়িদাহ, আল-মুজাদালাহ, আল-হাশর, আস-সফ ও আল-জুমু'আতে তাদের সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। অপরদিকে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায়ই তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন

---

২৫. সূরা আন-নাহাল, আয়াত: ০৫
২৬. আত-তাবারী, ১৭খণ্ড ১৭৩-১৭৪ পৃ.
২৭. প্রাগুক্ত, ১৭খণ্ড ১৯৫-১৯৬ পৃ.

ঘটনাপঞ্জী ও কিচ্ছা-কাহিনী, তাদের নবী, তাদের উম্মাত প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বর্ণনাও ছড়িয়ে দিয়েছে। এগুলো ইসরাঈলী বর্ণনা নামে খ্যাত। এগুলো আজগুবি মিথ্যা কিচ্ছা-কাহিনী দ্বারা পরিপূর্ণ। কুরআনের তাফসিরের ক্ষেত্রে অনেক মুফাসসির এসব ইসরাঈলি বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছেন। ইবনু জারীর তাবারী র.ও এর ব্যতিক্রম নন।

মূলত এই ইসরাঈলিয়াত ইবনু আব্বাস রা., আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা., মুজাহিদ, ইকরিমাহ, সাঈদুবনু যুবায়ির রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ সূত্রে বর্ণিত হলেও এগুলো কখনো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত নয়। বরং এগুলোর মূল সূত্র হচ্ছে আহলে কিতাব।[২৮] আসলে ইবনু জারীর তাবারী র. এইসব ইসরাঈলী বর্ণনা গ্রহণ করার কারণে তাঁর তাফসিরের মান কিছুটা হলেও প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। অনেক সময় ইসলামি 'আকীদার সাথে সংঘর্ষপূর্ণ ইসরাঈলী বর্ণনা হয়তো বা অলক্ষ্যে তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখও করেছেন। যেমন দাউদ 'আলায়হিস সালাম অন্য কারো স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হওয়ার মতো জঘন্য বর্ণনার উদ্ধৃতি।[২৯]

আসলে তিনি একজন মহান নবী। তিনি নিষ্পাপ। এই বর্ণনাটি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিশুদ্ধ আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক। তারপরও ইসরাঈলী বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনু জারীর তাবারী র. এটাকে তাঁর তাফসির গ্রন্থে নিয়ে এসেছেন যা মোটেও যুক্তিযুক্ত হয়নি। উল্লেখ্য যে, কোনো ইসরাঈলী বর্ণনার বক্তব্য যদি আল-কুরআন ও হাদীছ সমর্থিত হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। ইবনু জারীর তাবারী র. সম্ভবত সেইগুলো উল্লেখ করতে গিয়ে অলক্ষ্যে কিছু ভুল ও অগ্রহণযোগ্য বর্ণনাও নিয়ে এসেছেন।

মোটকথা ইবনু জারীর তাবারী র.-এর এই তাফসির গ্রন্থে কম বেশি যাই দুর্বলতা থাক না কেনো মূলত এই অনবদ্য গ্রন্থটি তাফসির শাস্ত্রকে শুধু সমৃদ্ধ করেনি, বরং অসংখ্য তাফসিরের উৎসস্থল হিসেবে আজও গণ্য হচ্ছে। অনেক বিদগ্ধ মনীষী তাঁর এই গ্রন্থের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

মনীষীদের দৃষ্টিতে তাফসিরুত তাবারী: আস-সুয়ূতী রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. "তাঁর গ্রন্থ সম্মানিত তাফসিরসমূহের অন্যতম, সেটি মর্যাদাগত দিক থেকে সর্বোচ্চ।"[৩০]

আন-নাববী রাহ.বলেন: كتاب ابن جرير في التفسير لم يصنف أحد مثله "ইবনু জারীরের তাফসির গ্রন্থের মতো কেউ কিছু প্রণয়ন করেননি।"[৩১]

আবূ হামিদিল ইসফারায়ীনী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: لو رحل أحد إلى الصين ليحصل تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيرا عليه. "ইবনু জারীরের তাফসিরের জন্য কেউ চীন দেশে গেলেও তা তেমন বেশি কিছু হবেনা।"[৩২]

---

২৮. আবূ শাহবাহ, ড. মুহাম্মাদুবনু মুহাম্মাদ, আল-ইসরাঈলিয়াত ওয়াল মাওদূ'আতু ফিত তাফসীর, তাবিত ১২৩ পৃ.

২৯. আত-তাবারী, ২১খ. ১৭৪ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে সূরা সাদ এর ২১ ও তার পরবর্তী আয়াতসমূহের তাফসীর।

৩০. আস-সূয়ূতী, আল-ইতকান ফী উলুমিল কুরআন, তাবি. ১৮ পৃ.

৩১. আয-যারকানী, ২খণ্ড ২৯ পৃ.

ইবনু খুযায়মা রাহ. তাঁর তাফসির সম্পর্কে বলেন:

«قد نظرت في (التفسير) من أوله إلى آخره، وما أعلم على أديم الأرض اعلم من محمد بن جرير، ولقد ظلمته الحنابلة».

"আমি তাফসিরের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছি, ভূপৃষ্ঠে মুহাম্মাদ ইবনু জারিরের চেয়ে কাউকে জ্ঞানী দেখিনি। তবে হাম্বলীরা তাঁর প্রতি অবিচার করেছে।"[৩৩]

আবূ মুহাম্মাদ ফারগানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

تم من كتب محمد بن جرير كتاب: " التفسير " الذي لو ادعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب، كل كتاب منها يحتوي على علم مفرد مستقصى لفعل.

"মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাঁর তাফসির গ্রন্থ পূর্ণ করেছেন। যদি কেউ চায় এখেকে দশটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ রচনা করবেন যার প্রতিটি গ্রন্থ একটি পৃথক ইলম ধারণও করবে তাহলে তা করতে পারবেন।"[৩৪]

সুতরাং এই মহামূল্য তাফসির গ্রন্থটি ইসলামের বিদগ্ধ বিদ্বানদের দৃষ্টিতেও মুসলিম উম্মাহর ইলমের জগতে এক অনবদ্য সংযোজন। এটি এই উম্মাহর এক মূল্যবান সম্পদ।

উপসংহার: তাফসির শাস্ত্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অনুধাবনের অন্যতম মাধ্যম। মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী এই শাস্ত্রের এক কালোত্তীর্ণ মহাপুরুষ। এই শাস্ত্র উদ্ভাবনের প্রাথমিক যুগে রচিত এই গ্রন্থটিকে বাদ দিয়ে এই শাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞান অর্জন কল্পনাও করা যায় না। সেজন্য এর পরবর্তী তাফসিরবিদগণ এই তাফসিরকে তাদের অন্যতম উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাফসিরের এই কিতাব থেকে যাতে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ আলোকিত হতে পারেন, তার ব্যবস্থা গ্রহণ এখন সময়ের অনিবার্য দাবি।

***

---

৩২. প্রাগুক্ত
৩৩. আয যাহাবী, ১৪খণ্ড ২৭৩ পৃ.
৩৪. প্রাগুক্ত

৩

ইমাম যামাখশারী ও তাঁর তাফসিরে কাশশাফ

এ.কিউ.এম. আবদুল হাকিম মাদানী

ভূমিকা: الحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن سلك طريقهم الى يوم الدين اما بعد আল কুরআন আল্লাহ রব্বুল আলামীন এর শাশ্বত বাণী, যা নিরবচ্ছিন্নভাবে তেইশ বছরে রসূলুল্লাহ্ সা.-এর উপর নাযিল হয়েছে। এ মহাগ্রন্থের ব্যাখ্যা সম্বলিত শাস্ত্রকে ইলমে তাফসির বলা হয়। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অতীব প্রয়োজনীয় একটি শাস্ত্র। কারণ আল্লাহ্ তায়ালার এ বাণী ব্যাপক অর্থবোধক ও অতীব সংক্ষিপ্ত। এর সঠিক ও বাস্তবভিত্তিক মর্মার্থ অনুধাবন করতে হলে তাফসির শাস্ত্রের মুখাপেক্ষী হওয়া ব্যতীত সম্ভব নয়। এছাড়া রসূলুল্লাহ্ সা.-এর অন্যতম গুরুদায়িত্ব ছিলো আল কুরআনের ব্যাখ্যা করা। তাই আমরা দেখতে পাই, আলেম সম্প্রদায়ের একটি বড়ো জামায়াত আল কুরআনের তাফসির করতে এগিয়ে এসেছেন। অবশ্য তাঁরা তাফসির করার ক্ষেত্রে একই ধারা বা পন্থা অবলম্বন করেননি। কেউ তাফসির করার ক্ষেত্রে রিওয়ায়াতকেই অবলম্বন করেছেন। একে তাফসির বির রিওয়ায়াত বলা হয়। আবার অন্যরা তাফসির করার ক্ষেত্রে দিরায়াতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। একে তাফসির বিদ দিরায়াত বলা হয়।

এভাবে উভয় ধারায় শত শত তাফসির গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এর প্রথম ধারার সাথে সম্পৃক্ত তাফসিরের মধ্যে রয়েছেঃ তাফসিরে তাবারী, তাফসিরে ইবনে কাসীর, তাফসিরে বাগাবী, তাফসিরে সুয়ূতী, তাফসিরে শিনকীতীসহ অসংখ্য তাফসির গ্রন্থ। আর দ্বিতীয় ধারার সাথে সম্পৃক্ত তাফসিরের মধ্যে রয়েছে তাফসিরে রাজী, তাফসিরে আলুসী, তাফসিরে শাওকানী, তাফসিরে যামাখশারী, তাফসিরে বায়দাবী, তাফসিরে আবুল আ'লা মওদূদী, তাফসিরে মুফতী শফী, তাফসিরে সাইয়্যেদ কুতুব, তাফসিরে জালালাইনসহ অগণিত তাফসির গ্রন্থ।

যেসব মনীষী দ্বিতীয় ধারা অবলম্বনে তাফসিরের কিতাব রচনা করেছেন তাদের মধ্যে ইমাম যামাখশারী শীর্ষস্থানীয়। রচনাশৈলী, বাক্যবিন্যাস ও ভাষার চাতুর্যে এ গ্রন্থটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এর বর্ণনাভঙ্গি, রচনার নৈপুণ্য, বাকশৈলী, যুক্তি-প্রমাণ, ভাষার কারুকার্য ও অসাধারণ ভাব-গাম্ভীর্যের কারণে শত্রু-মিত্র, আধুনিক ও প্রাচীন সকল মহলই এর প্রশংসা করেছেন। তবে মু'তাযিলী বাতিল আকীদার কারণে তিনি তাঁর বাতিল আকীদাগুলো তাফসিরের পরতে পরতে সাজাবার চেষ্টা করেছেন। সময় মতো নির্ভেজাল ও হকপন্থী তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উপর আক্রমণ করতে পিছপা হননি এবং বাতিল মত ও আকীদা প্রচারেও কার্পণ্য করেননি। তবে আহলে সুন্নাত সম্প্রদায় এসব বাতিল আকীদাগুলো চিহ্নিত করে বই পুস্তক লিখেছেন এবং তাঁর তাফসিরের ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক করেছেন।

এটি ইমাম যামাখশারীর জীবনী ও তাঁর তাফসিরে কাশশাফের পরিচয় নিয়ে লিখিত একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ। এতে তাঁর জীবনীর সাথে সাথে তাঁর তাফসিরের পক্ষে ও বিপক্ষে অবস্থানের মূল কারণ ও তাৎপর্য উন্মোচনের চেষ্টা করেছি। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো।

নাম ও বংশ পরিচয়: ইমাম যমাখশারীর পূর্ণ নাম আবুল কাসিম মাহমুদ বিন উমার বিন মুহাম্মদ বিন উমার আল-খাওয়ারিযমী জারুল্লাহ আয্ যামাখশারী। তিনি পারসিক বংশোদ্ভূত। তিনি বিখ্যাত আরবি সাহিত্যিক, ভাষাতত্ত্ববিদ, ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ, আকাইদ ও যুক্তিবিদ্যা বিশারদ ছিলেন।[১]

জন্ম ও মৃত্যু: তিনি ২৭ শে রজব, ৪৬৭ হিজরি মোতাবেক ৮ই মার্চ, ১০৭৫ সনে খোরাসান প্রদেশের খাওয়ারিজম জেলার যামাখশার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯ই জিলহজ্জ আরাফার রাতে ৫৩৮ হিজরি মোতাবেক ১৪ই জুন, ১১৪৪ সালে খাওয়ারিজম জেলার অন্তর্গত জুরজানিয়া শহরে মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ৭০বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।[২] প্রখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা যখন জুরজানিয়া শহরে পৌছেন তখন ইমাম যামাখশারীর সমাধি সেখানে বিদ্যমান ছিলো।[৩] বর্ণিত আছে যে, বরফ পড়ে তার পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। এজন্য তিনি কৃত্রিম পা লাগিয়ে চলাফেরা করতেন।[৪]

শিক্ষাসফর ও দেশ ভ্রমণ: ইমাম যামাখশারী জ্ঞানার্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেন। স্বীয় গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর একজন শিক্ষার্থী হিসাবে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করতে করতে তিনি পবিত্র মক্কায় পৌঁছেন। তিনি সেখানে বিশিষ্ট আলিম ও শাইখ ইবন ওয়াহ্‌হাব রহ.-এর ছাত্র হিসাবে কিছু কাল শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইমাম যামাখশারী ইতিপূর্বেই সাহিত্য ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাই মক্কা গমনের পথে তিনি বাগদাদ পৌঁছলে হযরত আলী বংশীয় আলিম হিবাতুল্লাহ ইবন আশ-শাজারী সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এখানে তিনি বিশিষ্ট আলেমদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং জ্ঞান অর্জন করেন। অনেকবার তিনি খোরাসানে প্রবেশ করেন।

তিনি যেখানেই আগমন করতেন সেখানকার অধিবাসীরা তাঁর নিকট সমবেত হতেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতেন। তিনি যার সাথেই বিতর্কে লিপ্ত হতেন তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যের ব্যাপারে স্বীকৃতি দিতেন। তাঁর খ্যাতি এতোদূর গিয়ে পৌছেছিল যে, তিনি তাঁর যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। বাগদাদে তিনি নসর ইবন বাতির ও অন্যান্যদের থেকে ইলম শিক্ষা করেন। তাঁর অসংখ্য ছাত্র রয়েছে। তারা অনেকেই বড় বড় আলিম ছিলেন।[৫]

জারুল্লাহ উপাধি: তিনি পবিত্র মক্কায় অবস্থিত কা'বা ঘরের চত্বরে দীর্ঘকাল অবস্থান করেছিলেন বলে তাকে জারুল্লাহ আল্লাহর প্রতিবেশী উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[৬] এখানেই তিনি তাঁর তাফসিরে কাশ্‌শাফ রচনা করেন। অত:পর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।[৭]

রচনাবলী: ইমাম যামাখশারী লেখার ক্ষেত্রে ছিলেন এক বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন ঘোড়সওয়ার। তাঁর লেখনী শক্তি ছিলো অত্যন্ত প্রখর ও গতিশীল । তাঁর অসংখ্য রচনাকর্ম রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

---

১. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ইবনে কাসীর, ১২ : ২১৯ ২য় সংস্করন ১৯৭৭ সাল, তারতীবুল কামুসুল মুহীত।
২. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১২ : ২১৯, দিরাসাত ফি উলুমিল কুরআন, পৃ. ১৮০
৩. ইসলামী বিশ্বকোষ ২১ : ৫১২ পৃ.
৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২ : ৫৬৮, জীবনী ৪৯০৭
৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫৬৮ পৃ. ৪৯০৭
৬. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫৬৮ পৃ. ২য় খন্ড নং ৪৯০৭
৭. দিরাসাত ফী উলুমিল কুরআন : পৃ. ১৮০

০১. আল কাশশাফ আন হাকাইকিত তানযীল ওয়া উয়ূনিল আকাবীল ফি উজূহিত তা'বীল।(الاقاويل فى وجوه التاويل الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون)

০২. এ তাফসিরখানি ইমাম যামাখশারীর সর্বাধিক ও গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এ গ্রন্থটির রচনা ৫২৮ হিজরি মোতাবেক ১৪৩৪ সালে সমাপ্ত হয়।[৮]

০৩. আল মুফাসসাল : (المفصل فى النحو)।[৯] এটি আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্র বিষয়ে ইমাম যামাখশারী কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে খুবই প্রসিদ্ধ কিতাব। এটি ৫১৩-৫১৫ হিজরি মোতাবেক ১৪১৯-১৫২১ সনের মধ্যে রচিত।[১০]

০৪. আসাসুল বালাগাহ ফিল-লুগাহ : (اساس البلاغة فى اللغة)।[১১] এটি প্রাচীন আরবি ভাষা, আরবি সাহিত্য ও আরবি শব্দ সম্ভার পরিপূর্ণ।

০৫. আলফায়েক: (كتاب الفائق فى عزيب الحديث)।[১২] এটি হাদিসশাস্ত্রে উল্লেখিত দুর্বোধ্য শব্দ সম্ভারের অর্থ ও ব্যাখ্যামূলক কিতাব।

০৬. আলমুফরাদ ওয়ালমুরাককাব : (المفرد والمركب فى العربية)। [১৩] এটিও আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্র।

০৭. আলউনমূযাজ ফিন নাহবি : (الانموذج فى النحو)।[১৪]

০৮. আল মুসতাকসা ফিল আমসাল : (المستقصى فى الامثال)।[১৫]

০৯. রুয়ুসুল মাসায়েল ফিল ফিকহ : (رؤوس المسائل فى الفقه)।[১৬]

১০. আল মুহাজাত ফিল মাসায়িলিন নাহবিয়াহ : (المحاجاة فى المسائل النحوية)।[১৭]

এছাড়া ইসলামি বিশ্বকোষে আরো বেশ কিছু রচনাবলীর কথা উল্লেখ আছে যেগুলোর নাম বিভিন্ন কিতাবেও পাওয়া যায়। যেমন : ক. مقدمة الادب (মুকাদ্দিমাতুল আদাব) আরবি ভাষার এক বিশাল শব্দসম্ভার। খ. কিতাবুল আমকিনাত ওয়াল জিবাল ওয়াল মিয়াহ : (كتاب الأمكنات والجبال والمياه) এটি ভূগোল শাস্ত্র সম্পর্কীয় একটি গ্রন্থ। গ. আদদুররুদ দায়িরুল মুনতাখাব ফী কিনায়াতি ওয়া ইসতিয়ারাতি ওয়াতাশবীহাতিল আরাব (الدر الدائر المنتخب فى كنايات واستعارات و تشبيهات العرب) এটি অলংকার শাস্ত্র ও আরবের প্রাচীন আরবি ভাষা সম্পর্কীয় কিতাব। ঘ. নাওয়াবিগুল কালিম (نوابغ الكلم) এটি প্রবাদ বাক্য সম্পর্কীয়। ঙ. রবীউল আবরার ফী মা ইয়াসুররুল খাওয়াতিরা ওয়াল আফকার (ربيع الابرار فيما يسر الخواطر والافكار) এটি একটি হাস্যরস, কৌতুক ও কিচ্ছা-কাহিনী সম্পর্কীয় কিতাব। চ. আতওয়াকুয যাহাব (اطواق الذهب فى المواعظ والخطب) ছ. মুখতাসারুল মুওয়াফাকাত বাইনা আলিল বাইত ওয়াস সাহাবা (مختصر المواقعات بس ال

---

৮. আত্ তাফসীর ওয়াল মুফাসিরুন, ইবিকোষ ২১ : ৫১২পৃ.
৯. দিরাসাত ফী উলূমিল কুরআন পৃ. ১৮০
১০. ইসলামী বিশ্বকোষ ২১ : ৫১২ পৃ.
১১. দিরাসাত ফী উলূমিল কুরআন পৃ. ১৮০
১২. দিরাসাত ফী উলূমিল কুরআন ঃ পৃ ১৮০
১৩. আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন
১৪. আল আমসাল : আল মাযদানী, ভূমিকা
১৫. মাজযায়ুল আমসাল : আল আযদানী
১৬. আত্ তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন ১ : ৪৩১
১৭. প্রাগুক্ত ১ : ৪৩১

(البت والصحابة) এটি হাদিস বিষয়ে লিখিত গ্রন্থ। জ. খাসায়িসুল অশারাতিল কিরামিল বারারাহ (خصائص العشرة الكرام البررة) এটিও হাদিস বিষয়ে লিখিত একটি গ্রন্থ।[১৮]

ইমাম যামাখশারীর পাণ্ডিত্য: তিনি ছিলেন বিখ্যাত আরবি সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ববিদ, ফিকহ শাস্ত্রবিদ এবং আকাইদ ও যুক্তিবিদ্যা বিশারদ।[১৯] পার্সিক বংশোদ্ভুত হওয়া সত্ত্বেও তিনি আরবি ভাষায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি স্বীয় মাতৃভাষা ফারসীতে শুধু প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্যে এক বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। একথা প্রমাণ করার জন্য তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থই যথেষ্ট।[২০]

ফিকহী মাসলাক ও ইমাম যামাখশারী: ইমাম যামাখশারী ফিকহী চিন্তাগোষ্ঠীর দিক থেকে হানাফী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। তবে তিনি হানাফী মাসলাকের অনুসারী হলেও এ ব্যাপারে তাঁর মধ্যে কোনো ধরনের তাআস্‌সুব (تعصب) বা গোঁড়ামী ছিলোনা। তাফসিরে কাশশাফে তাঁর ফিকহী মাসয়ালার আলোচনাই এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।[২১]

ইমাম যামাখশারীর আকীদা-বিশ্বাস ও মনীষীদের মন্তব্য: ইসলামি আকীদার দিক দিয়ে ইমাম যামাখশারী মু'তাযিলী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ আকীদা নিয়ে তিনি রীতিমত গর্ববোধ করতেন। তিনি সবার সামনে এ বিশ্বাস মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করে বেড়াতেন।[২২] কারো সাথে দেখা করতে গেলে এই বলে খবর পাঠাতেন যে, আবুল কাসেম মু'তাযিলী দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন এবং গৃহকর্তার সাথে দেখা করতে চাচ্ছেন।[২৩]

তিনি আল কুরআনকে 'সৃষ্ট' বিশ্বাস করতেন, যা মূলত মু'তাযিলী আকীদা। তিনি তাঁর তাফসির গ্রন্থের ভূমিকায় আল কুরআনকে সৃষ্ট বলে ঘোষণা দেন। তিনি প্রারম্ভিক খুতবায় বলেন : الحمد لله الذى خلق القران। পরবর্তীকালে কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী খর পরামর্শে তিনি এ শব্দটি পরিবর্তন করে লিখেন : الحمد لله الذى جعل القران ।

তিনি তাঁর এই ই'তিযালী আকীদা তাঁর তাফসিরের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। তিনি তাঁর ই'তিযালী মতবাদের পক্ষে সব ধরনের অপচেষ্টা চালিয়েছেন। যেসব আয়াত বাহ্যিকভাবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সাক্ষ্য দেয়, তিনি তা অত্যন্ত আগ্রহভরে গ্রহণ করতেন। আর যা তাঁর মতবাদের বিপক্ষে পেতেন, তিনি তার অপব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেন।[২৪]

ইমাম যামাখশারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর বিরুদ্ধে খুবই কঠোর মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তাদেরকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে উল্লেখ্য করতেন । তাদের উক্তিগুলো ঘৃণ্যভাবে ও উপহাসের ছলে উল্লেখ করতেন।[২৫]

ইমাম যামাখশারীর এ আকীদা সম্পর্কে বিভিন্নজন বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। যেমন :
ক. ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন : 'ইমাম যামাখশারী মু'তাযিলী মতবাদে বিশ্বাসী হবার কারণে আল্লাহ তায়ালার সিফাত, আল্লাহর দর্শন ইত্যাদি অস্বীকার করতেন। তিনি আল কুরআনকে সৃষ্ট মনে করতেন।[২৬]

---

১৮. ইসলামী বিশ্বকোষ ২১ : ৫১৬ পৃ.
১৯. দিরাসাত ফী উলূমিল কুরআন ১৮০ পৃ.
২০. ইসলামী বিশ্বকোষ ২১ : ৫১৬ পৃ.
২১. আত্ তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন ১ : ৪৭৪, সিয়ার আলামিন নুবালা ২ : ৫৬৮৭ (নং ৪৯০৭)
২২. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১২ : ২১৯ পৃ.
২৩. আত্‌তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরুন
২৪. আত্‌তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরুন
২৫. দিরাসাত ফী উলূমিল কুরআন ১৮০, আত্‌তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরুন ১ : ৪৭৬

খ. ড. রুমী বলেন, ইমাম যাহাবী বলেছেনঃ মাহমুদ বিন উমার যামাখশারী ব্যক্তি জীবনে ভালো মানুষ ছিলেন, তবে ই'তিযালী আকীদার দিকে মানুষকে দাওয়াত দিতেন। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে হেফাজত করুন। তাঁর তাফসির থেকে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে।

তিনি আরো বলেন, মোল্লা আলী কারী বলেছেন : 'ইমাম যামাখশারীর মধ্যে অনেক আকীদাগত বিভ্রান্তি রয়েছে, যা অনেক লোকই জানে না। এজন্য আমাদের ফিকহবিদগণ তাঁর তাফসির অধ্যয়ন করা হারাম বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২৭]

তাফসিরে কাশশাফঃ তাফসিরে কাশশাফ ইমাম যামাখশারীর অনন্য ও বিস্ময়কর সৃষ্টি। নিম্নে এর পরিচয় তুলে ধরা হলো :

নাম : তাফসির আল কাশ্শাফ একটি প্রসিদ্ধ তাফসির গ্রন্থ। এ তাফসিরের পূর্ণ নাম الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل فى وجوه التاويل (আলকাশশাফ আন হাকাইকিত তানযীল ওয়া উয়ূনিল আকাবীল ফী উজূহিত তা'বিল)। নামের বাংলা অর্থ হলো : আল কুরআনের রহস্য উন্মোচন এবং এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে উৎকৃষ্ট মতসম্ভার উদ্ঘাটন।

রচনাকালঃ উক্ত গ্রন্থ রচনার সময়ে গ্রন্থকারের বয়স ছিলো ষাট-সত্তরের মাঝামাঝি। এর রচনা কার্যে তাঁর ভাষায় আবু বকর আস সিদ্দীক র.-এর খেলাফত কালের সমপরিমাণ সময় লেগেছে (অর্থাৎ ২ বৎসর চার বা তিন মাস নয় দিন)। ৫২৮ হি. ২ রবিউল আউয়াল সোমবার দ্বিপ্রহরে রচনা কার্য সমাপ্ত হয়।[২৮]

রচনার কারণ ও পটভূমিঃ গ্রন্থকার তাঁর তাফসিরের ভূমিকায় লিখেছেন, আমি লক্ষ্য করলাম, আমার দীনি ভ্রাতৃবর্গ বিভিন্ন সময় আমার নিকট আয়াতে কুরআনের তাফসির জিজ্ঞেস করে থাকেন। আমি তাদেরকে নির্দিষ্ট আয়াতের নানা রহস্য উদঘাটন করে দিতাম। ফলে তারা এজন্য সপ্রশংস মন্তব্য করতো এবং বিস্ময়াভিভূত হতো। অবশেষে তারা আমার নিকট সমবেত হয়ে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো, আমি যেনো আল কুরআনের রহস্য উদঘাটন শীর্ষক একখানি গ্রন্থ রচনা করি। আমি ক্ষমা চাইলাম। তারাও পুনরাবৃত্তিতে নিরত রইলো এবং আল আদল ওয়াত্ তাওহীদপন্থী (মু'তাজিলা) আলিম সম্প্রদায় দ্বারা আমার উপর চাপ সৃষ্টি করলো।

সুতরাং আমি সূরা আল ফাতিহা ও সূরা আল বাকারার কিয়দংশের তাফসির প্রণয়ন করলাম। প্রচুর প্রশ্নোত্তরের সমন্বয়ে এর আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়েছিল। অতঃপর আমি বাইতুল্লাহর সান্নিধ্যে কিছুকাল কাটাবার উদ্দেশে যখন তথায় উপনীত হলাম, তখন সেখানে ইমাম হাসান রা.-এর বংশধর একজন মহান সায়্যিদের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তাঁর নাম আবুল হাসান আলী ইবনে হামযাহ ইবনে ওয়াহ্হাব। উল্লেখিত বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ছিলো সকলের চেয়ে বেশি। আমি কোনোক্রমেই তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না। অতঃপর পূর্বাপেক্ষা কিছু সংক্ষিপ্তাকারে রচনাকার্য আরম্ভ করলাম। তবে এতে পর্যাপ্ত পরিমাণ উপকারী আলোচনার সমাবেশ ঘটেছে।[২৯]

---

২৬. আল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া ১৩ : ৩৮৬
২৭. দিরাসাত ফী উলূমিল কুরআন, ড. রুমী : ১৮০
২৮. ইসলামী বিশ্বকোষ ৭ : ৪৮৪
২৯. আত তাফসির ওয়াল মুফাসসিরীন ১ : ৪৩০

তাফসিরে কাশশাফের বৈশিষ্ট্য ও রচনা পদ্ধতি: আল্লামা যামাখশারী শুরুতে যে ভূমিকা লিখেছেন তদ্বারা তাফসিরখানির বিষয়ের মূল্যায়ন, রচনার কারণ, রচনার রীতি ও বৈশিষ্ট্যাবলী জানা যায়। তিনি বলেন, যে সকল জ্ঞান দ্বারা অনুসন্ধিৎসু মন পূর্ণ হয়ে উঠে তন্মধ্যে ইলমুত তাফসির সর্বশ্রেষ্ঠ। একজন ফকীহ ইলমুল ফাতাওয়ায়ে (আইনশাস্ত্র) যতোই পারদর্শী হোক, একজন মুতাকাল্লিম (ধর্মতাত্ত্বিক) ধর্মতত্ত্বে যতোই অগ্রগামী হোক, একজন ঐতিহাসিক ইতিহাস ও কাহিনী জ্ঞানে যদি কালজয়ীও হয়, ওয়ায়েজ (উপদেশদাতা) যদি হাসান আল বাসরী র.-কেও ছাড়িয়ে যায়, কোনো নাহবী (ব্যাকরণবিদ) যদি সীবাওয়া রহ.-এর অপেক্ষাও ইলমুন নাহুর বড় দিকপাল হয়, কোনো ভাষাবিদ যদি হয় ভাষাবিদগ্ধ, তথাপি তাদের কেউই তাফসিরের গতিপথে অগ্রগামী হতে পারে না এবং তার রহস্য প্রবাল উত্তোলন করতে সক্ষম হয় না, একমাত্র ঐ ব্যক্তি ছাড়া, যিনি আল কুরআনের জন্য নির্দিষ্ট জ্ঞানদ্বয় তথা ইলমুল মায়ানী ও ইলমুল বায়ান (علم المعانى و البيان) -এ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন, এর সুদীর্ঘকালীন তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত থেকেছেন। তদুপরি তিনি অন্য জ্ঞানভাণ্ডার থেকে পর্যাপ্ত অংশ লাভ করেছেন, গবেষণা ও মেধার সমন্বয় সাধন করেছেন। বিপুল পরিমাণ অধ্যয়ন ও আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। ইলমুল ই'রাবের হয়েছেন সুযোগ্য অশ্বারোহী। বইপুস্তক সংগ্রহে থেকেছেন সকলের সম্মুখভাগে। গদ্য ও পদ্যের রচনাবলীতে একজন সাহসী যোদ্ধা। কিভাবে কথামালার গাথুনি গাথতে হয় এবং কিভাবে ছন্দবিন্যাস করতে হয় সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। যামাখশারীর এ বর্ণনার আলোকে তাঁর তাফসির গ্রন্থের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায়।[৩০]

০১. এতে ইসলামি আকাইদের দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদানের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

০২. এতে কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাকরণগত ব্যাখ্যা বর্ণনা করা ছাড়াও ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সাবলীলতা, অলংকার, বাচন রীতি ও অতি উচ্চাঙ্গ প্রকাশ রীতি, তথা বর্ণনা ভংগির দিক দিয়ে কুরআন মজীদের সাহিত্যিক সৌন্দর্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তিনি কুরআন মজীদের অনন্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবার বিশ্বাসকে দলিল-প্রমাণ দ্বারা শক্তিশালী করে দেখিয়েছেন।

০৩. তাফসির বর্ণনায় লেখক কুরআন মজীদের আয়াতগুলোর আভিধানিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছেন এবং এর সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন।

০৪. বিভিন্নরূপ কিরাআতের অনুসন্ধানমূলক পূর্ণাংঙ্গ পর্যালোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে স্বীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সমর্থনে প্রাচীন কবিতা থেকে বহু উদ্ধৃতি দান করেছেন।

০৫. এর শব্দ চয়ন ও বাক্যবিন্যাসের বৈয়াকরণিক পর্যালোচনা করেছেন।

০৬. মোহনীয় বাগধারা (امثال) ও নীতিবাক্যের মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

০৭. কুরআনের ই'জায ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে যত্নবান হয়েছেন।

০৮. আরবদের কাব্য জৌলুস ফুটিয়ে তুলতে সার্থক চেষ্টা করেছেন।

০৯. অর্থগত ব্যাপ্তি প্রকাশ করেছেন। তিনি একে সার্থক সৃষ্টি হিসেবে উপলব্ধি করে বলেছেন:

---

৩০. ইসলামী বিশ্বকোষ ৭ : ৪৮৩, আত তাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন ১ : ৪৩১

ان التفاسير فى الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمرى مثل كشاف ان كنت
تبغى الهدية فالزم قراءته ، فالجهل كالداء والكشاف كالشافى

"পৃথিবীতে অসংখ্য তাফসির গ্রন্থ রয়েছে। আমার জীবনের শপথ! এর মধ্যে আমার কাশ্‌শাফের মতো একটিও নেই। যদি তুমি হেদায়াত সন্ধানী হও তাহলে আমার এই কাশ্‌শাফ পাঠ করো। কেনোনা অজ্ঞতা একটি ব্যাধি সদৃশ। আর আল কাশ্‌শাফ হলো নিরাময়কারী"।

১০. হাদিসের প্রতি অপেক্ষাকৃত কম মনোযোগ দিয়েছেন।

১১. প্রাচীন সাহিত্য থেকে বহু অংশ উদ্বৃত করে স্বীয় ব্যাখ্যা সমর্থন করেন।[৩১]

১২. গ্রন্থকার তাফসির করার সময় সর্বদা মু'তাযিলা দৃষ্টিভঙ্গি জাগরুক রেখেছেন। তাই দেখা যায়, তিনি الحمد لله এর ال কে ইসতিগরাকী না ধরে جنسية গণ্য করেছেন। কারণ মানুষ তার কাজের স্রষ্টা হিসেবে সেও প্রশংসার হকদার, শুধু আল্লাহ তায়ালাই নন। তাই তিনি বলেন الحمد لله এর ال হলো أرسلها العراك-এর ال অনুরূপ।

১৩. আয যামাখশারী ফিকহী মাসয়ালায় ইমাম আবু হানিফার অনুসারী ছিলেন। তবে আল কাশ্‌শাফের আলোচনায় তিনি ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। পক্ষে-বিপক্ষে উভয় দিকের দলিল-প্রমাণ পেশ করেছেন। কারো সম্পর্কে কোনোরূপ কটূক্তি করেননি বা গোঁড়ামী প্রদর্শন করেননি। তাই দেখা যাচ্ছে, يسئلونك عن المحيض শীর্ষক আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বিভিন্ন মাযহাবের উক্তি বর্ণনা করে حتى يطهرن -এর ব্যাপারে ইমাম শাফিয়ীর উক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ হায়েজের মুদ্দাত পূর্ণ হয়ে বন্ধ হলেও গোসল করা ব্যতীত সহবাস বৈধ হবে না। তদ্রুপ اويعفو الذى بيده عقدة النكاح -এর মধ্যে الذى بيده দ্বারা ওলী অথবা স্বামীকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম যামাখশারী এখানে ইমাম শাফিয়ীর মত তথা ওলী হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এভাবে فطلقوهن لعدتهن -এর ব্যাখ্যায় তিনি চার মাযহাবের উক্তি ও যুক্তি উল্লেখ করেছেন। কোনো পক্ষের অনুকূলে রায় ঘোষণা করেননি। অতএব দেখা যায়, তিনি ফিক্‌হী দৃষ্টিকোণ থেকে হানাফী হওয়া সত্ত্বেও উদারপন্থী ছিলেন।[৩২]

১৪. আল কাশ্‌শাফে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত স্বল্পই স্থান পেয়েছে। কদাচিৎ যেসব রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে روى (বর্ণিত হয়েছে) শব্দ যোগ করা হয়েছে। এটা বর্ণনার দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করে অথবা এটার সত্য মিথ্যার দোষ আল্লাহর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে- যদি তা এমন বিষয়ভুক্ত হয় যে, তার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সাথে দীনের কোনো সম্পর্ক নেই।

পক্ষান্তরে যার সাথে দীনের কোনোরূপ সম্পর্ক আছে তা উল্লেখ করার পর তিনি তার শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হওয়া সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। যেমন: وانى مرسلة اليهم بهدية (النمل : ٣٠) -এর ব্যাখ্যায় যা কিছু উল্লেখ করেছেন, তা তিনি روى (বর্ণিত) শব্দে উল্লেখ করেছেন। তদ্রুপ فاوقدْ لى يا هامان علي الطين فاجعل لى

---

৩১. ইসলামী বিশ্বকোষ ২ : ২৮৭ এবং ৭ : ৪৮৪
৩২. আত তাফসির ওয়াল মুফাস্‌সিরুন, ১ : ৪৭৪

(القصص : ٣٨) صرحًا আয়াতের ব্যাখ্যায় যে সব বর্ণনা উল্লেখ করেছেন তা তিনি روى শব্দ দিয়ে উল্লেখ করে শেষে والله اعلم بصحته বলে শেষ করেছেন। এভাবে نبأالخصم اذ تسوروا المحراب আয়াতের একটি মানানসই ব্যাখ্যা দেয়ার পর বলেন, উরিয়া হিত্তির স্ত্রীকে বিবাহ করার জন্য তার স্বামীকে যুদ্ধের ভয়াবহ স্থানে বারবার প্রেরণের যে কেচ্ছা আছে তা একজন নবীর জন্যে তো দূরের কথা, একজন সাধারণ ঈমানদারের জন্যও শোভনীয় নয়। তাই তিনি এটাকে প্রত্যাখ্যান করেন। এভাবে (ص : ٣٤) ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسية جسدًا আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি পাহাড়ে সন্তান প্রতিপালন ও ৭০জন স্ত্রীর সাথে সহবাসের কথা উল্লেখ করে একেই মানানসই ও নির্দোষ ঘটনা বলে উল্লেখ করেন। এরপর তিনি এ সম্পর্কে বর্ণিত আংটি, শয়তান ও তার ঘরে মূর্তিপূজা সংক্রান্ত ঘটনাগুলো বাতিল বলে প্রত্যাখ্যান করেন।[৩৩]

১৫. গ্রন্থকার তাফসিরটি প্রশ্নোত্তর তরীকায় লিপিবদ্ধ করেছেন। নিজে আয়াতের উপর প্রশ্ন উথাপন করে নিজেই জবাব দিয়েছেন।

তাফসিরে কাশ্‌শাফের উপর লিখিত পুস্তকাদি: তাফসিরে কাশ্‌শাফের দুনিয়া জোড়া খ্যাতির কারণে মুহাককিক আলেমগণ এর উপর বিভিন্নরূপে কলম ধরেছেন। কেউ এর ই'তিযাল সম্পর্কিত বিষয়গুলো সনাক্ত করেছেন। কেউ এর ব্যাকরণ সম্পর্কিত বিষয়ের পক্ষে বিপক্ষে লড়াই করেছেন। অনেকে আবার টীকা লিখেছেন। অনেকে এতে বর্ণিত হাদিসগুলোর সনদসহ সংকলন করেছেন। কেউ আবার এর সারসংক্ষেপ লিখেছেন। নিম্নে এরূপ হাদিস রচনাবলীর কয়েকটির তালিকা ও লেখকের নাম পেশ করা হলো :

০১. আল ইনতিসাফ মিনাল কাশশাফ : الانتصاف من الكشاف নাসীরুদ্দীন আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনিল মুনায়্যির আল ইসকান্দারী আল মালেকী (মৃত্যু ৩৮৬/১২৮৪)। এটি আল কাশশাফের ভ্রান্তি খণ্ডনে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

০২. আল ইনসাফ (الانصاف) আলামুদ্দিন আব্দুল করিম ইবনে আলী আল ইরাকী (মৃ. ৭০৪ হি.)। এতে গ্রন্থকার আল কাশশাফ এবং আল ইনতিসাফ -এর মধ্যে মীমাংসাপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

০৩. জামালুদ্দিন আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ ইবনে হিশাম (মৃ. ৭৬২ হি.), তিনি পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয় (আল ইনতিসাফ ও আল ইনসাফ)-কে সংক্ষিপ্তাকারে সংকলন করেছেন। উল্লেখিত ৩খানি গ্রন্থ ছাড়াও অনেকে এর টীকাভাষ্য লিখেছেন।

০৪. কুতবুদ্দীন মাহমুদ ইবনে মাসউদ আশশিরাজী (মৃত্যু ৭১০হি.), তিনি দুই খণ্ডে আল কাশশাফের টীকাভাষ্য রচনা করেছেন।

০৫. ফখরুদ্দীন আহমদ ইবনে হাসান আল জারবরদী (মৃ.৭৪৬ হি.), তিনি টীকাভাষ্য লিখেছেন।

০৬. শরফুদ্দীন আল হাসান ইবনে মুহাম্মদ আততীবী রহ. (মৃ. ৭৪৩ হি.), তিনি ফুতহুল গাইব ফিল কাশফে আন কানাই'র রাইব। فتوح الغيب في الكشف عن قناع

৩৩. আত তাফসির ওয়াল মুফাস্‌সিরুন, ১ : ৪৭৬-৪৮২

الريب নামক ছয় খণ্ড সম্বলিত বৃহদাকারের ভাষ্য লিখেছেন আর এটিই হলো আল কাশশাফের সর্বোত্তম ভাষ্য।

০৭. আকমালুদ্দিন মাহমুদ আল বাবারতী (৭৮৬ হি.), টীকা লেখক।

০৮. সা'দুদ্দীন মাসউদ ইবনে উমার আত্ তাফতাযানী (মৃ.৭৯২ হি.)। তিনি আততীবী রচিত ভাষ্যের সারসংক্ষেপ লিখেন কিন্তু সমাপ্ত করতে পারেননি। সূরা আল ফাতহ পর্যন্ত লিখেই ক্ষান্ত হন।

০৯. কুতবুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আত তাহতানী আররাযী (মৃ.৭৬৬ হি.) টীকা লেখক। এগুলো ব্যতীত আরো অনেকে ভাষ্য এবং ভাষ্যের ভাষ্য রচনা করেছেন। যা ইমাম সুয়ূতী ও হাজ্জী খলিফা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। অনেকে আবার আল কাশশাফের কোনো কোনো স্থানে কিছু অংশ সংযোজন করেছেন।

১০. কামালুদ্দীন ইসমাঈল আল কিরমানী।

১১. শামসুদ্দীন আহমাদ ইবনে সুলায়মান ইবনে কামাল পাশা আল মুফতী (মৃ. ৯৪০ হি.) -এর সংযোজনীটি উচ্চ মানের।

১২. আল মাওলা মাহদী আশশিরাজী (মৃ. ৯৫৬ হি.), অনেকে একে সংক্ষিপ্তাকারে সংকলন করেছেন।

১৩. আশ শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আলী আন নাসাবী (মৃ.৬৬২ হি.), তিনি একে ই'তিযাল থেকে মুক্ত করেছেন।

১৪. কুতবুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মাসউদ ইবনে মাহমুদ ইবনে আবিল ফাতহ আসসাররাফী (তাকরীবুত তাফসির)

১৫. আলকাজী নাসিরুদ্দিন আবদুল্লাহ ইবনে উমার আলবায়দাবী (মৃ. ৬৯২ হি.) أنوار التنزيل و أسرار التاويـــل এটা আল কাশশাফের সর্বোৎকৃষ্ট সারসংক্ষেপ। এতে তিনি ই'তিযাল খণ্ডন করতে গিয়ে অতিরিক্ত অনেক তত্ত্বের সন্নিবেশ করেছেন। মোটকথা বৈশিষ্ট্যময় একখানি তাফসির গ্রন্থ হিসাবে এটা জগৎ বিখ্যাত।

• অনেকে এর হাদিসসমূহ তাখরীজ করেছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১৬. জামালুদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ আযযায়লায়ী আল হানাফী (মৃ. ৭৬২ হি.)।

১৭. الكافي الشاف في تخريج احاديث الكـــشاف হাফিজ আহমাদ ইবনে আলী ইবনে হাজর আল আসকালানী (মৃ. ৮৫২ হি.)। এটা মূলত ইমাম যায়লায়ীর কিতাবের সারসংক্ষেপ। এছাড়া আল কাশশাফে উল্লেখিত কবিতা ও প্রবাদ, এর ভূমিকা ইত্যাদির উপরও অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে।[৩৪]

কাশশাফের পক্ষে-বিপক্ষে:

০১. বিশিষ্ট শাফিয়ী ফকীহ ইমাম তাজুদ্দীন আস সুবকী, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন, নামকরা মুফাসসির আবু হাইয়ান আন্দুলুসী, ইবনে বাশকুওয়াল, তথা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অন্তর্গত ও বাইরের সকল আলেম ও বিজ্ঞজন এই তাফসিরের ভাষা ও আলংকারিক বৈশিষ্ট স্বীকার করে এর উচ্চ প্রশংসা

৩৪. ইসলামী বিশ্বকোষ ৭ : ৪৮৬-৪৮৭ পৃ.।

করেছেন। তবে সাথে সাথে এর তথ্যগত ও উদ্দেশ্যগত ভাবের বিচ্যুতিগুলোর প্রতি অংগুলি নির্দেশ করেছেন।

০২. ইমাম যামাখশারী র.-এর কঠোর সমালোচক ইমাম হায়দার আল হারাবী পর্যন্ত বলেছেন, আল কাশশাফ একখানি মহামূল্যবান গ্রন্থ। এর মর্যাদা অতি উচ্চে। প্রাচীনদের রচনায় এর তুলনা পাওয়া যায় না। উত্তরকালেও এরূপ কোনো গ্রন্থ সংকলিত হয়নি। এর সুগঠিত ও প্রাঞ্জল বাক্যবিন্যাস সম্পর্কে বিজ্ঞজনদের ঐকমত্য সাধিত হয়েছে। এর সুদৃঢ় ও উন্নত বাচনভঙ্গী জ্ঞানী-গুণী ও পারদর্শীদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। তাফসিরের নীতি নির্ধারণ, দলিল-প্রমাণ পরিবেশন, সূত্রাবলীর বিন্যাস, দাবি ও উদ্দেশ্য দৃঢ়করণে এতে কোনো প্রকার ত্রুটি নেই।

০৩. ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী র. বলেন, ইলমুল বালাগাতের মাধ্যমেই আল কুরআনের ই'জাজ (অলৌকিকত্ব) উপলব্ধি করা যায়। এ বিষয়ে আল কাশশাফের রচয়িতা ছিলেন শ্রেষ্ঠ সম্রাট। ফলে তাঁর এই গ্রন্থ উদয়াচল থেকে অস্তাচল (পূর্ব থেকে পশ্চিম) পর্যন্ত পাখা বিস্তার করেছে (ই.বি. কোষ, ৭ : ৪৮৪)। শায়খ হায়দার আল হারাবী আরো বলেন, আয যামাখশারী যেহেতু সাহিত্যসুলভ মনোভাব নিয়ে পথ চলেছেন এবং এই দিকের পরিমার্জনের প্রতিই অধিক যত্নবান ছিলেন, সেই অবকাশে তাঁর মাঝে সাহিত্য বৃত্তি শিকড় গেড়েছে। আর মু'তাযিলাদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি চরমভাবে আকৃষ্ট থাকার কারণে তিনি গুণীদের শুভদৃষ্টি হতেও বঞ্চিত হয়েছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে এমন কিছু বিষয়ের অবতারণা করেছেন যা গ্রন্থের ঔজ্জ্বল্য ম্লান করে দিয়েছে। তাতে এর গতিপথ পরিচ্ছন্ন থাকেনি। ফলে এর প্রবেশ পথ সংকীর্ণ হয়েছে।[৩৫]

০৪. ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, আয যামাখশারীর তাফসিরটি বেদায়াতে পরিপূর্ণ। মু'তাযিলাদের পদ্ধতিতে রচনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহর গুণাবলী ও পরকালে আল্লাহ দর্শন অস্বীকার করা হয়েছে। কুরআনকে সৃষ্ট বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া আল্লাহ তায়ালাকে বান্দার কাজের স্রষ্টা এবং ইচ্ছা পোষণকারী হওয়াকে অস্বীকার করাসহ মু'তাযিলাদের পঞ্চস্তম্ভ দ্বারা একে ভরপুর করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আয যামাখশারী তাঁর কিতাবে মু'তাযিলাদের এই পঞ্চ মূলনীতি এমন ভাষায় উল্লেখ করেছেন যার রহস্য ও উদ্দেশ্য অধিকাংশ লোকই বুঝতে পারে না। এছাড়া এতে রয়েছে অনেক মিথ্যা হাদিস। উপরন্তু এতে সাহাবা ও তাবেয়ীদের উক্তি খুবই কম।[৩৬]

তাফসিরে কাশশাফের বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতি: সাহিত্যের প্রতি ইমাম যামাখশারীর অত্যধিক ঝোঁক এবং ই'তিযালী মতাদর্শের প্রতি তার গোঁড়ামী স্বভাবতই তাফসিরে কাশশাফের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। আরবি ভাষা সাহিত্য ঝংকারে তাফসিরখানি সর্বোচ্চ স্থানে সমাসীন হলেও ই'তিযাল সংক্রান্ত ভ্রান্তি ও বিচ্যুতির দোষে তাফসিরখানি অনেকাংশে দুষ্ট হয়েছে। পরবর্তী মুহাক্কিকগণ সেসব ভ্রান্তি ও বিচ্যুতির প্রতি অংগুলি নির্দেশ করেছেন। এছাড়া তাঁরা বিভিন্ন পুস্তক রচনা করেও এসব বিচ্যুতি সনাক্ত করেছেন। নিম্নে আমরা এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করছি।

---

৩৫. ইসলামী বিশ্বকোষ ৭ : ৪৮৫
৩৬. আল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া ১৩ : ৩৮৬ - ৩৮৭

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের পাঁচটি মূলনীতি:

প্রথম মূলনীতি: তাওহীদ বা একত্ববাদ। তাদের নিকট এ মূলনীতির রহস্য হলো, আল্লাহ তায়ালাকে সকল গুণাবলী থেকে মুক্ত রাখা বা গুণাবলী অস্বীকার করা। তারা আল্লাহর জন্য রহমান, রহীম, সামী', বাসীর এরূপ গুণবাচক নাম স্বীকার করলেও রহমত, শ্রবণ, দেখা এসব গুণবাচক নাম অস্বীকার করে। কারণ এতে নাকি আল্লাহর তাওহীদ বিনষ্ট হয়ে যায়। মূলত এটা হলো : الحاد في أسماء الله واياته।[৩৭]

এ কারণে ইমাম যামাখশারী তাঁর তাফসিরে সকল গুণবাচক নামের গুণগুলোকে সরাসরি অর্থে গ্রহণ না করে ওগুলোর রূপক বা অনিবার্য অর্থ গ্রহণ করেছেন। যেমন সূরা ফাতিহার الرحمن الرحيم শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা নেয়ামত দান করেছেন। এ কারণে তারা আল্লাহ দর্শনকেও অস্বীকার করে। যেমন : وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة "সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে" এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুমিনরা পরকালে আল্লাহ তায়ালাকে দেখতে পাবে। এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আকীদা।

কিন্তু মু'তাযিলাদের বিশ্বাসমতে এটা তাওহীদের খেলাপ। কারণ এতে নাকি আল্লাহ তায়ালার দেহ ও মুখমণ্ডল হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাই যামাখশারী এ আয়াতে ناظرة শব্দের অর্থ করেছেন : التوقع والرجاء الى رحمة الله আশা আকাঙ্ক্ষা। অর্থাৎ মুমিনরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার আশা ও আকাঙ্ক্ষা করবে। এভাবেই আল কুরআনের কোনো আয়াতের বাহ্যিক অর্থ যদি মু'তাযিলা চিন্তাধারার খেলাফ হয় তাহলে অন্যান্য মু'তাযিলার ন্যায় আয যামাখশারীও বাহ্যিক অর্থ বর্জন করে এমন কোনো রূপক অর্থ গ্রহণ করেন যা তাঁর আকীদার অনুকূল।[৩৮]

দ্বিতীয় মূলনীতি: আল আদল (ন্যায়)। তাঁরা নিজেদেরকে আসহাবুল আদল তথা ন্যায়ের অনুসারী বলে দাবি করেন। তাদের নিকট এর অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালা ন্যায়-নীতিবান। তিনি কাউকে বিনাদোষে শাস্তি বা বিনা কারণে পুণ্য দিবেন না। অতএব বান্দা তার কাজের জন্য যে পূণ্য বা শাস্তি ভোগ করে সে কাজ আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেননা, বরং বান্দা নিজেই তার স্রষ্টা। তাই পাপ- পুণ্যের শাস্তি ও পুরস্কার পাওয়া তার কর্মফল। এ আকীদার অনিবার্য দাবি হলো, তাকদীর অস্বীকার করা।[৩৯] তাদের বক্তব্য হলো, বান্দা নিজেই তার কাজের স্রষ্টা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقة العذاب •

তৃতীয় মূলনীতি: দুই প্রান্তিক অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থা। অর্থাৎ তাদের আকীদা হলো, পাপীকে মুমিনও বলা যাবে না আবার কাফিরও বলা যাবে না, বরং এ দুই অবস্থার মাঝামাঝি অর্থাৎ ফাসিক বলতে হবে। আর ফাসিক ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী। যামাখশারী তাঁর তাফসিরে এই নীতি অবলম্বন করেছেন। এতে মূলত মুসলিম সমাজ বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছে।

---

৩৭. প্রাগুক্ত
৩৮. আত্ তাফসির ওয়াল মুফাস্সিরুন ১ : ৪
৩৯. আল ফাতাওয়া, ইবনে তায়মিয়া ১৩ : ৩৮৬

চতুর্থ মূলনীতি: ওয়াঈদ (وعيد) তথা শাস্তির হুঁশিয়ারী বাস্তবায়ন করা জরুরী। তাদের মতে এর অর্থ হলো, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা মুসলিম অপরাধীদের উদ্দেশে কঠোর হুঁশায়ারী উচ্চারণ করেছেন, তাই তিনি তা অবশ্যই বাস্তবায়ন করবেন। অতএব মুসলিম সম্প্রদায়ের ফাসিকরা চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। বস্তুত এটা খারেজী সম্প্রদায়েরও আকিদা।[৪০] এ কারণে যামাখশারী তাঁর তাফসিরে ফাসিকদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলে সিদ্ধান্ত জানিয়ে মুসলমানদেরকে মহাবিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছেন।

পঞ্চম মূলনীতি: সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। মূলত তাদের মতে এর ব্যাখ্যা হলো, তাদের আকীদা বিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ও তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা কর্তব্য। এসব মূলনীতি যামাখশারী তাঁর তাফসিরে স্থান দিয়েছেন।[৪১]

বিচ্যুতিসমূহ

ক. এই গ্রন্থে মু'তাযিলী চিন্তাধারা প্রমাণের উপর অত্যধিক জোর দেয়া হয়েছে। মু'তাযিলা সম্প্রদায় নিজেদেরকে আসহাবুল আদল ওয়াত তাওহীদ (أصحاب العدل التوحيد ন্যায় ও একত্বের অনুসারী) বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। এই গ্রন্থে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, এই মতের অনুসারীরাই সত্যিকারের ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা এই মতের অনুসারী নয় তাদের দীন আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তারা আখেরাতে মুক্তি পাবে না। সুতরাং

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ • (آل عمران : ١٨)

আয়াতে উল্লেখিত واولوا العلم দ্বারা اصحاب العدل والتوحيد তথা মু'তাযিলা সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে বলে যামাখশারী দাবি করেছেন। তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: জ্ঞানীগণ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? কাদের এ মর্যাদা যে, আল্লাহ তাঁর তাওহীদ ও ন্যায়-এর লক্ষ্যে তাদেরকে নিজের এবং ফেরেশতাদের সাথে একত্রে উল্লেখ করলেন। আমি বলবো যে, তারা ঐসব লোক যারা আল্লাহর একত্ব ও ন্যায়পরায়ণতা অকাট্য দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ করেন। বস্তুত তারাই হলেন আল আদল ওয়াত তাওহীদের ওলামা।

যদি জিজ্ঞেস করেন যে, পরবর্তী আয়াত ان الدين عند الله الاسلام -এর বিষয়বস্তুকে এতো দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপন করা হলো কেনো? আমি বলবো, পূর্বের আয়াতে لا اله الا هو হলো তাওহীদ এবং قَائِمًا بِالْقِسْطِ হলো তা'দীল। এর অব্যবহিত পর ان الدين عند الله الاسلام এই কথায় যেনো ঘোষণা দেয়া হলো, আল আদল ওয়াত তাওহীদই হলো ইসলাম। এটাই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন। এটা ভিন্ন অন্য কিছু তাঁর নিকট দীন নয়।

সুতরাং যে কেউ তাশবীহ করবে (মানুষের মধ্যে যেসব গুণাবলী আছে, যথা দর্শন, শ্রবণ, কথন ইত্যাদি আল্লাহর মধ্যেও আছে বলে ধারণা করবে, অথবা এমন

---

৪০. প্রাগুক্ত ১৩ : ৩৮৭
৪১. আল ফাতাওয়া ১৩ : ৩৮৭

কোনো কথা বলবে যা তাশবীহে পৌছায়, যেমন আল্লাহকে দেখা যাবে বলে ধারণা করিবে), এমনিভাবে যারা আল জাবর (الجبر) (অর্থাৎ আল্লাহ মানুষের ভালমন্দ সকল কাজের স্রষ্টা, স্বয়ং মানুষ তার কর্মের স্রষ্টা নয়, সবকিছু তাকদীর দ্বারা পরিচালিত হয় ইত্যাদি) -এর আকীদা পোষণ করবে, যা নিছক জুলুম বৈ কিছু নয়, তারা আল্লাহর দীনের উপর থাকবে না।[৪২]

খ. এই গ্রন্থে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করা হয়েছে। তাদেরকে আল হাশবিয়া, আল জাবারিয়া, আল কাদারিয়া, আল মুশাববিহাসহ বিভিন্ন বাতিল ফিরকার নামে ভূষিত করা হয়েছে। যেমন واما ثمود فهديناهم (সূরা ৪১ : আয়াত ১৭) আয়াতের আলোকে যামাখশারী প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন যে, 'কাদর'-এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীরাই হলো القدرية যাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা. বলেন: القدرية مجوس هذه الامة রসূলুল্লাহ সা. এই হাদিসর দ্বারা কাদারিয়াদের নিন্দা না করলেও উল্লেখিত আয়াতটিই তাদের নিন্দার জন্য যথেষ্ট।[৪৩]

গ. আওলিয়ায়ে কিরাম সম্পর্কেও এই গ্রন্থে অত্যন্ত অশ্লীল মন্তব্য করা হয়েছে। ইমাম রাযী يحبهم ويحبونهم আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন: আল কাশশাফ প্রণেতা এই স্থানে আল্লাহর ওলীগণের সমালোচনা করেছেন। তিনি তাদের সম্পর্কে এমন সব মন্তব্য লিখিছেন যা কোনো বিদ্বান ব্যক্তি অশ্লীল পুস্তকে পর্যন্ত উল্লেখ করতে সমীচীন মনে করেন না।

ঘ. নিম্নের আয়াতের ব্যাখ্যায় রসূলুল্লাহ সা. সম্পর্কে অশ্লীল ও অসৌজন্যমূলক উক্তি করা হয়েছে : عفا الله عنك- (তাহরীম- ৬৬/১)

ঙ. এতে এমন অনেক কবিতা ও প্রবাদ উল্লেখিত হয়েছে যার ভিত্তি নিছক হাস্যরসের উপর। আল কুরআনের তাফসিরের জন্য তা আদৌ শোভনীয় নয়।

চ. তিনি এ গ্রন্থে হাদিস খুব বেশি আনেননি। তবে ফাজায়েল সংক্রান্ত ব্যাপারে যেসব হাদিস এনেছেন তার অধিকাংশই মিথ্যা ও দুর্বল। এটা তাঁর তাফসিরের বড়ো একটি ত্রুটি।[৪৪]

ছ. ইমাম যামাখশারী তাঁর তাফসিরের মধ্যে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতকে এই বলে অভিযুক্ত করেছে যে, তারা নিজেরা রাতের বেলা নির্লজ্জ কাজকর্ম করে, দিনের বেলা সেগুলো আল্লাহর কর্ম বলে চালিয়ে দেয়। তাইতো তিনি قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন :

واما قول من زعم ان الضمير فى زكى و دسى لله تعالى وان تانيث الربع الى من لانه فى معى النفس، فمن تعكس القدرية الذين يوركون على الله قـــدرا هو برئ منه ومتعال منه ويحيون لياليهم فى تحمل فاحثنه ينسبوها الى الله •

"যারা মনে করে যে, মানুষকে পরিশুদ্ধ ও অপরিশুদ্ধের কর্তা হলেন আল্লাহ তায়ালা, এ উক্তি মূলত কাদারিয়াদের ডিগবাজী, যারা সব কাজের ক্ষমতা আল্লাহর হাতে সোপর্দ

---

৪২. আত তাফসির ওয়াল মুফাস্সিরুন ১ : ৪৬৪ - ৪৬৭

৪৩. ইসলামী বিশ্বকোষ ৭ : ৪৮৬

৪৪ . প্রাগুক্ত ৭ : ৪৮৬

করে দিচ্ছে, অথচ আল্লাহ তায়ালা এর থেকে মুক্ত ও বহু উর্ধে। তারা রাতের বেলা নির্লজ্জ কাজকর্ম করে সেগুলো আল্লাহর কর্ম বলে চালিয়ে দিচ্ছে"।[৪৫]

জ) ইমাম যামাখশারী তাঁর তাফসিরের মধ্যে যেসব আয়াত কাফেরদের শানে নাযিল হয়েছে সেগুলো তিনি তাঁর বিরোধী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উপর প্রয়োগ করার অবান্তর চেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ সূরা আল ইমরানের ১০৫ নং আয়াত : وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ- এ আয়াত ইয়াহুদী ও নাসারাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে একথা ইমাম যামাখশারী স্বীকার করার পর বলেন, এ আয়াতখানি বর্তমান যুগের বিদয়াতী গ্রুপ তথা মুজাবিরা, হাশবিয়া এবং অনুরূপ আকীদাপন্থীদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য।

তদ্রুপ সূরা ইউনুস এর ৩৯ নং আয়াত :

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ

এ আয়াতখানি আহলে কিতাবের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। ইমাম যামাখশারী এ আয়াতের তাফসির করার পর বলেন, كالنا شي على التقليد من الحشوية من احس بكلمة لا توافق ما نشا عليه و الفه انكرها في اول وهلة "যেমন হাশবিয়া গ্রুপ যারা তাকলীদ তথা অন্ধ বিশ্বাসের উপর গড়ে উঠেছে। যখন এমন কোনো মতবাদ দেখতে পায় যা তার পরিচিত ও গড়ে উঠা মতবাদের সাথে সামাঞ্জস্যহীন তখন তারা তা সংগে সংগেই প্রত্যাখ্যান করে দেয়"।[৪৬] এখানে হাশবিয়া দ্বারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতকে বুঝানো হয়েছে।

এ রকম অসংখ্য উদাহরণ তাঁর তাফসির গ্রন্থে রয়েছে যেখানে তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতকে বাতিল আখ্যা দিতে এবং নিজের মু'তাযিলী মতকে সঠিক আখ্যা দিতে কার্পণ্য করেননি।

ইমাম যামাখশারী সম্পর্কে মন্তব্য: ইমাম যামাখশারীর ই'তিযালী আকীদার কারণে অনেক মনীষী তাঁর কঠোর সমালোচনা করেছেন, তাকে বাতিল ও বিদায়াতী আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর ভ্রান্ত মতবাদকে খণ্ডন করে বিভিন্ন পুস্তক রচনা করেছেন। তার ভ্রান্ত মতবাদের মুখোশ উন্মোচনকারীদের মধ্যে রয়েছেন আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম জাওজিয়া, আল্লামা আহমাদ ইবনু মুনীর ইসকান্দারিয়ার কাযী ও অন্যান্যরা। বিশেষ করে ইস্কান্দারিয়ার কাযী আল্লামা আহমাদ ইবনু আহমদ ইবন মানসুর আল মুনীর আল মালেকী ইনসাফ নামক কিতাব রচনা করে ইমাম যামাখশারীর ই'তেযালী আকীদাগুলো চিহ্নিত করে এগুলো বাতিল করে দেন। তিনি এর মাধ্যমে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষে বাতিলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি একে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ বলে বিশ্বাস করতেন।

***

৪৫. আত তাফসির ওয়াল মুফাস্‌সিরুন ১ : ৪৬৬
৪৬. প্রাগুক্ত

(৪)

ইবনে আতিয়া ও তাঁর তাফসির
আল-মুহাররার আল-ওয়াজিয ফী তাফসীরিল কিতাবিল আযীয

মাওলানা শামাউন আলী

ভূমিকাঃ মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাযিল হয়েছে মানবতার মুক্তির জন্য। এর জ্ঞানই সর্বোত্তম জ্ঞান। মহানবী মুহাম্মদ সা. তাঁর সাহাবায়ে কিরামকে সরাসরি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। এর ব্যাখ্যা বা তাফসির করে তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ সা.-এর সময় পুরো কুরআনের তাফসির করার প্রয়োজন পড়েনি। সাহাবায়ে কিরাম যেখানে বুঝতে অসুবিধা মনে করতেন সেখানে রসূলুল্লাহ সা.-এর শরণাপন্ন হতেন। রসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবাগণ কুরআনের তাফসির করেছেন, অতঃপর তাবেঈ, তারপর তাবা-তাবেঈগণ। এভাবেই কুরআনের তাফসির হতে থাকে। পরবর্তীতে ইলমে তাফসিরের মাঝে ইসরাঈলিয়াত ও অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়, যেমন কুসংস্কার, বিদআত, শিরকী কথাবার্তা, দর্শন ইত্যাদির অনুপ্রবেশ ঘটে। তাফসির শাস্ত্রকে পুনরায় সালাফে সালেহীনের ধারায় যে মহান আলেমে দীন আবার ফিরিয়ে আনেন তিনি হলেন কাজী হাফেজ আবু মুহাম্মদ আব্দুল হক ইবনে আতিয়া রহ.।

পরিচিতিঃ তিনি কাজী, ফকীহ, হাফেজ আবু মুহাম্মদ আব্দুল হক বিন গালিব বিন আব্দুর রহমান ইবনে গালিব ইবনে তাম্মাম ইবনে আব্দুর রউফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে তাম্মাম ইবনে আতিয়া। স্পেনে হিজরত করে আগত ইবনে খালেদ ইবনে খাফফাফ আল-মুহারেবী।[১]

তাঁর বংশ পরিচয়ে কিছুটা মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কারণ কেউ কেউ এটিকে সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করেছেন আবার কেউ কেউ বিস্তারিতভাবে। প্রয়োজন ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এভাবে উল্লেখ করেছেন। আমরা এখানে একটি উদাহরণ তুলে ধরছি।

আবু হাইয়ান রহ. তাঁর তাফসিরের ১ম খণ্ডের ৯ম পৃষ্ঠায় বলেন, "তিনি আবু মুহাম্মদ আব্দুল হক বিন গালিব বিন আতিয়া আন্দালুসী, মাগরেবী, গারনাতী।

তিনি আবার দশম পৃষ্ঠায় বলেন, "আবু মুহাম্মদ আব্দুল হক বিন গালিব বিন আব্দুর রহমান বিন গালিব বিন তাম্মাম বিন আব্দুর রউফ বিন আব্দুল্লাহ বিন তাম্মাম বিন আতিয়া আল-মুহারেবী, গ্রানাডার অধিবাসী। ৪৮১ হিজরিতে রাসকা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৫৪১ হিজরির রমজান মাসে মৃত্যুবরণ করেন। এভাবেই কাজী ইবনু আবী হামযা উল্লেখ করেছেন।"

ইবনে ফারহুন রহ. তাঁর "আদ্দীবাজ আল মুজাহ্হাব" নামক গ্রন্থে বলেন, "আব্দুল হক বিন গালিব বিন আব্দুর রহমান বিন আসলাম বিন মুকরাম আল মুহারেবী, তাঁর উপাধি আবু মুহাম্মদ। তিনি জায়দ ইবনে মুহারেবির বংশধর, ৪৮১ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৪৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। কর্মজীবনে তিনি একবার কাজী হিসেবে নিয়োগ পান কিন্তু তাঁর দৃঢ়চেতা মানসিকতার কারণে এই পদে বেশি দিন থাকতে পারেন নি। তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় জিহাদে অতিবাহিত করেন।"[২]

---

১. বুগয়াতুল মুলতামিস, পৃ. ৩৩৯
২. বুগয়াতুল উয়াত, ২/৭৩

ইবনে আতিয়া রহ.-এর সমকালীন অবস্থা

রাজনৈতিক অবস্থা : ইবনে আতিয়ার জীবনকালে স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থা ছিলো খুবই সংঘাতময় ও অস্থিরতায় ভরা। বিচ্ছিন্নতা ও পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণে উম্মতের মাঝে দুর্বলতার সৃষ্টি হয়। মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উমাইয়া খেলাফতের অবসান ঘটে এবং মরক্কোর সাথে খেলাফতের যে যোগসূত্র ছিলো তা ছিন্ন হয়ে যায়। বারবাররা (বেদুঈন ও দাস সম্প্রদায়) বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষমতা দখল করে নেয়। নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তারা একে অপরের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে।[৩]

এই রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যেই মুরাবেতিনরা তাদের উপর ৪৮৪ হি. থেকে ৫৪১ হি. পর্যন্ত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে রাখে। এরপর মুরাবেতীনরাও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং স্পেনের উপর খৃষ্টানদের আক্রমণ শানিত হতে থাকে।[৪]

সে সময়ের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও যুদ্ধ বিগ্রহে ক্ষয়ক্ষতির কথা উল্লেখ করে আবু মুহাম্মদ ইবনে হাজম রহ. বলেন, দেশ মরুভূমিতে পরিণত হয়। নিরাপত্তার স্থলে ভয়-ভীতি জনগণকে আতংকিত করে রাখে। দেশ যেন হিংস্র পশুতে ভরে গেছে।[৫]

সামাজিক অবস্থা: রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও এ সময়ে স্পেনবাসী খুবই বর্ণাঢ্য জীবন যাপন করতো। তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিলো। আমীর-ওমরাদের মতো অনেক লোকজনই চরম ভোগবিলাসে মগ্ন হয়ে পড়ে। বেশিরভাগ বালাখানা গান-বাজনা ও সুন্দরী তরুণীদের নাচের আড্ডাখানায় পরিণত হয়। 'তাওয়ায়েফ'দের শাসনামলে এই সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটে।[৬]

স্পেনের মুসলিম সমাজ কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের দিক থেকে। স্পেনীয় সমাজ মূলত গড়ে উঠে আরবদের দ্বারা কিন্তু তাদের মাঝে অন্ধ গোত্রপ্রীতির সুযোগে উত্তরের খৃষ্টানরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ পরিচালনার সুযোগ পেয়ে যায়।

স্পেনের মুসলিম অধিবাসীদের মাঝে আরেকটি গোষ্ঠী ছিলো 'বারবার' যারা বিজয় ছিনিয়ে আনতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু তারা পরবর্তীতে বিদ্রোহ করে নিজেরাই অনেক অঞ্চলের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নেয়। স্পেনের আরেক জনগোষ্ঠী ছিলো 'সাকালিব'। তারা যুদ্ধবন্দী বা বিজিত জাতি থেকে মুসলিম সমাজে একীভূত হয়ে যায়।[৭]

ইলমী বা শিক্ষাগত অবস্থা: স্পেনে রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও ইলমী দিক দিয়ে ছিলো চরম উৎকর্ষতার দিকে ধাবমান। স্পেন ছিলো সে সময় জ্ঞানের পাদপীঠ। স্পেনে ছিলো সে সময়ের কিতাবপত্রের সবচেয়ে বড়ো মার্কেট।

তিলেমসানী রহ. বলেন, জ্ঞানের দিক দিয়ে স্পেনবাসী ছিলেন সবচেয়ে আগ্রহী। তাদের মধ্যে একজন জাহেল ব্যক্তিও আপ্রাণ চেষ্টা করতো যেনো সে কোনো শিল্প দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। সে নিজেকে প্রমাণ করে যে, সে কোনো অংশেই অন্যের চেয়ে কম নয়। তাদের নিকট সব ধরনের জ্ঞানই ছিলো গুরুত্বের দাবিদার, দর্শন শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা ব্যতীত। কুরআনের সাত কিরায়াত এবং হাদিস এর বর্ণনার

---

৩. নাফহুত্ তীব ১/৩৩৮-৩৩৯
৪. প্রাগুক্ত ১/৩৩৯
৫. তাওকুল হামামাহ পৃ. ৯২
৬. দুওয়ালুত তাওয়ায়েফ- মুহাম্মদ আনান, পৃ. ৪১৯
৭. তারিখুল ইসলাম- ড. হাসান ইবরাহীম হাসান পৃ. ৫৯০-৫৯১

ইলম ছিলো সর্বোচ্চ পর্যায়ে। ফিকহ এর মর্যাদা ছিলো প্রশংসনীয় আর নাহু (আরবি ব্যাকরণ) ছিলো সবদিক দিয়েই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে।[৮]

এ রকম ইলমী উৎকর্ষতার যুগে ইবনে আতিয়ার মতো একজন বড়ো মানের আলেম ও মুফাসসিরের জন্মগ্রহণ খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তাঁকে স্পেনের একজন সর্বশ্রদ্ধেয় মহান আলেম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়ে থাকে।[৯]

শিক্ষা জীবনঃ ইবনে আতিয়া তাঁর পিতার নিকট থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাদের পরিবার ছিলো স্পেনের মধ্যে একটি আলেম পরিবার। নাবাহী বলেন, "তাদের বাড়িটি ছিলো ইলম, সম্মান, দানশীলতা ও ভদ্রতায় পরিপূর্ণ।"[১০] ইবনে আতিয়া তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ আলেমদের নিকট থেকে দীনী ইলম শিক্ষা করেন। তার উস্তাদদের অন্তর্ভুক্ত হলেন :

১. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ফারায মাওলা বিন তাল্লা। তিনি ৪৯৮হি. সনে ইন্তেকাল করেন।[১১]

২. হাফিয হোসাইন বিন মুহাম্মদ বিন আহমাদ আবু আলী আল গাসানী। তিনি তার নিকট কবিতা, আরবি ভাষা এবং কতিপয় হাদিস গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। যেমন মুয়াত্তা মালেক। তাঁর এই উস্তাদ ৪৯৮ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। তিনি তাঁকে স্বহস্তে লিখিত সার্টিফিকেট প্রদান করেন।[১২]

৩. হাফেয আবু আলী হোসাইন বিন মুহাম্মদ বিন সাকরা আস-সাদাফী, মৃত ৫১৪হি.। তিনি তাঁর নিকট তিরমিযী এবং তারীখুল কাবীর অধ্যয়ন করেন।[১৩]

৪. ইবনে আতিয়ার নিজ পিতা হাফেয আবু বকর গালিব বিন আব্দুর রহমান। তিনি তার পিতার নিকট হাদিস, তাফসির, ফিকহ, সিরাত ও আরবি ব্যাকরণ শিক্ষালাভ করেন। তার এই উস্তাদ পিতা ৫০৮ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।[১৪]

৫. ফকীহ আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ ইবনে আত্তাব আল কুরতুবী। তাঁর এই উস্তাদ ৫২০ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।[১৫]

৬. ইমাম আবুল হাসান আলী ইবন আহমাদ ইবন খালাফ আল আনসারী ইবন আতিয়া তাঁর নিকট ব্যাকরণবিদ সীবাওয়ায়হি-এর কতিপয় কিতাব অধ্যয়ন করেন। তাঁর এই উস্তাদ ৫২৮হি. সনে ইন্তিকাল করেন।[১৬]

আরো বেশ কয়েকজন উস্তাদের নিকট থেকে ইবন আতিয়া শিক্ষা লাভ করেন।

ইবন আতিয়ার উল্লেখযোগ্য কতিপয় ছাত্রের নামঃ ইমাম ইবন আতিয়া জ্ঞানগত দিক থেকে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। চারদিকে তাঁর জ্ঞানের কথা ছড়িয়ে

---

৮. নাফহুত তীব পৃ. ১৮১
৯. মানহাজু ইবনে আতিয়া ফী আরদিল কিরায়াত ওয়া আসারু যালিকা ফী তাফসিরেহি- ফায়সাল বিন জামিল, পৃ. ২২
১০. তারিখু কুদাতিল আনদালুস পৃ. ১০৯
১১. দেখুন ইবনে আতিয়া সূচীপত্র পৃ. ৭৭-৯০
১২. প্রাগুক্ত পৃ. ৯৯-১০১
১৩. তাজকেরাতুল হুফফায ৪/১২৫৩
১৪ আস-সিলা ১/৩৬৭
১৫ প্রাগুক্ত পৃ. ৩৩২
১৬ বুগয়াতুল উয়াত ২/১৪২-১৪৩

পড়লে তাঁর দিকে ছাত্রের ঢল নেমে আসে। তাঁর ছাত্রের সংখ্যা অনেক। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

১. আবু বকর মুহাম্মদ ইবন খায়র ইবন হুমার আল ইসবিলী, মৃত ৫৭৫হি.।[১৭]

২. আব্দুর রহমান মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল আনসারী, যিনি ইবন হুবাইশ নামে প্রসিদ্ধ, মৃত ৫৮৪হি.।[১৮]

৩. আবু জাফর আহমাদ ইবন আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন শূযা আল লাহমী আল কুরতুবী, মৃত ৫৯৩ হি.।[১৯]

৪. আব্দুল মুহিব ইবন ফারায, মৃত ৫৯৭হি.।[২০]

৫. আব্দুল্লাহ ইবন তালহা ইবন আহমাদ ইবন আব্দুর রহমান ইবন আতিয়া আল মুহারেবী আল-গারনাতী।[২১]

মনীষীদের অভিমত: ইমাম ইবন আতিয়া রহ. সম্পর্কে ইসলামি মনীষীরা ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আমরা এখানে কয়েকটি উদ্ধৃতি উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করছি।

১. ইমাম যাহাবী তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ সিয়ারু আ'লামিন নুবালায় বলেন, তিনি ছিলেন শায়খুল মুফাসসিরীন, ফিক্‌হ, তাফসির এবং আরবি ভাষার ইমাম। তাঁর মেধাশক্তি ছিলো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তিনি ছিলেন জ্ঞানের ঝাঁপি।[২২]

২. ইমাম ইবন ফারহুন তাঁর দীবাজ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, তিনি ছিলেন ফকীহ এবং ইলমে তাফসিরের বিশেষ জ্ঞানী। তিনি আহকামে শারীয়াহ, হাদিস, ফিকহ, আরবি সাহিত্য, এসব ক্ষেত্রেও সমান পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মেধাশক্তি ছিলো অত্যন্ত প্রখর।[২৩]

ইমাম ইবন আতিয়ার রচনাবলী: ইমাম ইবনে আতিয়ার লিখিত বইয়ের সংখ্যা তেমন বেশি নয়। তাঁর সবচেয়ে বড়ো অবদান হলো তার বিখ্যাত তাফসির।

১। আল-মুহাররারুল ওয়াযীয ফী তাফসিরীল কিতাবিল আযীয। এটি বর্তমানে কাতারের মহামান্য আমীর আশ-শায়খ হামাদ আল সানির বিশেষ অর্থায়নে ছাপা হয়েছে।

২। কিতাবুল আনসাব। ইবনুল আব্বার তাঁর আল-মু'জাম গ্রন্থে বইটির কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্তমানে এর কোনো হদিস পাওয়া যায় না।

৩। আল বারনামেজ বা আল ফাহ্‌রাসা। এটি একটি পুস্তিকা। এতে তিনি তাঁর উস্তাদের জীবনী উল্লেখ করেছেন। এ বইটির পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে।[২৪]

তাফসির আল-মুহাররারুল ওয়াযীয ফি তাফসিরীল কিতাবিল আযীয: ইমাম ইবনে আতিয়ার সবচেয়ে বড়ো অবদান হলো তাঁর বিখ্যাত তাফসির আল-মুহাররারুল ওয়াযীয ফী তাফসিরীল কিতাবিল আযীয। এই মহান তাফসিরটির পাণ্ডুলিপি ছিলো খুবই দুর্লভ ও অস্পষ্ট। সেটিকে অত্যন্ত যত্নের সাথে একদল আলেম তাহকীক করে কাতারের মহামান্য আমীর আশ-শায়খ খলিফা বিন হামাদ আল সানীর বিশেষ অর্থায়নে

---

১৭ প্রাগুক্ত ১/১০২
১৮ নায়লুল ইবতিহায পৃ. ২৩৮
১৯ আদ-দীবাজ পৃ. ১১৬
২০ তাবাকাতুল মুফাসসিরীন
২১ আল ইবতিহায পৃ. ২১৩
২২ আস সিয়ার ১৯/৫৮৭-৫৮৮
২৩ আদ-দীবাজ পৃ. ২৭৬
২৪ আল মুহাররারুল ওয়াযীয খ. ১ পৃ. (ভূমিকা) বা-৮

ও তত্ত্বধানে বর্তমানে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এটির বর্তমান সংস্করণে ১৫টি খণ্ড রয়েছে যাতে পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ৮,৫০০ এর মতো A^4 সাইজ।

এই তাফসিরের বৈশিষ্ট্য হলো, এটিতে সালাফে সালেহীনের পন্থা অনুসরণ করা হয়েছে। এতে কুরআনের তাফসির কুরআন দিয়ে, অতঃপর হাদিস দিয়ে, অতঃপর সাহাবি ও তাবেঈনের আছার দিয়ে এবং বিভিন্ন কিরাআতে যে ভিন্নতা হতে পারে তা উল্লেখ করে তাফসির করা হয়েছে। এটি সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে। কারণ সে সময় তাফসিরের মধ্যে অনেক ইসরাঈলিয়াত,অনাকাঙ্ক্ষিত গালগল্প, খারাফাত, শিরক্, বিদআত ইত্যাদির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তিনি এসব বিষয় থেকে তাফসিরকে সম্পূর্ণ সালাফে সালেহীনের তরিকায় উপস্থাপন করেছেন। এটি পাঠ করলে মনে হবে আমরা যেনো সেই ইসলামের সোনালী যুগে অবস্থান করছি।

ইমাম ইবনে আতিয়া তাঁর তাফসিরে অনেক জায়গাতে এমন কিছু দলিল নিয়ে এসেছেন যার মাধ্যমে দর্শন শাস্ত্রের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের চমৎকার জবাব পাওয়া যায়।[২৫]

তাফসিরখানি সম্পর্কে মনীষীদের অভিমত: সমস্ত আলেম-ওলামা এ ব্যাপারে একমত যে, ইবনে আতিয়া রহ.-এর তাফসির এক অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আমরা এখানে কতিপয় আলেম-ওলামার অভিমত তুলে ধরছি।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, "ইবনে আতিয়ার তাফসির যামাখশারীর তাফসিরের চেয়ে উত্তম এবং উদ্ধৃতি আলোচনার দিক থেকে অধিক বিশুদ্ধ এবং বিদআত থেকে অনেক দূরে। বরং এটি তার চেয়ে অনেক দিক দিয়েই উত্তম এবং এটি এসব তাফসিরগুলোর মধ্যে অধিক অগ্রগণ্য।"[২৬]

ইবনে খালদুন রহ. বলেন, "মানুষ যখন যাচাই-বাছাই ও সম্পাদনার কাজ শুরু করেন জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তখনই পরবর্তী যুগের আলেমদের মধ্যে এগিয়ে আসেন মরক্কোর আবু মুহাম্মদ আব্দুল হক। তিনি এসব তাফসির গ্রন্থকে সংক্ষেপ করেন। তিনি একে সঠিক ও সত্য হিসেবে উপস্থাপন করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালান।"[২৭] ইবনে আবু হাইয়ান রহ. বলেন, "ইবনে আতিয়ার কিতাব হলো উদ্ধৃতির দিক থেকে শ্রেষ্ঠ, সব বিষয়কে একত্রকারী এবং সংক্ষিপ্ত। আর ইমাম জামাখশারীর কিতাব সংক্ষিপ্ত হলেও ভুল-ত্রুটিতে ভরা।"[২৮]

উপসংহার: ইমাম ইবনে আতিয়া রহ. ইসলামের এক মহাজ্ঞানী, লেখক, মুজাহিদ ও আলেমে দীন। তিনি ইসলামের জন্য যে খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাঁর তাফসিরে উল্লেখিত শুধুমাত্র কিরাআত সম্পর্কেই একজন গবেষক (ফয়সাল বিন জামিল বিন হাসান গাযাবী) পিএইচডি (ডক্টরেট) করেছেন (যা প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠারও অধিক)। ইমাম ইবনে আতিয়া রহ.-এর তাফসিরের ক্ষেত্রে যে বিরাট অবদান সেটি থেকে আমরা এখনও কোনো ফায়দা নিতে পারিনি। যুগান্তকারী এই তাফসির গ্রন্থটি বাংলাভাষায় ভাষান্তরিত হলে আলেম-ওলামা থেকে শুরু করে সর্বসাধারণ উপকৃত হতো। এ ব্যাপারে সবার এগিয়ে আসা প্রয়োজন। মহান আল্লাহ আমাদের নেক আমল ও প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন ॥

---

২৫ কাশফুজ জুনূন ১/২২৮; তাফসীরে ইবনে আতিয়া খ. ১, পৃ. (ভূমিকা) জিম-৫
২৬ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২/১৯৫-১৯৫
২৭ মুকাদ্দিমাতু ইবনে খালদুন পৃ. ৩৪৮
২৮ কাশফুজ জুনূন, ৩/১৬; তাফসীরে ইবনে আতিয়া ১/জীম-১৪

ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর ও তাঁর তাফসিরুল কুরআনিল আযীম একটি পর্যালোচনা

ড. হাসান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন

ভূমিকা: আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর রহ.-এর প্রসিদ্ধ তাফসির গ্রন্থটি বিশ্বের সর্বত্র জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বলতে গেলে বিশ্বের প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ও শিক্ষিত পরিবারের লাইব্রেরি তাফসিরটি দ্বারা অলংকৃত ও সুসজ্জিত। নারী-পুরুষ, ছোট-বড়ো সকলের নিকট এটি এক আকর্ষণীয় গ্রন্থ। এতে রয়েছে ইসলামের সার্বিক জ্ঞানের ভাণ্ডার, ঐতিহাসিক তত্ত্ববহুল আলোচনা।

মূলত ইলমে তাফসির, হাদিস, ফিক্হ, আকায়েদ, ইতিহাস ইত্যাদি সব কিছুই জানতে হয় কুরআনুল কারিম বুঝতে হলে এবং এসবই রয়েছে ইবনে কাসীরের প্রণীত 'তাফসিরুল কুরআনিল আযীম' গ্রন্থে। প্রায় এক হাজার বছর ধরে যে গ্রন্থটি জননন্দিত হয়ে আসছে।

তাফসিরের বঙ্গানুবাদ আশির দশকে আমাদের দেশে বাজারজাত হয়েছে। বঙ্গানুবাদগুলো সম্পর্কে এখানে বিতর্কের সূচনা নিষ্প্রয়োজন, তবে যিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করে গ্রন্থটি রচনা করেছেন এবং মুসলিম উম্মাহ্র জন্যে যে বৃহত্তর অবদান রেখেছেন, সে সম্পর্কে সাধারণ লোকের অনেক কিছু জানবার রয়েছে। তাফসির লিখতে গিয়ে তিনি কোন্ কোন্ নীতিমালা ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তাফসির গ্রন্থে তিনি কোন্ কোন্ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন, তার সম্যক জ্ঞান সবার কাছে থাকা প্রয়োজন।

অতীত কালের ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষকদের জীবনী সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছু শিখবার রয়েছে। অনেক কিছু আমাদের জীবনের জন্য অনুশীলনীয় রয়েছে। আমাদের একটি অভ্যাস হলো যে, আমরা অনেক কিছু পড়ি, জানি, কিন্তু অনুশীলন করতে পারি না।

তাফসিরের সংজ্ঞা: তাফসিরের শাব্দিক অর্থ স্পষ্ট করা বা বিশ্লেষণ করা। যেমন বলা হয়েছে, 'ওয়া আহ্সানা তাফসিরা' "সর্বোত্তম ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ"। (আল ফুরকান: ৩৩)। সাধারণ পরিভাষায় তাফসিরের অর্থ হলো, "যে জ্ঞানের সাহায্যে কুরআনের অর্থ, ব্যাখ্যা এবং নাযিলকারীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুধাবন করা যায়"। (মানাহিলুল ইরফান, পৃ: ৩, ভলিয়ম ২)।

কুরআন নাযিলকারীর প্রকৃত উদ্দেশ্য কারো পক্ষে উদ্ঘাটন করা অসম্ভব, কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও তত্ত্ব উদঘাটনের ব্যাপারে, যথাযথ চেষ্টা করা উচিত। এছাড়া কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে বিভিন্ন মাসআলা বা হুকুম-আহকাম নীতিমালা বা উসূল ইত্যাদি বের করাকেও তাফসির বলা হয়। তাই কোনো কোনো তাফসির বিশারদ তাফসিরের পারিভাষিক অর্থ বলেছেন, যে জ্ঞানের দ্বারা নিজ সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী কালামুল্লাহ্র অর্থ, মর্ম ও উদ্দেশ্য নির্ণয় করা হয়।

তাফসির শিখবার প্রয়োজনীয়তা: পবিত্র কুরআন আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব যা মানব জাতির পথপ্রদর্শক জীবন-বিধান, জীবন পরিচালনার দিশারী। এটাকে বাদ দিয়ে কেউই ভাগ্যবান হতে পারে না এবং পরকালীন সফলতাও অর্জন করতে পারে না।

সেজন্য দরকার কুরআন কারিমের শিক্ষা লাভ করা। কুরআন সম্পর্কে বুঝা এবং তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। কুরআনের শিক্ষাকে জীবনের সবক্ষেত্রে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কুরআন বুঝতে হবে, কুরআনের আয়াত নিয়ে গভীর চিন্তা করতে হবে, ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় তথা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তা কার্যকর করতে হবে। কুরআনের পরিভাষায় একে বলা হয় তাদাব্বুর করা।

কুরআন মজিদ হলো মানবকুলের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে সার্বিক জ্ঞানের ভাণ্ডার, অথবা তাহলো মানব কল্যাণ, মুক্তি ও মর্যাদার চাবিকাঠি। বর্তমানে মুসলিম উম্মার বিপর্যয় এবং লাঞ্ছনার কারণ হলো কুরআনের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন। অতীতের মনীষিগণ সংখ্যায় নগন্ন হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের জ্ঞানে আলোকিত হবার কারণে তাঁরা বিশ্বজুড়ে খ্যাতি অর্জন করে 'খাইরা উম্মাতিন' উপাধি পেয়েছিলেন। আজও মুসলিম উম্মাহ্ সেই খ্যাতি অর্জনে সক্ষম যদি সকলে আবার কুরআনের মূল শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়। হাতের কাছে পানি পেয়েও যদি কেউ পীপাসায় মারা যায়, দু'চোখ খোলা ও পর্যাপ্ত আলো পেয়েও যদি কোনো পশু খাদে পড়ে মারা যায়, তাহলে কারো দুঃখ করার থাকে না। এটাকেই কুরআনের ভাষায় বলা হয়, "যালিকা হুয়াল খুসরানুল মুবীন" "এটাই হচ্ছে স্পষ্ট ক্ষতি"। (সূরা যুমার : আয়াত ১৫)

রসূলুল্লাহ্ সা.-এর যুগে আরব উপদ্বীপে আরবি ভাষার ব্যাপকতার দরুন কুরআনুল কারিমের অর্থ বুঝা সেখানের কারো জন্য কষ্টকর ছিল না। কোনো আয়াতের মর্ম বুঝতে সমস্যা হলে কেউ কেউ আল্লাহর রসূলের নিকট তাঁর সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা জেনে নিতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বয়ং তিনি এর ব্যাখ্যা ও মর্ম তাদের বুঝিয়ে দিতেন। মহান আল্লাহ কুরআনে বলেন, "আমি যখন আপনাকে কুরআন শোনাই তখন কুরআনের (আত্মস্থ করার ব্যাপারে) অনুসরণ করুন, অত:পর কুরআনের বিশ্লেষণ দেয়ার দায়িত্ব আমার।" (সূরা কিয়ামাহ : আয়াত ১৮)

রসূলুল্লাহ সা. -এর সাহাবিগণ তাঁর কাছ থেকে কুরআনের যতটুকু তাফসির জানতেন তাঁরা অন্যদের নিকট অনুরূপ তা পৌঁছিয়ে দেন। সুতরাং তাদের যুগে তাফসিরের প্রচলন তেমনটা ছিলনা, যেমনটা পরবর্তী যুগে ছিলো। খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রা. এবং ওমর বিন খাত্তাব রা.-এর খেলাফত আমলেও "তাফসিরুল মা'ছুর" বা তাফসির বির্ রিওয়ায়ার ব্যাপকতা ও প্রচলন ছিলো।

ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর রহ.-এর জীবন ও কর্ম

নাম : ইসমাঈল ইব্‌ন উমার ইব্‌ন কাসীর ইব্‌ন দাও' ইব্‌ন যারা' ইব্‌ন কুরাইশী আল বুখারি আদ্ দিমাশকি আশ্ শাফিঈ। উপনাম : আবুল ফিদা', উপাধি ইমাদুদ্দীন। তবে তিনি ইব্‌ন কাসীর দাদার নামে সকলের কাছে পরিচিত। তিনি সিরিয়ার বুসরা নামক অঞ্চলের 'মাজদাল' গ্রামে ৭০১ হিজরি সালে অভিজাত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে ইতিহাসবিদদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ৭০৩ হিজরি সালে পিতা উমার ইব্‌ন কাসীরের মৃত্যুর পর বড়ো ভাই আবদুল ওয়াহ্হাবের তত্ত্বাবধানে তিনি লালিত-পালিত হন। আলেম ঘরানায় জন্মসূত্রে তিনি সেখানে দীনী শিক্ষায় হাতেখড়ির সুযোগ পান। ছয় বছর বয়সে মা ও বড়ো ভাইর সাথে সপরিবারে দামেস্ক থেকে বাগদাদ গমন করেন। সে সময় বাগদাদ ছিলো ইসলামি জ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র। তিনি এগার বছর বয়সে সম্পূর্ণ কুরআন মজিদ হিফয করেন।

তাঁর পিতা উমর ইব্ন কাসীর ছিলেন একজন বড়ো মাপের আলেম। দামেস্কের প্রসিদ্ধ আলেম আল্লামা আন্ নাওয়াউয়ী ও আল ফাযাউইর মতো বিখ্যাত মনীষীদের কাছে তিনি দীনী ইলম অর্জন করেন। নিজ ভাই সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আল্লামা ইব্ন কাসীর রহ. বলেন, 'তিনি আমার সহোদর এবং আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। সব কঠিন ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে আল্লাহ আমার জন্যে সকল পথকে প্রশস্ত এবং সহজ করেছেন।'

আল্লামা ইব্ন কাসীর রহ. তাঁর পিতার মতো আরবি সাহিত্যিক, একজন বিখ্যাত তাফসিরবিদ, হাদিসবিদ, ঐতিহাসিক এবং যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। তাঁর ইলমের প্রসারতা ও জ্ঞানের গভীরতার ব্যাপারে তৎকালীন ও পরবর্তীকালীন ওলামা ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। প্রখ্যাত হাদিসের আলেম ও বুখারি শরিফের ব্যাখ্যাকারী ইব্ন হাজার আসকালানী রহ. তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, 'আল হাফিজ ইব্ন কাসীর হাদিস মুখস্ত, হাদিস বর্ণনাকারীদের জীবনী জ্ঞান, তাফসির সংকলন ইত্যাদির মধ্যে জীবনের সবটাই বিলিয়েছেন। তিনি ছিলেন তিক্ষ্ণ ও উন্নত মানের মেধাবী ব্যক্তি। তিনি ছিলেন একজন মুহাদ্দিস এবং ফকিহ।' আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. তাযকিরাতুল হুফ্ফাযে এবং আল্লামা যুরকানী শাহরুল মাওয়াহিব গ্রন্থে তাফসির ইব্ন কাসীর সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছেন:

'ইব্ন কাসিরের লিখিত গ্রন্থগুলো ছিলো এক অতুলনীয় বিদ্যাভাণ্ডার। তাঁর লিখনী শক্তি ছিলো অসাধারণ। তাঁর অনুসৃত নিয়মের লিখা তাফসিরের কিতাব এ পর্যন্ত রচিত হয়নি। তিনি ছিলেন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার একান্ত ছাত্র এবং ভক্ত। ইল্ম চর্চা এবং জিহাদের ময়দানে তাঁর ছিলো অসীম অবদান।

আল্লামা ইব্ন কাসীর রহ. কর্মজীবনের শুরুতে কোনো এক মসজিদের খতিব ছিলেন। দামেস্কের নাজিরিয়া শিক্ষালয়ে তিনি শিক্ষক নিযুক্ত হন। প্রসিদ্ধ আলেমে দীন শামসুদ্দীন আয যাহাবী রহ. মারা যাওয়ার পর তিনি উম্মু সাহিল ও তানকিয়া মাদরাসায় হাদিসের শিক্ষক নিযুক্ত হন। অত:পর তিনি দারুল হাদিস আল আশরাফীয়া মাদরাসায় প্রধান মুহাদ্দিস নিযুক্ত হন।

তাঁর খ্যাতনামা ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন বদরুদ্দীন যারকাশী (মৃত্যু ৭৯৪ হিজরি), শিহাবুদ্দীন হাররী (মৃত্যু ৮১৩ হিজরি), সা'দ আন নববী (মৃত্যু ৮০৫ হিজরি) ও ইয়াহইয়া আর রাহবী (মৃত্যু ৮০৫ হিজরি)।

ইল্ম চর্চার পাশাপাশি আল হাফিজ ইব্ন কাসীর রহ. গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্বও পালন করেছেন। ৭৫১ হিজরির শেষদিকে গভর্নর আল তুনবুগার শাসন আমলে অবতারবাদে বিশ্বাসী এক মুরতাদের বিচারে তিনি তদন্ত কমিটির সদস্য ছিলেন। ৭৫২ হি. খলিফা আল মু'তাদিদকে সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেন।

৭৬২ হিজরিতে খলিফা বাদামুর বিদ্রোহ দমনের জন্যে ইব্ন কাসীরসহ অন্যান্য আলেমদের পরামর্শ চেয়েছিলেন। তিনি দামেশকের গভর্নর মানজাককে দেশরক্ষার ব্যাপারে যথাযথ সহায়তা প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে আল্লামা ইব্ন কাসীর রহ. 'রিবাতুল ইজতিহাদ ফী তালাবিল জিহাদ' শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

(এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন ড. নজরুল ইসলাম খান আল মারুফ, হাফিয ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাসীর : জীবন ও কর্ম, পৃ. ৪১-৪৭। আল আ'লাম, আল যুরকানী, ইবনু কাসীর ওয়া কিতাবুহু তাফসিরুল কুরআনিল আযীম, ড. মুহাম্মদ ফালেহ)।

জীবনের শেষদিকে আল্লামা ইব্ন কাসীর রহ. দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ৭৭৪ হিজরির ২৬শে শা'বান তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বাগদাদ ও দামেশকের হাজার হাজার ওলামা মাশায়েখ এবং অগণিত মানুষ তাঁর জানাযায় যোগদান করেন। দামেশকের 'সুফিয়ান' কবরস্থানে তাঁরই ওসিয়ত মতো শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়ার (মৃত্যু ৭২৮হি.) কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয় (রহিমাহুল্লাহ রাহমাতান ওয়াসিয়াহ)।

আল হাফিজ ইবনে কাসীরের শিক্ষকবৃন্দ: তাঁর শিক্ষকের সংখ্যা তিরিশজন। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম হলো :

০১. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ আয যাইলাঈ (হানাফী ফকীহ)।
০২. আল হাফিয আবুল আব্বাস আল মিয্যি।
০৩. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আয যাহাবী।
০৪. আবুল আব্বাস আহমদ আল হাজার আশ শিহ্‌রী।
০৫. আবু ইসহাক ইবরাহিম আল ফাযারী।
০৬. আল হাফিয কামালুদ্দীন আশ্ শাহির বিন ইবনে কাদী শুহবাহ।
০৭. আল ইমাম কামালুদ্দীন আবুল মাআ'লী মুহাম্মদ ইব্ন আয যামালকানী।
০৮. আল ইমাম মুহীউদ্দীন আবু যাকারিয়া আল শায়বানী।
০৯. আল ইমাম ইলমুদ্দীন মুহাম্মদ কাসীম আল বারযালী।
১০. আশ্ শায়খ শামছুদ্দীন মাহমুদ আল ইসবাহানী।
১১. শায়খুল ইসলাম আবু আব্বাস আহমদ ইবনে তাইমিয়া।
১২. আফিফুদ্দীন ইসহাক ইব্ন ইয়াহইয়া আল আহমাদী আল ইসবাহানী। (তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, ইমাম যাহাবী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮)

রচনাবলী: গ্রন্থকারের মোট রচনাবলী কয়টি, কয়টি মুদ্রিত আর কয়টি ম্যানাস্ক্রিপ্ট তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। গবেষকগণের মধ্যে কেউ কেউ ৩৪টি রচনা উল্লেখ করেছেন। তবে এখানে প্রসিদ্ধ ক'টির নাম উল্লেখ করা হলো :

০১. তাফসিরুল কুরআনিল আযীম।
০২. আর রিসালাতু ফী ফাদায়িলিল কুরআন।
০৩. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া।
০৪. আহাদিসুল উসুল।
০৫. শারহু সহীহিল বুখারি।
০৬. ইখতিসারু উলুমিল হাদিস।
০৭. আত্ তাকমীল ফিল জারহি ওয়াত্ তা'দীল ওয়া ম'রিফাতিস সিফাতি ওয়াল মাজাহীল।
০৮. জামিউল মাসানিদ।
০৯. মুসনাদে আবি বাকর।
১০. মুসনাদে উমার ইবনুল খাত্তাব।
১১. আল আহকামুস সুগরা ফিল হাদিস।
১২. তাখ্‌রিজে আহাদিসে আদিল্লাতিত্ তামবীহ ফিল ফিকহিস্ শাফিইয়্যাহ।
১৩. আস সীরাহ আন্ নাবাবিয়্যাহ।
১৪. আল বাইসুল হাদিস।
১৫. তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ।
১৬. মুকাদ্দামাতুল আনসাব।

১৭. আল আহ্‌কামুল কুবরা।
১৮. মানাকিব ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ।
১৯. কিতাবুস সাওম। (তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ, ইমাম যাহাবী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯)

মনীষীদের দৃষ্টিতে আল্লামা ইবনে কাসীরের মর্যাদাঃ আত্ তাফসির ওয়াল মুফাস্‌সিরুন এর গ্রন্থকার আল্লামা ইব্‌ন কাসীর রহ.-এর ইলমী মর্যাদা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন, 'ইব্‌ন কাসীর ছিলেন একজন উঁচু মানের জ্ঞানী। একদল ওলামা তাঁর জ্ঞানের গভীরতার স্বীকারোক্তি করেছেন ও সাক্ষ্যও দিয়েছেন'।

বিশেষজ্ঞগণ তাফসির, হাদিস এবং ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তাঁর পারদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আল্লামা ইব্‌ন হাজার আসকালানী রহ. ইব্‌ন কাসীরের জ্ঞানসাধনার বিষয়টি উল্লেখ করে লিখেছেন, হাদিস অধ্যয়ন করতে গিয়ে তিনি হাদিসের মূলপাঠ এবং রাবীদের পূর্ণ নামসহ মুখস্ত করেন। এর পাশাপাশি তিনি তাফসির সংকলন করেন, তারপর ইতিহাস সংকলন করতে গিয়ে 'আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ' গ্রন্থটি রচনা করেন। তদুপরি ইব্‌ন কাসীর ছিলেন উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী। তিনি ছিলেন অধিকাংশ সময় অত্যন্ত খোশমেজাজি ও উত্তম রসিক।' আল হাফিয ইব্‌ন কাসীর রহ. অসংখ্য পুস্তক লিখেছেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় প্রায় সবগুলো বাজারজাত হয়েছিল। আজও এ সমস্ত লিখনী হতে অসংখ্য মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। ইমাম আয যাহাবী তাঁকে ইমাম, মুফতি, মুহাদ্দিস, ফকিহ ও মুফাস্‌সির বলে উপাধি দিয়েছেন। শাযারাতুয যাহাব গ্রন্থকারের ভাষায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, মুখস্ত কোনো বিষয় তিনি সহজে ভুলতেন না। (আসকালানী, আদ দুরারুল কামিনা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৩)।

তাফসির রচনার পটভূমিঃ আল্লামা আল হাফিয ইবনে কাসীর রহ. এর যুগটি ছিলো মুসলিম উম্মার জন্যে এক ক্রান্তিকাল, কঠিন ও বেদনাদায়ক যুগ। একদিকে ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে নির্মূল করার লক্ষ্যে অসংখ্য ইসলামি ও অনিসলামি দল ও ফিরকার আত্মপ্রকাশ; অপরদিকে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং আধিপত্যবাদী শক্তির নিষ্ঠুর কার্যকলাপ। মদিনা মুনাওয়ারা থেকে বাগদাদে মুসলিম খিলাফত স্থানান্তরিত হবার ফলে সমস্ত বাগদাদ ইসলামি শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার প্রাণকেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়ে যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার জ্ঞানী ও শিক্ষার্থীরা সমাগম হতে শুরু করে বাগদাদ ও তার আশপাশে। এর সাথে ভারত, গ্রিস, মিশর তথা অন্যান্য এলাকা থেকে তদানিন্তন দর্শনের মধ্যকার স্বাতন্ত্র্য মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রসূলুল্লাহ সা.-এর মূল ইসলামি শিক্ষার সাথে মানব রচিত দর্শন ও চিন্তার মিশ্রণ ঘটে। ফলে বিভিন্ন দল বা ফিরকার জন্ম হয়। কুরআনের অপব্যাখ্যা শুরু হয়, সহীহ হাদিসের সংগে জাল হাদিসের মিশ্রণ ঘটে। এহেন পরিস্থিতিতে মুসলিম উম্মাকে ইসলামের মূল শিক্ষা ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। অপরদিকে হালাকু খানের আধিপত্যবাদী শক্তি এবং রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস মুসলিম উম্মাকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়।

মুসলমান জাতিকে নির্মূল করার লক্ষ্যে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞসহ নানাবিধ অত্যাচার চলতে থাকে। লাখো মুসলমান শাহাদাতবরণ করেন, হাজার হাজার গ্রন্থ ভাণ্ডার, বই-পুস্তক পুড়িয়ে দেয়া হয়। মুসলমান জাতির ঐতিহ্য ধ্বংস করার চেষ্টা চলে। মোটকথা বাগদাদ থেকে ইসলামের অস্তিত্ব একেবারে বিলীন হয়ে যেতো যদি মুসলিম মনীষিগণ, ওলামায়ে কেরাম, বীর মুজাহিদগণ এ সকল চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় সীসাঢালা প্রাচীরের ভূমিকা না রাখতেন।

ইমাম ইব্ন তাইমিয়া, ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম, সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী, সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর শাসন এবং আল হাফিয ইবনে কাসীর রহ. ও তাদের পরবর্তী সময়ের ইসলামি চিন্তাবিদগণ আবার জ্ঞানচর্চায় ফিরে আসেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে তাঁরা পূর্ণ উদ্দ্যমে কাজ শুরু করেন। তাঁদের মধ্যে আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। (বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন আল বিদায়াহ্, পৃ. ৮,১০,১১,১৮/ ভলিউম ১৪)

'তাফসিরুল কুরআনিল আযীম' পরিচিতি: আল্লামা ইবনে কাসীরের বিশ্ববিখ্যাত তাফসির গ্রন্থটি রচনার শুরু এবং শেষ তারিখ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি। এমনকি তাঁর গ্রন্থসমূহের কোথাও সে বিষয়ের কোনো তথ্য উল্লেখিত হয়নি। তবে আল্লামা আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ আয্ যায়লাঈ ইবনে গায়লান আল বা'লাবাক্কি রহ. (মৃত্যু ৭৪২ হিজরি) এর প্রণীত 'তাখরীজুল আহাদিসিল কাশ্শাফ' এ আলোচিত বিষয় থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ৭৪২-৭৬২ হিজরি সালের মধ্যে মাত্র তিরিশ বছরে তিনি তাফসির গ্রন্থটি সম্পন্ন করেন। তাঁর শিক্ষক আল্লামা জামালুদ্দীন ইউসুফ আল্ মিয্যি রহ. সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইবনে কাসীর সূরা আল আম্বিয়ার তাফসিরে উল্লেখ করেন যে, আমার উস্তাদ আল মিয্যি আমার দীর্ঘায়ু ও উন্নত ইলমের জন্যে আল্লাহ্র নিকট মোনাজাত করেন।' এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইবনে কাসীর তাঁর তাফসিরের বেশ অর্ধেক কাজ আল্লামা আল মিয্যির জীবিত থাকা অবস্থায় সম্পন্ন করেন (ইবনে কাসীরের এ শিক্ষকের মৃত্যুর তারিখ জানা সম্ভব হয়নি)।

বিশ্বের আনাচে-কানাচে এ গ্রন্থটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ইতিহাসের বিগত সাড়ে সাতশত বছর ধরে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ যে তাফসিরের প্রতি তাদের হৃদয়ের ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছে, যার গ্রহণযোগ্যতা সর্বাধিক তার মধ্যে তাফসিরুল কুরআনিল আযীম (তাফসির ইবনে কাসীর) একটি। সাড়ে সাত শত বছরে আরবে আযমে প্রকাশিত এমন একটি তাফসিরও খুঁজে পাওয়া যাবে না যাতে কোনো না কোনোভাবে ইব্ন কাসীরের তাফসিরের উদ্ধৃতি স্থান পায়নি। ইলমে তাফসিরের সারিতে ঐ তাফসির গ্রন্থের স্থান 'তাফসীর আত তাবারীর' পরেই।

ইংরেজি, উর্দু ও বাংলাসহ পৃথিবীর অসংখ্য ভাষায় তাফসিরটি অনূদিত হয়েছে। তাফসির গ্রন্থটি লিখতে গিয়ে আল হাফিয ইব্ন কাসির রহ. তাফসিরে তাবারী (মৃত্যু ৩১০ হি.), তাফসিরে আদম বিন আয়াস (মৃত্যু ২২০হি.), তাফসিরে আবি বকর ইবনুল মুনযির (মৃত্যু ৩১৮হি.), তাফসির ইবনে আবি হাতেম (মৃত্যু ৩২৩হি.), তাফসিরে আবি মুসলিম আল ইসবাহানী (মৃত্যু ৭২৮হি.), তাফসিরে মাআলিমুত তান্যিল (আল বাগাবী) (মৃত্যু ৫১৬হি.) তাফসিরে ইবনে তাইমিয়্যাহ (মৃত্যু ৭২৮হি.) তাফসিরে আস্ সা'লাবী (মৃত্যু ৪২৭হি.) ইত্যাদি তাফসিরসমূহের সহায়তা গ্রহণ করেন।

তাফসির ইবনে কাসীর রচনা রীতি: 'তাফসিরুল কুরআনিল আযীম' রচনাকালে হাফিয ইবনে কাসীর রহ. বেশ কতক শর্ত ও নীতিমালা সামনে রেখে কাজ করেছেন। মূলত প্রতিটি তাফসিরের লেখক নিজ গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য পাঠকের কাছে তুলে ধরেন, যার ভিত্তিতে গ্রন্থটি অনুধাবন করা সহজ হয়, সেই সাথে অন্যান্য তাফসিরের সাথে সেই তাফসিরের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

আল্লামা ইব্ন কাসীর রহ. তাঁর তাফসিরের শুরুতে ভূমিকা লিখতে গিয়ে কতক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন এবং কতক বৈশিষ্ট্য তাঁর গ্রন্থের বিষয়বস্তুসমূহের আলোকে পেশ করেছেন।

তাফসিরুল কুরআনিল আযীমকে তাফসির বিল মা'ছূর বলা হয়। এ হিসেবে তাফসির তাবারীর পর এর স্থান দ্বিতীয়। তিনি কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা আয়াত দ্বারা, অত:পর আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদিস দ্বারা, তারপর সাহাবিদের কথার দ্বারা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন। অত:পর তিনি ইজতিহাদ বা মুজতাহিদের ব্যাখ্যার সহায়তা গ্রহণ করেছেন। বলতে গেলে আল্লামা ইবনে জারির আত তাবারী রহ. তাফসির জগতে তাফসির বিল মা'ছূর-এর পাশাপশি তাফসির বিল ইজতিহাদ এর আশ্রয় নিয়েছেন। মূলত ইবনে কাসীরও তাঁর মতো অনুরূপ নীতি অনুসরণ করেন। তাঁর দৃষ্টিতে ইজতিহাদ বা তাফসির বির রায় দুই ধরনের, এক. প্রশংশনীয় ও দুই. নিন্দনীয়। অতএব ইবনে কাসীর, তাবারী এবং ইবনে তাইমিয়াসহ আগেকার কালের আলেমদের নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে প্রশংসনীয় ইজতিহাদ গ্রহণ করেছেন এবং দ্বিতীয় প্রকারের ইজতিহাদ বর্জন করেছেন। সেজন্যে তাফসির ইবনে কাসীরকে সনাতন তাফসিরের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এখানে তাফসির ইবনে কাসীরের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো।

০১. কুরআনের অর্থ কুরআন দ্বারা। তাফসির গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে কাসীর কুরআনের কোনো আয়াত বা শব্দের ব্যাখ্যা অপর আয়াত বা শব্দের দ্বারা করেছেন। একে বলা হয় 'তাফসিরুল কুরআন বিল কুরআন'।

০২. কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ সা.-এর হাদিসের দ্বারা, যার নাম 'তাফসিরুল কুরআন বিল হাদিস'। মূলত হাদিস হলো কুরআনের তাফসির বা ব্যাখ্যা। যেমন নবী সা. বলেছেন : 'আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার অনুরূপ বস্তু দেয়া হয়েছে।' সুতরাং এখানে অনুরূপ বস্তু বলতে হাদিস বুঝানো হয়েছে।

০৩. কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদিসের সন্ধান পাওয়া না গেলে তিনি সাহাবিগণের ব্যাখ্যার প্রতি নজর দিতেন। এর ভিত্তিতে তিনি তাফসির করেছেন। এর নাম হলো তাফসিরুল কুরআন বিআক্‌ওয়ালিস সাহাবা।

০৪. কোনো আয়াতের ব্যাখ্যায় সরাসরি কোনো হাদিস অথবা সাহাবির মত না পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে তিনি তাবেঈগণের ব্যাখ্যার শরণাপন্ন হন। একে বলা হয় তাফসিরুল কুরআন বিআকওয়ালিত-তাবেঈন।

আল্লামা ইবন কাসীর রহ. তাঁর তাফসির গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করে বলেন, 'কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে যে, কুরআন মজিদের তাফসির করবার সর্বোত্তম পদ্ধতি কি? এর জবাবে বলা যায়, এ ব্যাপারে সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে কুরআনের তাফসির কুরআনের দ্বারা। কারণ এক আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য স্থানে উল্লেখিত আয়াতে পাওয়া যায়। আর এটা সবচেয়ে সহজ উপায়। যদি তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়ো, তাহলে তখন সুন্নতের সাহায্য নেবে। কারণ সুন্নাহ হচ্ছে কুরআন পাকেরই ব্যাখ্যা বা তাফসির। যদি আয়াতের ব্যাখ্যা কুরআন এবং সুন্নায় না পাই, তখন আমরা সাহাবিদের মন্তব্যের দিকে তাকাই। কারণ কুরআন নাযিলের প্রেক্ষাপট ও সমসাময়িক অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা সরাসরি অবগত। এ ব্যাপারে তাঁদের দক্ষতা ও জ্ঞান এবং সর্বোপরি তাদের বাস্তব আমল রয়েছে। যেমন খোলাফায়ে রাশেদীন এবং প্রবীণ জ্ঞানীগুণী সাহাবিগণ। কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা যখন কুরআনে অথবা সুন্নায় অথবা সাহাবিদের কথায় না পাওয়া যাবে তখন অধিকাংশ ওলামা তাবেঈদের ব্যাখ্যার শরণাপন্ন হয়েছেন, আমরাও তা অনুসরণ করবো।'

০৫. কোনো আয়াতের তাফসির করার বেলায় তিনি আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট 'মারফূ' হাদিসকে সবার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। মারফূ' হাদিস বলা হয় যার সনদ রসূলুল্লাহ সা.

পর্যন্ত পৌঁছায়। চাই সেটা 'মুত্তাসিল' হোক অথবা 'মুনকাতে' অথবা 'মুরসাল'। (দেখুন, ইবনে কাসীর, আল বায়িসুল হাদিস, পৃ. ৪২)

তিনি নিজ তাফসির গ্রন্থে সিহাহ সিত্তাহ্, মুসনাদে আহমাদসহ অন্যান্য হাদিসের কিতাব থেকে হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন বটে, কিন্তু হাদিসগুলোর কোন্টি গ্রহণযোগ্য, কোন্টি শক্তিশালী, কোন্টি কম শক্তিশালী, কোন্টি রাজেহ, কোন্টি মারজুহ, সে ব্যাপারে আল্লামা ইবনে কাসীর নির্দ্বিধায় নিজ মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। এরই পাশাপাশি তিনি হাদিসের রাবীদের (বর্ণনাকারীদের) বৃত্তান্ত নিয়েও মন্তব্য করেছেন। এসমস্ত দিকের প্রতি কঠোর দৃষ্টি দেয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর তাফসিরে সহীহ যঈফ ইরাঈলিয়াত সব ধরনের রিওয়ায়াত তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে দুর্বল ও জাল হাদিস সম্পর্কে সাবধানও করে দিয়েছেন।

কিন্তু তবুও একজন পাঠকের পক্ষে সেগুলো যাচাই-বাছাই করা কষ্টকর। তবে সিরিয়ার একজন আলেমে দীন ও তাফসির বিশাদর আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস্ সাবুনী (আমার শিক্ষক) তাফসির ইবনে কাসীরের সবগুলো রিওয়ায়াত যাচাই-বাছাই করে কেবল সহীহ রিওয়ায়াত সমন্বয়ে সংক্ষিপ্ত তাফসির ইবন কাসীরের সংকলন করেছেন। তিন খণ্ডের এই সংকলনে তিনি কেবল সাহাবি রাবীদের উল্লেখ করে বাদবাকি রাবীদের নাম তা থেকে বাদ দিয়েছেন।

০৬. কুরআন মজিদে আল্লাহ তা'আলার গুণগত নামসমূহের ব্যাখ্যার ব্যাপারে ইবনে কাসীর আগেকার যুগের আলেমদের নীতির অনুসরণ করেছেন। সিফাতি নামসমূহের তিনি হুবহু তরজমা করেছেন, কোনো প্রকারের ব্যাখ্যার আশ্রয় নেননি।

০৭. তিনি স্বীয় তাফসিরে জাব্‌রিয়া, কাদারিয়া, মুরজিয়া, মু'তাযিলাসহ অন্যান্য বাতিলপন্থীদের মতবাদ ইলমে আকিদার আলোকে জোরালোভাবে খণ্ডন করেছেন।

০৮. ইবনে কাসীর রহ. তাঁর তাফসির গ্রন্থে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ অর্থাৎ সালাফ ওলামা মাশায়েখের নীতি থেকে বিন্দুমাত্র সরে যাননি।

০৯. আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও ফিক্‌হী মাসায়েলের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন মত উল্লেখ করেছেন। কুরআনের কোনো আয়াতের হুকুমের ব্যাখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি ফকীহ ও ইমামদের মতামত নিয়ে গভীর যুক্তি তর্কের অবতারণা করেন, ঐ হুকুমের ব্যাপারে ইমামদের যুক্তিসমূহ তুলে ধরেন, অত:পর তাঁর দৃষ্টিতে যেটা গ্রহণযোগ্য মনে হয় তাকেই তিনি প্রাধান্য দেন। এ হিসেবে তাঁকে একজন অনন্য মুজতাহিদ বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ সূরা বাকারার ১৮৫নং এবং ২৩নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীরের ফিক্‌হী দৃষ্টিভংগি লক্ষ্য করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত : আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. ফিকহী মাসায়েল আলোচনা করতে গিয়ে উসুলে ফিক্‌হ এর বিষয়টিও টেনে এনেছেন। কখনো তিনি অন্যান্য ইমামদের মতকে প্রাধান্য আবার কখনো শাফিয়ী ইমামদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

১০. তাফসির ইবনে কাসীরের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, গ্রন্থকার আয়াতের প্রতিটি কঠিন শব্দের সহজ ও সরল তরজমা করেছেন। যাতে সকল স্তরের পাঠক সহজেই অর্থ অনুধাবন করতে পারেন। শাব্দিক তরজমার বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে তিনি কবিতার সহায়তা নিয়েছেন। তিনি একজন বড়ো মাপের কবিও ছিলেন।

১১. তিনি নিজ তাফসির গ্রন্থে 'কিরাআত-ই-সাবআ' (সাত কিরাআত) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মূলত পবিত্র কুরআন এ সাত কিরাতে নাযিল হয়েছিল এবং সবগুলোই মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত।

১২. তিনি বিভিন্ন সূরা বা আয়াতের ফযীলত উল্লেখ করেছেন। একই সঙ্গে তিনি মক্কী ও মাদানী সূরার উপর আলোচনা করেছেন।

১৩. ইসরাঈলি রিওয়ায়াত : প্রথমে ইসরাঈলি রিওয়ায়াতের অর্থ জানতে হবে। ইসরাঈলি রিওয়ায়াত বলতে বোঝায় সেই সমস্ত হাদিসকে যার কোনো সনদ বা ভিত্তি নেই অথবা যার বর্ণনাকারী অজ্ঞাত পরিচয়। আর এখানে ইসরাঈলি রিওয়ায়াত বলতে বুঝায় আহলে কিতাবের বর্ণিত কথাবার্তা। বনি ইসরাঈলের ইহুদী বা নাসারাদের বর্ণিত রিওয়ায়াতকে ইসরাঈলিয়াত বলা হয়।

ইলমে তাফসিরের বিশেষজ্ঞ ওলামার মধ্যে কেউ কেউ বলেন, দায়মুক্ত হওয়ার জন্য যে সমস্ত ইসরাঈলিয়াত গ্রহণযোগ্য হতে পারে সেগুলো সঠিক সনদ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লামা ইবনে জারির আত তাবারী সাধারণত এ নীতি অনুসরণ করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সনদের বাছবিচার না করেই ঢালাওভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন আল্লামা বাগাবী রহ. প্রমুখ। তাফসিরে বাগাবী রহ. ইসরাঈলিয়াত সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, আল্লামা বাগাবী আর আল্লামা সা'লাবী প্রায় একই নীতি অনুসরণ করেছেন। তাদের অবস্থা হলো অন্ধকারে খড়ি সংগ্রহকারীর মতো।

তবে আল্লামা ইসরাঈলি রিওয়ায়াত সংগ্রহ করতে গিয়ে নিজের তাফসিরকে মাওযূ' এবং বানাওয়াট রিওয়ায়াতসমূহ থেকে পৃথক করেছেন। তবে আল্লামা সা'লাবী তাঁর তাফসির গ্রন্থে ইসরাঈলিয়াত নকল করতে গিয়ে সহীহ, যাঈফ ও মাওদূ' ইসরাঈলিয়াতের মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখেননি। আবার কেউ কেউ ইসরাঈলিয়াত নকল করতে গিয়ে সেগুলো ভালো করে যাচাই-বাছাই করেছেন, যেমনটি আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবন কাসীর রহ. এর নীতি ছিলো। আবার কতক ওলামা সরাসরি ইসরাঈলি রিওয়ায়াত প্রত্যাখ্যান করেছেন। যেমন আল্লামা ইবন খালদুন, আল্লামা রশিদ রিদা ইত্যাদি।

ইসরাঈলিয়াত রিওয়ায়াতের ব্যাপারে আল্লামা ইবন কাসীর রহ. সম্পর্কে এতোটুকু বলা যায় যে, তিনি নিজ তাফসির গ্রন্থে কোনো কোনো আয়াতের ব্যাখ্যায় ইসরাঈলিয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন বটে, কিন্তু সে সকল রিওয়ায়াতের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা সম্পর্কে পাঠকদের সতর্ক করে দিয়েছেন। যেগুলো অশুদ্ধ, কুরআন ও সুন্নাহর আকীদার পরিপন্থী এবং সত্যতার মাপকাঠিতে টিকে না তিনি সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছেন। এছাড়া কখনো কখনো তিনি বিশেষ প্রয়োজনে ব্যাখ্যার দাবি অনুযায়ী ইসরাঈলিয়াত নকল করেছেন, সেগুলো আকীদা ও দীনের মূলনীতির পরিপন্থী নয়। তবে সেগুলোর সংখ্যা খুবই কম। যেমন তিনি তাফসিরের ভূমিকায় ইসরাঈলিয়াত উদ্ধৃত করতে গিয়ে হাদিসের বরাতে উল্লেখ করেছেন:

بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً ، وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ

"একটি আয়াত হলেও তোমারা আমার কাছ থেকে তা অন্যের কাছে পৌছিয়ে দাও। আর বনু ইসরাঈলের বিষয়াদি আলোচনা করতে পারো, এতে ক্ষতির কিছু নেই।"

গ্রন্থকার তাঁর ভূমিকায় এও বলেছেন যে, ইসরাঈলী রিওয়ায়াতসমূহকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে : ক. সত্যের মাপকাঠিতে যেগুলো নির্ভুল ও সঠিক; কেবল তাই

নির্ভরযোগ্য; খ. যেগুলো মিথ্যা হবার ব্যাপারে নিশ্চিত সেগুলো পরিত্যাজ্য এবং গ. যেগুলোর সত্য-মিথ্যা অস্পষ্ট, সেগুলোকে সঠিকও বলা যাবে না, আবার মিথ্যাও সাব্যস্ত করা যাবে না। তবে এ পর্যায়ে সেই রিওয়ায়াতটি কেবল উদ্ধৃত করা যেতে পারে, প্রমাণ হিসেবে নয়।

উপসংহার : ইমাম ইবনে কাসীর রহ. ইসলামের বীর মুজাহিদদের মধ্যকার এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি তাফসির শাস্ত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থসমূহ রচনা করে মুসলিম উম্মার জন্য জ্ঞানের বিরাট ভাণ্ডার রেখে গিয়েছেন, যা দ্বারা প্রতিটি ব্যক্তি উপকৃত হচ্ছেন। মহান আল্লাহ তাঁর এই একনিষ্ঠ অবদান কবুল করেছেন বলে আজও বিশ্বজুড়ে তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি বিরাজ করছে। তাঁর মতো অসংখ্য মুসলিম মনীষী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেও তাদের অবদান অবিস্মরণীয় থাকে, এটাই রাব্বুল আলামীনের সুন্নত। তাদের জীবনী ও বাস্তব আমলকে অনুসরণ করার মধ্যে ইসলামের পুনর্জাগরণ নিহিত। কেননা তাঁরাই ছিলেন রসূলুল্লাহ সা.-এর আদর্শের বাস্তব অনুসারী। সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলীমুল হাকীম।

তথ্যপঞ্জি

০১. আল কুরআন
০২. আল হাদিস
০৩. তাফসির ইবন কাসীর, বৈরুত, মাকতাবা ইলমিয়্যা
০৪. আল বিদায়াত ওয়ান নিহায়াহ। ইবন কাসীর
০৫. আত তাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন, হোসেন আজ যাহাবী
০৬. মুখতাছার ইবন কাছীর, মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী।
০৭. মানাহিলুল ইরফান, আয যুরকানী
০৮. আত তিবয়ান ফি উলুমিল কুরআন, মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী
০৯. আল ইতকান, জালালুদ্দীন সুয়ুতী।
১০. আদদুরারুল কামিনা, ইবন হাজার আসকালানী
১১. যাইলুত তাযকিরা, আল মাহাসিন আল হুসাইনী
১২. আল বাইসুল হাদিস, ইবন কাসীর
১৩. তাযকিরাতুল হুযফায, আয যাহাবী
১৪. আল আ'লাম আয যিরিকলী
১৫. আত তাবাকাতুল কুবরা, ইবন সা'দ।
১৬. ইবন কাসীর ওয়া কিতাবুহু, ড. আহমদ কালেই

রেফারেন্স পুস্তক

১. তাহযীব সিয়ারে আলামিন নুবালা: ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন উসমান আযযাহাবী, মৃত্যু-৭৪৮হি. (১৩৭৪ সাল) দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪১৩ হি., জীবনী নং- ৪৯০৭ পৃ. ২: ৫৬৮পৃ. আররিসালাহ ফাউন্ডেশন বৈরাত।
২. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ইমামুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে আমর ইবন কাছীর মৃত্যু ৭৭৪ হিজরি।
৩. মাজমূ আল ফাতাওয়া: আহমাদ ইবনে তাইমিয়াহ: ৭২৮ হি. মুকাদ্দামাতুত তাফসির মুদ্রণ ১৩৯৮ হি.
৪. মুকাদ্দামাতু আজমাউন আসমান: আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল মায়দানী মৃত্যু ৫১৮ হি.
৫. তারতীবুল কামূসিল মুহীত: শব্দ দ্রষ্টব্য
৬. ইসলামি বিশ্বকোষ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন (৩০ খণ্ড)
৭. দিরাসাত ফী উলুমিন কুরআন ড. ফাহাদ বিন আব্দুর রহমান আররুমী। মাকতাবাহ আততাওবাহ: ৫ম সংস্করণ ১৪১৮ হিজরি
৮. আত তাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন ড. মুহাম্মদ হোসাইন আযযাহাবী ১ম সংস্করণ ১৩৯৬ হিজরি, ১ম খণ্ড: ৪২৯-৪৮২

***

ইমাম আল কুরতুবীর জীবনী ও তাঁর তাফসিরের বৈশিষ্ট্য

মুফতী মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান

ইমাম আল কুরতুবীর সমসাময়িক সমাজঃ ঐতিহাসিক ও জীবনীকারগণ ইমাম আল কুরতবীর নামের সাথে আল আন্দালুসী ও আল কুরতুবী শব্দ দু'টি যুক্ত করে তাঁকে উক্ত স্থান দু'টির সাথে সম্পর্কযুক্ত করে থাকেন।[১] এ থেকে এবং ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, তিনি আল আন্দালুসের অন্তর্গত কুরতুবা তথা কর্ডোভার অধিবাসী ছিলেন। মধ্যযুগের অবসানকাল পর্যন্ত আইবেরীয় উপদ্বীপ অর্থাৎ আধুনিক স্পেন ও পর্তুগাল মুসলিম জাহানে আল আন্দালুস নামে পরিচিত ছিলো।[২]

কর্ডোভা দক্ষিণ স্পেনে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। আইবেরীয় উপদ্বীপ ইউরোপের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত পিরেনীজ পর্বতমালা দ্বারা ইউরোপ মহাদেশের সাথে সংযুক্ত এবং অবশিষ্ট অঞ্চল আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগর দ্বারা বিধৌত। ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে আরবগণ ইসলামি আদর্শে বলিয়ান হয়ে বিজয়ের যে গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে ক্ষিপ্রতার দিক দিয়ে আল আন্দালুস বিজয় এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

স্পেন বিজয়ের পূর্বে মুসলিম শাসন উত্তর মরক্কো অঞ্চলে সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ইফরীকিয়া ও মাগরিব এর শাসনকর্তার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন মূসা ইবন নুসায়র। তিনি জিব্রালটার প্রণালীর অপর পাড়ে অবস্থিত নতুন ভূখণ্ডে অভিযানের সিদ্ধান্ত দামিশকের খলীফা ওয়ালীদ ইবন অবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের দরবারে পেশ করার পূর্বেই গ্রহণ করেছিলেন। ফলে তাঁর (মূসা ইবন নুসায়র-এর) সহকারি সেনাপতি তারিক ইবন যিয়াদ সাত হাজার সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত এক মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে সাফল্যের সাথে ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর সংযোগকারী প্রণালীটি অতিক্রম করে রজব অথবা শা'বান ৯২/এপ্রিল অথবা মে ৭১১ সালে স্পেন ভুখণ্ডে অবতরণ করেন। তারিক জাহাজগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে মুজাহিদ বাহিনীর উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন। যার সারকথা ছিলো: তোমাদের সামনে রয়েছে শত্রুবাহিনী এবং পিছনে বিশাল মহাসাগর। অতএব সামনে অগ্রসর হওয়া ছাড়া তোমাদের আর কোনো পথ নেই। এ ভাষণের পর থেকে মুসলিম বাহিনী কেবল সামনের দিকেই অগ্রসর হতে থাকে।

২৮ রমাদান ৯২/১৯ জুলাই ৭১১ তারিখে মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী এবং গথিক রাজা রডারিক এর নিয়মিত বাহিনীর মধ্যে ওয়াদী লাক্কু নামক স্থানে তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে গথিক বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে পলায়ন করে। হাজার হাজার গথিক সৈন্য নিহত হয়। রডারিক উপায়ন্তর না পেয়ে পলায়ন করতে গিয়ে নদী বক্ষে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ হারান। গথিক রাজ্যের একটির পর একটি শহরের পতন হতে থাকে। তারিকের মুক্তদাস মুগীছ ৯৩ হিজরীর শুরুতে/অক্টোবর ৭১১ সালে কর্ডোভা জয় করেন এবং বিনা বাধায় টলেডো অধিকার করেন। এভাবে দ্রুততার সাথে অল্প সময়ে সমগ্র স্পেন

---

১. ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয যাহাবী, আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন, করাচী, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল ইসলামিয়া, ১৯৮৭, ২খ, পৃ. ৪৫৭

২. ইফাবা, ইসলামি বিশ্বকোষ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা, ১৯৮৬, ১খ, পৃ. ৩০৮

উপদ্বীপে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ৯২ হিজরী/৭১১ সাল থেকে ৮৯১/১৪৯২ সাল পর্যন্ত সাড়ে সাতশ বছরের অধিককাল স্পেনে মুসলিম শাসন কায়েম থাকে।[৩]

মুসলিমগণের স্পেন বিজয়ের পর থেকে স্পেনে উন্নয়নের সূচনা হয় এবং পর্যায়ক্রমে শান্তি, শৃঙ্খলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, খনিজ সম্পদের ব্যবহার, কৃষি, শিল্পকলা, স্থাপত্য ও কারুশিল্প প্রভৃতির দিক দিয়ে স্পেন উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়। জ্ঞান বিজ্ঞানের সমারোহ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতা এবং কৃষির ক্ষেত্রে শুধু স্পেনই তৎকালীন বিশ্বে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করে।

ইমাম আল কুরতুবীর জন্মস্থান কর্ডোভা নগরী মুসলিমগণ কর্তৃক স্পেন বিজিত হওয়ার সময় শোচনীয়ভাবে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলছিল। স্পেন বিজিত হওয়ার পর গভর্ণর আল হুর্র ইবন আবদুর রহমান আস সাকাফী (৯৭-১০০/৭১৬-১৯) আল আন্দালুসের রাজধানী সেভিল থেকে কর্ডোভায় স্থানান্তরিত করেন। উমাইয়্যা যুবরাজ আবদুর রহমান আদ দাখিল এর সময় (১৩৮/৭৫৬-১৭২/৭৮৮) কর্ডোভা নগরীর শান্তি-শৃঙ্খলা, উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সোনালী যুগের সূচনা হয় এবং তা এই নগরীতে উমাইয়্যা বংশের সম্পূর্ণ শাসনকালব্যাপী (১৩৮-৪০৩ অথবা ৪২২/৭৫৬-১০১৩ অথবা ১০৩১) স্থায়ী হয়। অতুলনীয় সমৃদ্ধি ও শানশওকতের দিক দিয়ে কর্ডোভা খলীফাদের নগরী বাগদাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। কর্ডোভার বিশাল জামে' মসজিদ অতুলনীয় স্থাপত্য শিল্পের চির অমরত্ব লাভ করে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য কর্ডোভা তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। সবদিক বিচারে তৎকালীন কর্ডোভা উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেছিলো, যার প্রমাণ মেলে উত্তর জার্মানী (Saxon)-র মহিলা কবি Hroswitha-র ভাষায়- "ঐ সময় কর্ডোভা ছিলো বিশ্বসুন্দরীর অলংকার"।[৪]

উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও প্রতাপের সাথে মুসলিমগণ তিনশত বছর ইউরোপ তথা স্পেন শাসন করেছেন। এরপর স্পেনের রাজনৈতিক আকাশে কালো মেঘ দেখা দেয়। উমাইয়্যা খলীফা অবদুল মালেক এর মৃত্যুর পর (৩৯৯/১০০৮) তার ভাই আবদুর রহমান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু তিনি পূর্বসূরীদের ন্যায় শৃঙ্খলার সাথে খিলাফত পরিচালনা করতে সমর্থ হননি। তাঁর আমল থেকেই স্পেনের খিলাফতে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সূচনা হয়। এর সূত্র ধরে অবশেষে স্পেনে মুসলমানদের পতন ঘটতে থাকে।[৫] যদিও এর পর আরো প্রায় তিনশত বছর মুসলিমগণ স্পেন শাসন করেন।

স্পেনের শাসক শ্রেণীর মধ্যে উত্তরাধিকারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, পরস্পর কলহ-বিবাদ ও সংঘর্ষের ফলে ছোট ছোট রাজ্যগুলো ক্রমাগতভাবে দুর্বল হয়ে পড়ায় খৃস্টান নৃপতিদের স্পেন পুনরুদ্ধারের লোভ-লালসা প্রবল হয়ে ওঠে। এ উদ্দেশ্যে তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে খৃস্টীয় ঐক্য জোরদার করতে থাকে এবং খৃস্টান শক্তিসমূহের স্পেন পুনর্দখলের প্রচেষ্টাকে উজ্জীবিত করতে থাকে। মুসলিম শাসকশ্রেণীর নৈতিক দুর্বলতা, সুশাসনের অভাব এবং শাসকবর্গের পরস্পর কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধ খৃস্টান শক্তির সফলতাকে ত্বরান্বিত করে দেয়। এমনকি স্পেনে নতুন শাসকের আবির্ভূত হওয়া আসন্ন

৩. ইসলামি বিশ্বকোষ, ১খ, পৃ. ৩১৭/৩২২. বিস্তারিত জানার জন্য আরো দেখুন: ইবনুল আসির, আল কামিল ফীত তারিখ, বৈরূত, দারুল মা'রিফাহ, ২য় সংস্করণ, ২০০৭, ৪খ, পৃ. ২০৯-২১৬
৪. ইফাবা, ইসলামি বিশ্বকোষ, ১৯৮৬, ১খ, পৃ. ৩১৯
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০

হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে খৃস্টান রাজ ষষ্ঠ আলফনসো ১০৮৫ সালে সুকৌশলে রক্তপাতহীনভাবে টলেডো দখল করে নেন। এরপর মাগরিবের মুরাবিত[৬] আমীর ইউসুফ ইবনু তাশুফীন মুলুকুত তাওয়াইফ[৭] এর একটির পর একটিকে সিংহাসনচ্যুত করে আন্দালুসের বৃহৎ অংশ নিজ রাজ্যভুক্ত করে নেন (৪৯৫/১১০২-৫০৩/১১১০)। এ সময় থেকে মুসলিম স্পেন মাগরিব-এর সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়।[৮] এতে স্পেনে মুসলিম শাসন শেষ হয়ে গেলেও উপদ্বীপে ইসলাম সংরক্ষিত থাকে।[৯]

৫১২/১১১৮ সালে সারাগোসা আলফনসোর দখলে চলে যায়। ফলে আন্দালুসে খৃস্টানদের চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মুরাবিত শাসক ইউসুফ ইবনু তাশুফীন এর পুত্র ও উত্তরাধিকারী ইসহাক ইবনু আলী মরক্কোতে আল মুওয়াহহিদূন কর্তৃক হুমকির সম্মুখীন হন। তাছাড়া চতুর্দিক থেকে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, যা প্রতিরোধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আল মুওয়াহহিদূন[১০] কর্তৃক মাররাকুশ অধিকারকালে (৪৪১/১১৪৬-৭) মুরাবিত শাসক আলী নিহত হন। এর অল্প কিছু কাল পরে আল মুওয়াহহিদগণ আন্দালুসীয় মুসলিমদের সহায়তায় স্পেনে উপস্থিত হয় এবং স্পেনের আল মুরাবিত গভর্ণর ইয়াহইয়া ইবনু গানিয়া আল মাসসূফীর মৃত্যুর (৫৪৩/১১৪৮-৯) ফলে স্পেন উপদ্বীপ থেকে আল মুরাবিত শাসনের অবসান ঘটে এবং আল মুওয়াহহিদ শাসনের যাত্রা শুরু হয়।[১১]

স্পেন উপদ্বীপের যে অংশ তখনও মুসলিম শাসনাধীন ছিলো আল মুওয়াহহিদগণ তা নানা বিপদাপদ সত্ত্বেও প্রায় একশত বছর অধিকারে রাখে। খৃস্টানদের পুনর্দখল অভিযানের ফলে প্রতি বছর নতুন নতুন অঞ্চল তাদের হস্তচ্যুত হতে থাকে। যেমন ক্যাটালোনিয়া: (Catalonia)-তে Ramon Berenguer lv যথাক্রমে তরতূশা ও লারিদা দখল করেন। পুনর্দখল অভিযানের প্রধান স্থপতি ছিলেন কাশতালিয়া-এর রাজা ৮ম আলফনসো (১১৫৮-১২১৪) যিনি সিলভেস, ইবোরা ও কুনকা দখল করেন।

৬০৯/১২১২ সালে সম্মিলিত খৃস্টান বাহিনী আল ইকাব নামক স্থানে মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করে উবেদা ও বিয়াসা দখল করে। এরপর সিকি শতাব্দী যেতে না যেতেই ৬৩৪/১২৩৬ সালে মুসলমানগণ কর্ডোভাও হারায়। এরপরই জেমস ১ম কর্তৃক (৬৩৬/১২৩৮) ভ্যালেনসিয়া এবং ফার্ডিনান্দ ৩য় কর্তৃক (৬৪৬/১২৪৮) ইশবীলীয়া অধিকৃত হয়।[১২] এরপরও গ্রানাডার সালতানাত আইবেরীয় উপদ্বীপে একমাত্র মুসলিম

---

৬. মুরাবিত- একটি বার্বার রাজবংশ যারা ৫ম/১১শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তর আফ্রিকা ও পরে স্পেন শাসন করে। - ইফাবা, ইসলামি বিশ্বকোষ, ২০খ,পৃ.২৭৩

৭. মুলুকুত তাওয়াইফ: প্রাক ইসলামি যুগে পারস্য আঞ্চলিক বিভাগসমূহের রাজন্যবর্গ পারসিয়ান বা আরসাসী যুগের আঞ্চলিক শাসক গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত আরবি শব্দগুচ্ছে এবং পরবর্তীকালে আন্দালুসের উমাইয়া খেলাফতের ধ্বংসের সময় যে সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের অভ্যুদয় হয়, সেগুলির শাসকদের ক্ষেত্রেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। - ইফাবা, ইসলামি বিশ্বকোষ, ২০খ, পৃ. ৩১৯

৮. প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ৩২১

৯. প্রাগুক্ত, ২০খ, পৃ. ৩২৩

১০. আল মুওয়াহহিদ: অপর একটি বার্বার রাজবংশ এবং সেই সংস্কারমূলক আন্দোলনের অনুসারীগণের প্রদত্ত নাম, যার প্রধান উপাদান ছিলো ঐশী একত্ব (তাওহীদ)। এর প্রচারকগণ উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা ৬ষ্ঠ/১২শ ও ৭ম/১৩শ শতাব্দীতে শাসন করেন। এ আরবী শব্দটি থেকে আল মুওয়াহহিদ নামকরণ করা হয়। - ইফাবা: ইসলামি বিশ্বকোষ, ১৯খ, পৃ. ৪৯৭

১১. প্রাগুক্ত, ২০খ, পৃ. ২৭৬

১২. ইফাবা, ইসলামি বিশ্বকোষ, ১খ, পৃ. ৩২১

রাজ্য হিসেবে আড়াই শতাব্দীকাল টিকে থাকে। অবশেষে ২ রবিউল আওয়াল, ৮৯৭/৩ জানুয়ারী, ১৪৯২ সালে খৃষ্টান ক্যাথলিক নৃপতিদের হাতে গ্রানাডার পতনের মাধ্যমে আইবেরীয় উপদ্বীপ তথা স্পেন থেকে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে।[১৩] স্পেনে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রায় সন্ধ্যাবেলায় ও মুসলমানদের ক্রান্তিকালে ৭০০/১৩০০ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মুসলিম স্পেনের সৌন্দর্যের রানী কর্ডোভা নগরীতে ইমাম আল কুরতুবী জন্মগ্রহণ করেন।[১৪] তাঁর জন্মতারিখ ও জন্মসাল নির্দিষ্টভাবে পাওয়া যায় না।

জীবন পরিক্রমা

নাম : মুহাম্মাদ, পিতার নাম আহমাদ, পিতামহের নাম আবু বকর, প্রপিতামহের নাম ফারহ। আবু আবদুল্লাহ তাঁর উপনাম। আল আন্দালুস তথা স্পেনের অধিবাসী হিসেবে তাঁকে আল আন্দালুসী বলা হয় এবং আল আন্দালুসের অন্তর্গত কুরতুবা (কর্ডোভা) নগরীতে জন্মগ্রহণ করার কারণে তাঁকে আল কুরতুবী বলা হয়। তিনি মূল নামের চাইতে আল কুরতুবী নামে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ফলে সাধারণভাবে আল কুরতুবী বলা হলে মনোযোগ কেবল তাঁর দিকেই ধাবিত হয়।[১৫] তাঁর বংশপরম্পরা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর পূর্বপুরুষ মদিনার আনসার ছিলেন এবং খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন। এ কারণে তাঁকে আল আনসারী ও আল খাযরাজী বলা হয়। বিদায় হজ্জের ভাষণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন- فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ (এখানে যারা উপস্থিত আছো অনুপস্থিতদের মাঝে আমার বাণী পৌঁছিয়ে দাও)। তাঁর এ নির্দেশ পালনের তাকীদে সাহাবায়ে কেরাম রা. ও পরবর্তী আরব মুসলিমগণ ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রচারের উদ্দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন।

ইমাম আল কুরতুবীর পূর্বপুরুষগণের কেউ হয়তো স্পেন অভিযানে অথবা ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মুসলিমগণের আন্দালুস বিজয়ের পর সেখানে হিজরত করেছেন এবং কর্ডোভায় দীন প্রচারে আত্মনিয়োগ করে সেখানেই স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলেন।

জন্ম ও পরিবার: ইমাম আল কুরতুবীর জন্মতারিখ ও জন্মসাল অজ্ঞাত। তবে এতোটুকু জানা যায় যে, তিনি ৭০০হি./১৩০০ সালের গোড়ার দিকে দক্ষিণ স্পেনের প্রসিদ্ধ নগরী কর্ডোভায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে পিতৃ পরিবারেই তাঁর শৈশব ও কৈশোরকাল অতিবাহিত হয়। বংশমর্যাদার দিক দিয়ে তাঁর পরিবার ছিলো অনেক সম্ভ্রান্ত কিন্তু আর্থিক দিক দিয়ে ছিলো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। জ্ঞানজগতে তাঁর অনাবিল পদচারণা, অগাধ পাণ্ডিত্য ও অনন্য লিখনীর বদৌলতে তাঁর পারিবারিক মর্যাদা আরো বেড়ে যায়।[১৬]

শিক্ষা সফর: কর্ডোভা নগরীতে স্বীয় পিতৃ-পরিবারেই তাঁর শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়। সেখানেই তিনি শিক্ষা জীবন শুরু করেন। প্রথমে তিনি আল কুরআনুল কারীম শিক্ষা গ্রহণ করেন। এর পাশাপাশি তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা এবং কবিতা চর্চা করেন। এতে তিনি ব্যাপক ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর তিনি আরবি ব্যাকরণ, আরবি ভাষার অলংকার শাস্ত্র (উলূমুল বালাগাহ), উলূমুল কুরআন ও ফিক্হ

---

১৩. ইফাবা, ইসলামি বিশ্বকোষ, ১খ, পৃ. ৩২২
১৪. http://www.masrawy.com/islamyat/characters/zolo/april/12/kartoba.aspx
১৫. প্রাগুক্ত
১৬. http://www.masrawy.com. প্রাগুক্ত

(ইসলামি আইন) শাস্ত্রের ওপর ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেন। এসব বিষয়ের জ্ঞান তাঁকে ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান লাভ ও তার গভীরে প্রবেশ সহজ করে দেয়। তিনি কুরআন-হাদিসের জ্ঞানার্জনের জন্যে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন।

কর্ডোভা মুসলিম শাসনাধীন থাকা পর্যন্ত ইমাম আল কুরতুবী সেখানেই জ্ঞানার্জন করতে থাকেন। এই শহরের পতনের পর তিনি ব্যাপক জ্ঞানার্জনের উদ্দেশে প্রাচ্যে হিজরত করে মিসর গমন করেন। মিসরে তখন মামলূকগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলো। তাঁরা ইসলাম ও ইসলমী শরী'আতের এবং ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন, আলেমগণকে সম্মান দেন। মসজিদ-মাদ্‌রাসা নির্মাণ করেন। ফলে সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপক প্রসার ঘটে। এসময় মুসলিমগণ অনেক বড়ো বড়ো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহু জ্ঞানী-গুণী ও বিদ্যান ব্যক্তি বের হন। তাঁরা জ্ঞানজগতে বিশাল অবদান রাখেন এবং শিক্ষার উপাদান হিসেবে বিশাল বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন।

অপরদিকে কর্ডোভার পতনের কারণে এবং মিসরে সম্পূর্ণ অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করায় দলে দলে আলিম-উলামা কর্ডোভা থেকে মিসরে হিজরত করেন। এর ফলে মিসর সমগ্র ইসলামি দুনিয়ার খ্যাতিমান আলেমগণের মহা মিলনমেলা এবং ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহান কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ইমাম আল কুরতুবী মিসরে এসব জগদ্বিখ্যাত আলেমগণের নিকট কুরআন, হাদিস, তাফসির, ইতিহাস ও ফিক্‌হসহ ইলমে দীনের সকল শাখায় ব্যাপক জ্ঞানার্জন করেন। প্রখর মেধা, অসাধারণ প্রতিভা, কঠোর পরিশ্রম, জ্ঞানার্জনের প্রতি গভীর মনোনিবেশ ও অধ্যবসায়ের ফলে এসব বিষয়ে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং জ্ঞানের মহাসাগরে পরিণত হন।[১৭]

শিক্ষকবৃন্দ: ইমাম আল কুরতুবী বহু শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। বাল্যকালে তিনি কর্ডোভায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণ করেন। অত:পর কর্ডোভার পতন পর্যন্ত তিনি বহু শিক্ষকের নিকট কুরআন, হাদিস, তাফসির, ইতিহাস ও ফিক্‌হসহ ইলমে দীনের বিভিন্ন শাখায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর তিনি উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশে মিসর হিজরত করেন এবং সেখানেও তিনি বিশ্ববরেণ্য আলেমগণের নিকট উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে দু'চারজন ব্যতীত অন্যদের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

- আল ইমাম আল মুহাদ্দিস আবু মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইবনু রাওয়াজ যাফর ইবনু আলী ইবনু ফাতূহ আল আযদী আল ইসকান্দারানী আল মালিকী।
- আল্লামা বাহাউদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনু হিবাতুল্লাহ ইবনু সালামাহ আল মিসরী আশ শাফি'ঈ।
- আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু উমার আল মালিকী আল কুরতুবী যিনি সহীহ মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থ 'আল মুফ্‌হিম' রচনা করেন। ইমাম আল কুরতুবী তাঁর এই শিক্ষকের ভাষ্যগ্রন্থের অংশবিশেষ শ্রবণ করেন এবং পরে সম্পূর্ণ কিতাবটি অধ্যয়ন করেন। ইনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত মালিকী ফকীহ (জ. কর্ডোভায় ৫৭৮/১১৭৩, মৃ. আলেকজান্দ্রিয়ায় ৬৫৬/১২৫৯)।
- হাফিজ আবু আলী আল হাসান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল বাকরী।

---

১৭. প্রাগুক্ত

- হাফিজ আবুল হাসান আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু হাফ্স আল ইয়াহসুবী (এ দু'জনও তাঁর হাদিসের শিক্ষক ছিলেন)।
- আল হাসান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আমর আত তাইমী আন নীশাপুরী, আদ দামাশকী আবু আলী সদরুদ্দীন আল বাকরী।

রচনাবলী: ইমাম কুরতুবীর গোটা জীবন অতিবাহিত হয় মহান আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী ও ইসলামি জ্ঞান গবেষণায়। কঠোর পরিশ্রম, অবিরাম চেষ্টা-সাধনা ও অধ্যবসায়ের ফলে যেমন তিনি তাফসির, হাদিস, কিরায়াত, ফিক্হ, ইতিহাস, আরবি ভাষা ও সাহিত্যসহ ইসলামি জ্ঞানের সকল শাখায় অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন, তেমনি ইবাদত-বন্দেগী ও আত্মশুদ্ধির সাধনার মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর একজন খাঁটি বান্দা ও গোলামে পরিণত করতে সক্ষম হন।

ইমাম আল কুরতুবী কখনো ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন আবার কখনো লিখতেন। এভাবেই তাঁর সময় অতিবাহিত হতো। তিনি মানবজাতির কল্যাণের জন্য ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লে-খযোগ্য হলো:

- "আল জামে' লিআহকামিল কুরআন ওয়াল মুবায়্যিন লিমা তাদাম্মানা মিনাস সুন্নাহ ওয়া আয়াতিল ফুরকান" শীর্ষক কুরআনের ভাষ্যের নাম। এটি বিশ খণ্ডে সমাপ্ত।
- "আল আসনা ফী শারহি আসমায়িল্লাহিল হুসনা" এ গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম নামগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
- "আত তাযকার ফী আফদালিল আযকার" এ গ্রন্থটি তিনি ইমাম আন নাওয়াবীর তিব্য়ানের অনুসরণে রচনা করেন।
- "কিতাবুত তাযকিরা ফী আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমূরিল আখিরাহ" এটি দু'খণ্ডে সমাপ্ত।
- আল ই'লাম বিমা ফী দীনিন নাসারা মিনাল মাকাসিদ ওয়াল আওহাম ওয়া ইজতিহারু মাহাসিনি দীনিল ইসলাম।
- কাম'উল হিরস বিয যুহদি ওয়াল কানা'আহ।
- শারহু আত তাকাস্সী।
- আত তাকবীর লিকিতাবিত তামহীদ। এটি বৃহৎ দুই খণ্ডে সমাপ্ত।
- আল মুকতাবিস ফী শারহি মুওয়াত্তা মালিক ইবন আনাস।
- আল লাম'উ আল লু'লুবিয়্যা ফী শারহি আল ইশরিনাত আন নাবাবিয়্যাহ।
- রাদ্দু যুল্লি আস সুয়ালি বিল কিতাবি ওয়াশ শাফ'আহ। ইবনু ফারহূন বলেন, এ বিষয়ে এর চাইতে ভালো কোনো গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

এ গ্রন্থগুলো ছাড়াও তাঁর আরো অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে।[১৮]

চরিত্র ও গুণাবলী: ব্যক্তিগত জীবনে ইমাম আল কুরতুবী প্রখর মেধা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পরম ধৈর্যশীল, কঠোর নিয়মানুবর্তী, সুন্দর আচরণ ও অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী, ধার্মিক, আল্লাহভীরু, পরহেযগার ও আল্লাহপ্রেমে উজ্জীবিত ছিলেন। তিনি সদা অল্পেতুষ্ট থাকতেন। পার্থিব প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদের মোহ তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি

---

১৮. খাইরুদ্দীন আয যিরিকলী, আল আ'লাম, ৫খ, পৃ. ৩২২; www.masrawy.com/islamyat/characters/zolo/april/12/kartoba.aspx : ড. মুহাম্মাদ হুসাইন আয যাহাবী, আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন, ২খ. পৃ.৪৫৭।

খাওয়া-দাওয়া ও পোশাক-পরিচ্ছদে ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে। পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। কৃচ্ছ্রসাধক একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে তাঁকে স্মরণ করা হতো। তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো, তিনি একখানা মাত্র বস্ত্র পরিধান করে মাথায় একটি ক্ষুদ্র টুপি পরে লোক সমক্ষে বের হতেন।

তিনি দুনিয়ার প্রতি ছিলেন নিঃস্পৃহ এবং পরকালীন জীবনের প্রতি ছিলেন একনিষ্ঠ। তার কাম'উল হিরস বিজ-যুহদি ওয়াল কানা'আহ এবং আত-তাযকিরা বিউমূরিল আখিরাহ গ্রন্থ দু'টি থেকে তাঁর দুনিয়াবিমুখ হওয়ার প্রমাণ মেলে। তাঁর দুনিয়াবিমুখ হওয়ার আরো প্রমাণ পাওয়া যায়, যে প্রাচুর্য মানুষকে অহংকারী বানায়, দরিদ্রদের সহযোগিতা করা থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা থেকে অমনোযোগী করে তার তিরস্কার করার মাধ্যমে।

ইমাম আল কুরতুবী খুব সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। যে বিষয়কে তিনি হক বা সত্য মনে করতেন তা প্রচার করার ক্ষেত্রে কারো কোনো পরোয়া করতেন না। ব্যাপক জ্ঞান, তাকওয়া-পরহেযগারী এবং দুনিয়াকে তুচ্ছজ্ঞান করার সুবাদেই তাঁর এ সাহস অর্জিত হয়েছে। আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তিনি কাউকে কোনো পরোয়া করতেন না। তিনি স্বীয় তাফসিরে অনেক জায়গায় উদাহরণ দিয়েছেন, তাঁর যুগের শাসক শ্রেণী সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। তারা মানুষের প্রতি অত্যাচার করতো, উৎকোচ গ্রহণ করতো। ফলে তারা আনুগত্য ও মর্যাদা পাওয়ার অযোগ্য হয়ে যায়।

ক. বিনম্রতা ও অকৃত্রিমতা

ইমাম আল কুরতুবীর চালচলন ছিলো সাদাসিধে। কেনো প্রকার কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতেন না এবং গর্ব-অহংকারও তাঁর মধ্যে ছিলনা। তিনি সাধারণত এক কাপড়েই চলাফেরা করতেন যা তাঁর দরিদ্রতার প্রমাণ বহন করে। তাঁর অর্থনৈতিক প্রাচুর্য ছিলনা। তিনি বিলাসী জীবনযাপন করতেন না।

খ. আন্তরিকতা ও দৃঢ় সংকল্প

ইমাম আল কুরতুবীর জীবনী যারা অধ্যয়ন করবেন তারা অবশ্যই অবাক হবেন কিভাবে তিনি কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা এবং কঠোর চেষ্টা সাধনাকে স্বাভাবিক জীবনে ও স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন।

তিনি সমগ্র জীবনকে জ্ঞান, অধ্যয়ন ও লিখনীর কাজে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। বিরামহীনভাবে তিনি কাজ করে যেতেন। কাজে তাঁর কোনো ক্লান্তি ও অবসাদ ছিলো না। তাঁর জীবনীকারগণ তাঁর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন, তাঁর জীবন তিনি আল্লাহর ধ্যানে, ইবাদত-বন্দেগীতে ও লিখনীর কাজে ব্যয় করতেন। অধ্যয়ন ও লিখনী যে কতো বড়ো মহান ও মর্যাদপূর্ণ কাজ তার যথার্থ অনুভূতিই তাঁকে কঠোর সাধনায় উজ্জীবিত করে।

ইসলামি শরী'আর মূলভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহকে তিনি সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করেন যা তাঁকে কথা ও কাজের মিল ও সত্যতা এবং মানুষের সাথে সদাচার ও সদ্ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করে, মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার ও হীন আচরণ থেকে বিরত রাখে, রিয়া, মুনাফিকী ও অহংকার থেকে দূরে রাখে এবং বিলাসী উপকরণ ও বিলাসী জীবনযাপনের ফিতনা থেকে সতর্ক করে।

ইমাম আল কুরতুবী তাঁর যুগের মুসলমানদেরকে নিয়ে, বিশেষ করে আন্দালুসের মুসলমানদের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর কঠোর অনুসারী ছিলেন।

শেষ জীবন: আন্দালুস যখন পতনের প্রায় দ্বারপ্রান্তে তখন ইমাম আল কুরতুবী আন্দালুসে জন্মগ্রহণ করেন এবং পতনকাল পর্যন্ত আন্দালুসে বসবাস করেন। আন্দালুস অর্থাৎ কার্ডোভার পতনের পর তিনি আন্দালুস থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপর প্রাণকেন্দ্র মিসরে হিজরত করেন। তখন তিনি ছিলেন একজন যুবক। মিসরের উজান অঞ্চলকে তিনি বসবাসের জন্য স্থির করেন এবং লিখনির কাজে মনোযোগ দেন। তাফসির জগতের শ্রেষ্ঠতম তাফসির আল কুরতুবীসহ বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলিম উম্মাহকে ইসলামের সঠিক পথ প্রদর্শনের অনন্য ভূমিকা পালন করেন। ইসলামের এ মহান খাদেম, জ্ঞানের মহাসাগর, ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আল কুরতুবী ৬৭১/১২১২ সালের ৯ শাওয়াল সোমবার রাতে মিসরের উজান অঞ্চলের মুনিয়াতে বনূ খুসাইব-এ মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।[১৯]

মনীষীদের দৃষ্টিতে ইমাম আল কুরতুবী: ইমাম আল কুরতুবী ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ একজন মহাপণ্ডিত। কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফিক্হ, উসূল, বালাগাত ও ইলমুল আরূদসহ ইসলামি জ্ঞানের সকল শাখায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। মুসলিম উম্মাহর প্রাজ্ঞ আলিমগণ তাঁর জ্ঞানের স্বীকৃতি জানিয়ে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

ইমাম আয যাহাবী তারীখুল ইসলাম গ্রন্থে ইমাম আল কুরতুবী সম্পর্কে বলেন, তিনি ছিলেন পাণ্ডিত্যের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী একজন ইমাম এবং জ্ঞানের মহাসাগর। তাঁর রচনাবলী তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার, প্রতিভার প্রসার ও উচ্চতর দক্ষতার সাক্ষ্য বহন করে। তিনি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশে ভ্রমণ করেন, মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন এবং ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিকট থেকে জ্ঞানাহরণ করেন। তিনি ছিলেন সদা সচেতন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অনন্য প্রতিভা, অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও নির্ভরযোগ্য হাফিয।

আল কুতুবী তাঁর উয়ূনুত তাওয়ারীখ গ্রন্থে ইমাম আল কুরতুবী সম্পর্কে একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইবনু ফারহূন বলেন, ইমাম আল কুরতুবী ছিলেন একজন দীনদার, পরহেযগার মুত্তাকী, ধর্মপ্রাণ আবিদ ও বিজ্ঞ আলিম। দুনিয়ার প্রতি তিনি ছিলেন নি:স্পৃহ এবং পরকালীন বিষয়ে ছিলেন প্রগাঢ় অনুরাগী ও সদা নিমগ্ন।[২০]

ইবনুল ইমাদ আল হাম্বলী বলেন, ইমাম আল কুরতুবী হাদীস শাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন একজন বড়ো ইমাম ছিলেন।[২১]

তাফসির আল কুরতুবীর বৈশিষ্ট্য: ইমাম আল কুরতুবীর কর্মময় জীবনের অবিস্মরণীয় কীর্তি "আল জামে' লিআহকামিল কুরআন ওয়াল মুবায়্যিন লিমা তাদাম্মানা মিনাস সুন্নাহ ওয়া আয়াতিল ফুরকান" শীর্ষক কুরআনের ভাষ্য গ্রন্থ। বিস্ময়কর রচনাশৈলী ও অনবদ্য উপস্থাপনা পদ্ধতি, অভিনব বিন্যাস কৌশল ও ভাষার গতিশীলতার দিক দিয়ে

---

১৯. http://www.masrawy.com/islamyat/characters/zolo/april/12/kartoba.aspx; ইবনুল ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, বৈরূত, দারুল মাসীরা, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৯, ৫খ, পৃ ৩৩৫

২০.

২১ . শাযারাতুয যাহাব, ৫খ, পৃ ৩৩৫

এটি একটি অনন্য তাফসির হিসেবে বিবেচিত। এটি একটি বড়ো বিশ্বকোষ ও ইসলামি জ্ঞানের মহাসাগর। এতে বহু ধরনের জ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছে। এটি মহামূল্যবান তথ্য ও চিন্তাসমৃদ্ধ এবং অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ ও হিতকর তাফসির।

* পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতির ইহকালীন শান্তি ও সমৃদ্ধি, পরকালীন মহামুক্তির জন্য যেসব আহকাম ও বিধি-বিধান নাযিল করেছেন মূলনীতি আকারে, পবিত্র কুরআন গবেষণা করে যেসব তাফসিরে তা উদ্ভাবনের পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে তার মধ্যে তাফসির আল কুরতুবী প্রথম দিকের শ্রেষ্ঠতম তাফসির।

এ তাফসিরটি অধ্যয়নে প্রমাণ মেলে এর অনন্য তাফসির পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্যাবলীর। যেসব পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্যে এ তাফসিরটি সমুজ্জ্বল তার উল্লেখযোগ্য কিছু নমুনা পেশ করা হলো।

ক. ভূমিকা সংযুক্তিকরণ: তাফসির আল কুরতুবীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা সংযুক্ত করা হয়েছে। সমগ্র ভূমিকাটি উনিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে যা দ্বারা গ্রন্থটির নীতি, আলোচনা পদ্ধতি ও ধর্মতত্ত্ব নির্ধারিত হয়েছে।

এক : এ পরিচ্ছেদে আল কুরআনের মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। আল কুরআনের শিক্ষার্থী, অধ্যয়নকারী, শ্রোতা ও আমলকারীদের ফযিলত ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। এ পরিচ্ছেদে এসব বিষয়ের উপর সুদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে।[২২]

দুই : এতে কুরআন তিলাওয়াতের ধরন, তিলাওয়াতের মাকরূহ ও হারাম বিষয় এবং এক্ষেত্রে মতপার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[২৩]

তিন : এতে কুরআন ও কুরআনের অনুসারীদের আভ্যন্তরীণ গুণাবলী আলোচিত হয়েছে। তারা সব ধরনের রিয়া, কপটতা প্রভৃতি অসৎ গুণাবলী থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখবে এবং তওবা ও ইনাবার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা অর্জন করবে।[২৪]

চার : এ পরিচ্ছেদে সেসব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে যা কুরআন অনুসারীদের আকড়ে ধরা নিতান্ত প্রয়োজন এবং যা উপেক্ষা করা কোনোভাবেই উচিত নয়।[২৫]

পাঁচ : এ পরিচ্ছেদে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা ও তার শিক্ষা গ্রহণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যারা বিশুদ্ধ তিলাওয়াত করে তাদের সাওয়াব প্রভৃতি বিষয় এ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।[২৬]

ছয় : এ পরিচ্ছেদে তাফসির ও তাফসিরকারগণের মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[২৭]

সাত : এ পরিচ্ছেদে আল কুরআনের বাহকের মর্যাদা এবং আল কুরআনের বাহকের বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং যারা তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে তাদেরকে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করা হয়েছে।[২৮]

---

২২. দেখুন, তাফসীর আল কুরতুবী: ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭-১০ ভূমিকা অংশ।
২৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০-১৫।
২৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬।
২৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭:
২৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯-২১:
২৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ২১।

আট : আল কুরআন ও তার পবিত্র বৈশিষ্ট্যের প্রতি তার পাঠক ও বাহকের শ্রদ্ধাবোধ থাকা অপরিহার্য।[২৯]

নয় : এতে ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে আল-কুরআনের তাফসির করা ও এর দু:সাহস প্রদর্শন করার প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং তাফসিরকারগণের স্তর বা শ্রেণী বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে।[৩০]

দশ : এতে সুন্নাহর ভিত্তিতে আল-কুরআনের তাফসির করার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।[৩১]

এগারো : কিভাবে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ পাঠ ও অনুধাবন করতে হবে তা আলোচনা করা হয়েছে।[৩২]

বারো : এতে আলোচিত হয়েছে রসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী "এই কুরআন সাত হরফ (পাঠ) অনুসারে নাযিল হয়েছে" -এর অর্থ। সুতরাং তোমরা কুরআন সেভাবে পড়ো যেভাবে পড়লে তোমার কাছে সহজ মনে হয়।[৩৩]

তেরো : এতে আল কুরআন পুস্তকাকারে সংকলন, আল কুরআনের সূরা ও অংশসমূহের বিন্যাস ইতিহাস এবং উসমান রা. এর আমলের সুষ্ঠু সংকলন ব্যতীত অন্যান্য সংকলন পুড়িয়ে দেয়ার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৪]

চৌদ্দ : এ পরিচ্ছেদে আল কুরআনের সূরা, আয়াত, হারাকাত (স্বরচিহ্ন, নুকতা, পারা, শব্দ ও আয়াত সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে।[৩৫]

পনেরো : এতে আল কুরআনের সূরা, আয়াত, শব্দ ও বর্ণের অর্থ আলোচনা করা হয়েছে।[৩৬]

ষোল : এতে পবিত্র কুরআনে আরবি ভাষা বহির্ভূত কেনো শব্দ আছে কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[৩৭]

সতেরো : এ পরিচ্ছেদে আল কুরআনের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যের রহস্য এবং মু'জিযার শর্তাবলী ও তার বাস্তবতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[৩৮]

খ. শানে নুযূল বর্ণনা করা: তাফসির আল কুরতুবী বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি হলো, আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার কারণ বা শানে নুযূল বর্ণনা করা। যেসব আয়াত কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে ইমাম আল কুরতুবী সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসিরের শুরুতে সে প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন।

গ. তথ্যসূত্রের বরাত: তাফসির আল কুরতুবীর আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো তথ্যসূত্র উল্লেখ করা। সালাফ আস-সালিহীনের (পূর্বসূরিগণের) মধ্যে যারা আল-কুরআনের

---

২৮. প্রাগুক্ত: পৃ-২২।
২৯. প্রাগুক্ত।
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫।
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯।
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০।
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৭।
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৩।
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৭।
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৯।
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ: ৫০।

তাফসির ও আহকাম (বিধিবিধান) বর্ণনার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন ইমাম আল কুরতুবী স্বীয় তাফসির গ্রন্থে তাঁদের থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করেছেন এবং তার সাথে তথ্যসূত্রও উল্লেখ করেছেন।

অনুরূপভাবে তিনি স্বীয় তাফসির গ্রন্থে মুতাকাদ্দিমীনের (অগ্রবর্তীগণের) তাফসির থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে যারা আল-কুরআনের আহকাম বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের গ্রন্থ থেকে তিনি অনেক কিছু উদ্ধৃত করেছেন। আর বর্ণিত তথ্যে ও বক্তব্যে ভুলত্রুটি থাকলে তিনি তার সমালোচনাও করেছেন।[৩৯] যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا 'তোমরা রুকু ও সাজদা করো'[৪০] এ আয়াতে সালাতে রুকু ও সাজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আভিধানিক অর্থে রুকু ও সাজদা কেবল মাথা নত করাকে বলা হয়। কতিপয় আলেমের মতে রুকু ও সাজদা যার নাম অর্থাৎ মাথা নত করা, সালাতের রুকু ও সাজদায় কেবল ততোটুকু করাই যথেষ্ট। কেননা আয়াতে ধীরস্থিরভাবে প্রশান্তির সাথে রুকু ও সাজদা করার শর্ত আরোপ করা হয়নি। সুতরাং তাঁরা রুকু ও সাজদা নামের ন্যূনতম অর্থকেই গ্রহণ করেছেন। ইবনু আবদিল বার বলেন, রুকু, সাজদা, রুকু ও সাজদার মাঝে দাড়ানো, দুই সাজদার মাঝে বসা যথেষ্ট হবে না যতোক্ষণ না সালাতের এ কাজগুলো প্রশান্তির সাথে করা হয়। আর একথাই হাদিস ভিত্তিক ও সঠিক কথা। এটা জুমহুর (অধিকাংশ) আলিমগণের অভিমত।

পক্ষান্তরে কাযী আবু বাকর ইবনুল আরাবী বলেন, ইবনুল কাসিম প্রমুখ থেকে অনেক বর্ণনা রয়েছে যাতে রুকু সাজদা প্রভৃতির মাঝে পার্থক্য করা ওয়াজিব হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তবে শান্তশিষ্টভাবে রুকু ও সাজদা করার কথা তাতে নেই।

ইমাম আল কুরতুবী ইবনুল আরাবীর এ কথার সমালোচনা করে বলেন, এটা ইবনুল আরাবীর বড়ো ভুল ধারণা। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে শান্ত শিষ্টভাবে রুকু-সাজদা করেছেন, করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন।[৪১] অতএব ইবনুল আরাবীর একথা গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম আল কুরতুবী যাদের তাফসির ও আহকাম গ্রন্থ থেকে সবচেয়ে বেশী তথ্য নিয়েছেন তারা হলেনঃ ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী, ইমাম ইবনু আতিয়া, ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবী, ইলকিয়া আল হাররাসী ও ইমাম আবু বকর আলজাসসাস।[৪২]

আল কুরআন থেকে উদ্ভূত বিধানসমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, ইমাম আল কুরতুবী মতোবিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহ আয়াতের সাথে যার নিকটতম সম্পর্ক ও দূরতম সম্পর্ক রয়েছে সবই তিনি দলিল-প্রমাণসহ বর্ণনা করেছেন।[৪৩]

ঘ. আহকাম বর্ণনাঃ তাফসির আল কুরতুবীর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো আল কুরআন থেকে উদ্ভূত বিধানসমূহ বর্ণনা করা। ইমাম আল কুরতুবী আল কুরআনের আহকাম

---

৩৯. আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫৯।
৪০. সূরা আল হাজ্জ : ৭৭।
৪১. দেখুন, তাফসীর আল কুরতবী; ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৭।
৪২. আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫৯।
৪৩. প্রাগুক্তঃ

সম্বলিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পাশাপাশি আয়াতে শরী'আতের আহকাম এক বা একাধিক যাই থাকুক না কেনো সবিস্তারে ও ইমামগণের মতামত সহকারে বর্ণনা করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَأَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَأْتُو الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ

"তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং রুকুকারীগণের সাথে রুকু করো।" (সূরা আল বাকারাহ: ৪৩)

ইমাম আল কুরতুবী আলোচ্য আয়াত থেকে চৌত্রিশটি মাসয়ালা উদ্ভাবন করেছেন। এখানে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি মাসয়ালা উল্লেখ করা হলো।

এক. সালাত কায়েম করা। এটি সর্বসম্মতভাবে ফরয। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে বিধায় এখানে তার পূনরাবৃত্তি করা হয়নি।

দুই. যাকাত প্রদান করা। এটাও ফরয। অত:পর প্রমাণস্বরূপ কুরআনের আয়াত ও হাদিস উদ্ধৃত করে اَتُوْا শব্দটির তাজবীদগত বিশ্লেষণ করেছেন।

তিন. زَكَاةٌ শব্দটির মূল ধাতু ও তার অর্থ কি হবে তার প্রমাণস্বরূপ কুরআনের আয়াত ও আরবি কবিতা উদ্ধৃত করে এবং আরবি ভাষাগত বিশ্লেষণ করে তার অর্থ নির্ধারণ করেছেন।

চার. এখানে যাকাত থেকে ফরয যাকাত উদ্দেশ্য না অন্য কিছু উদ্দেশ্য সে বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। বলা হয়েছে, যেহেতু আয়াতটিতে ফরয সালাতের সাথে যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু এখানে ফরয যাকাতই উদ্দেশ্য হবে।

অপর কেউ বলেছেন, এর উদ্দেশ্য হবে সাদাকাতুল ফিতর। ইমাম আল করতুবী প্রথমোক্ত অভিমতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এটিকে অধিকাংশ ইমামের অভিমত হিসেবে উল্লেখ করে কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতি সহকারে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি আহকাম সম্বলিত প্রতিটি আয়াত থেকে বহু মাসয়ালা ইমামগণের মতামতসহ বর্ণনা করেছেন।

ঙ. উৎসসহ হাদিসের উদ্ধৃতি: ইমাম আল কুরতুবী বলেন, "বহু তাফসির ও ফিক্‌হ গ্রন্থে উৎস উল্লেখ না করে শুধু হাদিস উদ্ধৃত হয়, যার উৎস হাদিস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন পাঠকগণ ব্যতীত অন্যদের পক্ষে জানা সম্ভব হয় না। বরং তারা হাদিসটির গ্রন্থ পরিচিতি ও শুদ্ধাশুদ্ধি সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্থ থেকে যায়। এভাবে উৎস ছাড়া উদ্ধৃত হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা গ্রহণযোগ্য নয়।" তাই ইমাম আল কুরতুবী স্বীয় তাফসির গ্রন্থে তাফসির প্রসঙ্গে এবং আয়াত থেকে শরী'আতের বিধি-বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে দলিল হিসেবে যেসব হাদিস উদ্ধৃত করেছেন তা হাদিসগ্রন্থ ও বর্ণানাকারীর নামসহ উদ্ধৃত করেছেন। এটি তাফসির আল কুরতুবীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ইমাম আল কুরতুবী এ বৈশিষ্ট্যকে তাঁর তাফসিরে কুরতুবীর একটি শর্ত হিসেবে অভিভিহত করেছেন।

চ. ইসরাঈলী রেওয়ায়াত ও মাওযু হাদিস: অনেক তাফসির গ্রন্থে ইসরাঈলী রেওয়ায়াত ও মাওযু (মনগড়া) হাদিসের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। ইমাম আল কুরতুবী তাঁর তাফসিরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। তবে কোনো কোনো জায়গায় তিনি ইসারাঈলী রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন কিন্তু সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। আম্বিয়ায়ে

কেরাম ও ফেরেশতাগণের পবিত্রতায় আঘাত হানে অথবা আকীদা-বিশ্বাসে আঘাত আসে এরূপ মাওযু হাদিস ও ইসরাঈলী রেওয়ায়াতকে তিনি বাতিল বলে আখ্যায়িত করেছেন অথবা দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যেমনটি করেছেন হারূত ও মারূত, দাউদ আ. ও সুলায়মান আ. এর ঘটনায় বর্ণিত ইসরাঈলী রেওয়ায়াত ও মাওযু হাদিস সম্পর্কে এবং সতর্ক করেছেন জাল হাদিস দ্বারা শানে নুযূল বর্ণনা করার বিষয়ে।[৪৪]

ছ. নাসিখ-মানসূখ: তাফসির আল কুরতুবীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো নাসিখ ও মানসূখ বর্ণনা করা। নাসিখ ও মানসূখের মূলধাতু 'নাসখ' অর্থ রহিত করা। নাসিখ অর্থ রহিতকারী এবং মানসূখ অর্থ রহিত। কুরআন ও হাদিসের পরিভাষায় এক বিধানের স্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করাকে 'নাসখ' বলা হয়। অন্য বিধানটি কোনো বিধানের বিলুপ্তি ঘোষণাও করতে পারে। আবার এক বিধানের পরিবর্তে অপর বিধান প্রবর্তনও হতে পারে।

পবিত্র কুরআনে যতো জায়গায় নাসখের ঘটনা ঘটেছে ইমাম আল কুরতুবী তাঁর স্বীয় তাফসির গ্রন্থে সবই আলোচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে নাসখের একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

"অচিরেই নির্বোধরা বলবে, কিসে তাদেরকে তাদের কিবলা থেকে ফিরালো যার অনুসারী তারা ছিলো? বলুন, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে চান সোজা পথ দেখান।"[৪৫]

উপরোক্ত আয়াতে ইমাম আল কুরতুবী নাসখুল কিবলা বা কিবলা পরিবর্তনসহ মোট এগারটি বিষয় আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহর বিধিবিধান ও তাঁর কিতাবে নাসিখ ও মানসূখ বিদ্যমান। আর এ ব্যাপারে ইজমা' সংঘটিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কী জীবনে যখন সালাত ফরয হয়, তখন তিনি বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন না কা'বার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

জ. পঠন পদ্ধতির বর্ণনা: ইমাম আল কুরতুবী ছিলেন ইলমে কিরায়াতের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। তিনি স্বীয় তাফসিরে ইলমে কিরায়াতের রীতি অনুসারে কুরআনের বিভিন্ন শব্দের পঠন পদ্ধতি বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّيْ أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ •

"আর সে (ইউসুফ) যে মহিলার ঘরে ছিলো, সে তাঁকে কুপ্ররোচনা দিলো এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে বললো, 'এসো'। সে (ইউসুফ) বললো, আল্লাহর আশ্রয়

৪৪. http://www.masrawy.com/islamyat/characters/zolo/april/12/kartoba.aspx
৪৫. সূরা আল বাকারাহ : ১৪২

চাই। নিশ্চয়ই তিনি আমার মনিব। তিনি আমার থাকার সুব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই যালিমরা সফল হয় না।"[৪৬]

উপরোক্ত আয়াতে هَيْتَ শব্দটির পঠন পদ্ধতি সম্পর্কে ইমাম আল কুরতুবী বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন।

১. আন্-নাহ্হাস বলেন, আয়াতে هَيْتَ لَكَ শব্দটি ইলমে কিরায়াতের রীতি অনুসারে সাত কিরায়াত পাঠ করা যায়। এর মধ্যে বিশুদ্ধতম কিরায়াত হলো هَيْتَ لَكَ

২. আ'মাশ আবু ওয়ায়িল থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ইবনু মাসউদ রা. কে هَيْتَ لَكَ পাঠ করতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি বললাম, এক গোত্র এ শব্দটিকে هِيْتَ لَكَ পাঠ করে।

৩. আরবি ব্যাকরণবিদ ইবনু ইসহাক শব্দটিকে هَيْتِ لَكَ পাঠ করেন।

৪. আবু আবদুর রহমান আস সুলামী ও ইবনু কাসীর শব্দটি هَيْتُ لَكَ পাঠ করেন।

৫. ইয়াহইয়া ইবনু ওয়াস্সাব পাঠ করেন هِيْتُ لَكَ

৬. আলী ইবনু আবু তালিব, ইবনু আব্বাস রা., মুজাহিদ ও ইকরিমা থেকে বর্ণিত হয়েছে هِئْتُ لَكَ

৭. ইবনু আমের ও সিরিয়ার অধিবাসীগণ পাঠ করেন هِئْتَ لَكَ।[৪৭]

ইমাম আল কুরতুবী স্বীয় তাফসিরে আলোচ্য শব্দটির ন্যায় কুরআনের বিভিন্ন শব্দের পঠন পদ্ধতি বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে ইলমে কিরায়াতের ওপর তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের সাক্ষর রেখেছেন।

ট. বাতিল ফিরকাসমূহের ভ্রান্ত অভিমত খণ্ডন: তাফসির আল কুরতুবীর আরো একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো খারিজী, মু'তাযিলী, জাবারিয়া, কাদারিয়া, শিয়া সম্প্রদায়সহ সকল প্রকার বাতিল ফিরকা ও সীমালংঘনকারী তাসাউফপন্থীদের ভ্রান্ত মতবাদ উল্লেখ করে তার সমালোচনা করা এবং কুরআন, সুন্নাহ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তির মাধ্যমে তা খণ্ডন করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অভিমত প্রতিষ্ঠিত করা।

ঠ. আরবি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে আল কুরআনের বিভিন্ন শব্দের অর্থ নির্ণয়: তাফসির আল কুরতুবীর আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো, গ্রন্থকার আয়াতের ব্যাখ্যায় আরবি কবিতা ব্যবহার করেছেন। আয়াতের কোনো শব্দ কখন কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তাও তিনি আরবের প্রসিদ্ধ কবি-সাহিত্যিকগণের কাব্যভাণ্ডার থেকে কবিতা উদ্ধৃত করে প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থখানায় এতো বিপুল পরিমাণে কবিতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে, যা সচরাচর অন্য কোনো তাফসিরে পরিলক্ষিত হয় না। এর মাধ্যমে কাব্য শাস্ত্রে গ্রন্থকারের অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ড. ফকীহগণের অভিমত বর্ণনা: তাফসির আল কুরতুবীর আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো, কুরআনের আহকাম বর্ণনার ক্ষেত্রে ফকীহ্গণের মতামত বিবৃত করা এবং কুরআনের জটিল বিষয় সালাফ আস সালেহীন ও তাদের পরবর্তী অনুসারীগণের (খালাফগণের) মতামত উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। যেমন আল্লাহর বাণী : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا

---

৪৬. সূরা ইউসূফ : ২৩
৪৭. তাফসীর আল কুরতুবী, ৯খ, পৃ. ১০৮

الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعُوْنَ "তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' করো"।[৪৮]

এ আয়াতের তাফসিরে ইমাম আল কুরতুবী চৌত্রিশটি বিষয় আলোচনা করেছেন। নবম আলোচ্য বিষয় হলো, সালাতের সাজদায় কপাল ও নাক যমীনে রাখা প্রসঙ্গে। অর্থাৎ যমীনে শুধু কপাল রাখবে, না শুধু নাক রাখবে, না উভয়টাই রাখবে? এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম মালেক রহ. বলেন, সাজদায় নাক ও কপাল উভয়টাই যমীনে রেখে সাজদা করবে। এটাই সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ও ইবরাহীম নাখ'ঈ রহ.এর অভিমত। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ. বলেন, কপাল ও নাক -এর যে কোনো একটি দ্বারা সাজদা করলে তা যথেষ্ট হবে। আর এটাই আবু খাইসামা ও ইবনু আবু শাইবা রহ. এর অভিমত। ইসহাক বলেন, শুধু কপাল অথবা শুধু নাক যমীনে ঠেকিয়ে সাজদা করলে তাতে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। আওযাঈ, সা'ঈদ ইবনু আবদুল আযীয এবং ইবনু আব্বাস, সা'ঈদ ইবনু জুবাইর রহ. ইকরিমা ও আবদুর রহমান ইবনু আবু লাইলা সবাই কপালের সাথে নাক যমীনে রেখে সাজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কতিপয় লোক বলেন, শুধু কপাল যমীনে রেখে সাজদা করলে তা যথেষ্ট হবে। 'আতা, তাউস, ইকরিমা, ইবনু সীরীন ও হাসান বসরী প্রমুখ এ মতের প্রবক্তা। ইমাম শাফি'ঈ, ইয়া'কূব ও ইমাম মুহাম্মাদ এ মত পোষণ করেন। ইবনুল মুনযির বলেন, কেউ বলেছেন, শুধু কপাল অথবা শুধু নাক যমীনে রেখে সাজদা করা মন্দ কাজ। তবে সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে। এটা নু'মান এর অভিমত। ইবনুল মুনযির বলেন, এর পূর্বে এরূপ কথা কেউ বলেছেন এবং কেউ এর অনুসরণ করেছেন এটা আমার জানা নেই।

ইমাম আল কুরতুবী বলেন, সাজদার ক্ষেত্রে সঠিক কথা হলো, যমীনে কপাল ও নাক রাখা। আবু হুমাইদ আস সা'ইদী র. থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাজদা করতেন তখন তাঁর কপাল ও নাক যমীনে রাখতেন। ইবনু আব্বাস রা. থেকে সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি সাতটি অঙ্গের সাহায্যে সাজদা করতে আদিষ্ট হয়েছি। তা হলোঃ কপাল এবং তিনি হাত দ্বারা নাকের দিকে ইঙ্গিত করলেন।[৪৯] এরপর দু'হাত, দু'হাঁটু এবং দু'পায়ের আঙ্গুলসমূহ। (ইমাম আল কুরতুবী বলেন) এসবই সালাতের সংক্ষিপ্ত কথার ব্যাখ্যা। অতএব সাজদায় যমীনে কপাল ও নাক রাখার বিষয়টি নির্ধারিত হয়ে গেলো। ইমাম মালেক থেকে আরো একটি অভিমত পাওয়া যায়। তা হলো, সাজদায় শুধু কপাল রাখলেই যথেষ্ট হবে। তবে তাঁর সঠিক মত হলো, নাকসহ কপাল রাখা।[৫০]

ঢ. হাদিস, সাহাবি-তাবি'ঈ ও তাবৃউ তাবি'ঈনের বক্তব্য দ্বারা দলিল পেশ: তাফসির আল কুরতুবীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলোঃ ইমাম আল কুরতুবী কুরআনের আয়াতের শানে নুযূল, আয়াতের তাফসির এবং আহকামের আয়াতসমূহের আহকাম

---

৪৮. সূরা আল বাকারাহ : ৪৩

৪৯. কপাল ও নাক উভয়টি সাজদায় যমীনে রাখতে হবে। অর্থাৎ নাক ও কপাল একই অঙ্গভুক্ত। দেখুন: ফাতহুল বারী, ২খ, পৃ. ৩৪৬;

৫০. তাফসীর আল কুরতুবী, ১খ, পৃ. ২৩৬

বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রামাণ্য দলিলস্বরূপ অসংখ্য হাদিস উদ্ধৃত করেছেন যেগুলোর সাথে আয়াতের অর্থের সমন্বয় রয়েছে। তাফসির, শানে নুযূল ও আহকাম বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তিনি মারফূ' হাদিসের পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরাম, তাবি'ঈ ও তাব্উ তাবিঈ'নের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণীঃ

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى "তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো।"[৫১]

এ আয়াতের অধীনে ইমাম আল কুরতুবী তিনটি বিষয় আলোচনা করেছেন। তৃতীয় আলোচ্য বিষয় হলো, 'মাকামে ইবরাহীম' এর মাসয়ালা। মাকাম এর আভিধানিক অর্থ হলো দু'পা রাখার জায়গা। 'মাকাম' নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধতম অভিমত হলো, যে পাথরটির নিকট লোকেরা আগমনী তাওয়াফের পর দুই রাকাত সালাত আদায় করে থাকে সেটিই মাকামে ইবরাহীম। এটা ইবনু আব্বাস রা., জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রা., কাতাদা ও অন্যান্য মুফাস্সিরগণের অভিমত।

ণ. বিরল ও দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যাঃ তাফসির আল কুরতুবীর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, আল কুরআনের যেসব শব্দ সাধারণ পাঠকবৃন্দের নিকট অপরিচিত, জটিল ও দুর্বোধ্য তিনি সেগুলোর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে সাধারণ পাঠকদের জন্য সহজবোধ্য করে তুলেছেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এসব শব্দের বিভিন্নার্থে প্রয়োগের দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করেছেন। যেমন আল্লাহর তা'আলার বাণীঃ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ 'যে ব্যক্তি সিংহের ভয়ে পালাচ্ছে।[৫২]

উপরোক্ত আয়াতে قَسْوَرَةٍ শব্দটি সাধারণ পাঠকবৃন্দের নিকট অপরিচিত ও দুর্বোধ্য। ইমাম আল কুরতুবী আরবি ভাষাবিদ, সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈ' ও প্রাচীন মুফাসসিরগণের বর্ণিত অর্থ, ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। যেমন তিনি লিখেছেন, فَرَّتْ পালায়ন করেছে مِنْ قَسْوَرَةٍ যারা নিক্ষেপ করে এমন কোনো নিক্ষেপকারীর ভয়ে। কোনো কোনো আরবি ভাষাবিদ বলেন, قَسْوَرَةٍ নিক্ষেপকারী। সা'ঈদ ইবনু জুবায়র, ইকরিমা, মুজাহিদ, কাতাদাহ, দাহ্হাক ও ইবনু কায়সান প্রমুখ মুফাস্সিরগণ শব্দটির অর্থ করেছন নিক্ষেপকারী ও শিকারীদল। 'আতা, ইবনু আব্বাস ও আবু যাব্য়ান, আবু মূসা আল আশ'আরী রা. থেকে এ অর্থ বর্ণনা করেছেন। শব্দটির অর্থ সিংহ বলেও কথিত আছে।

আবু হুরায়রা রা. ও ইবনু আব্বাস রা. শব্দটির অর্থ সিংহ বলেছেন। ইবনু আরাফাহ বলেন, اَلْقَسْرُ অর্থ اَلْقَهْرُ জবরদস্তি। নিশ্চয়ই হিংস্রজন্তু বা সিংহ শক্তি প্রয়োগ করে। الحمر الوحشية تهرب من السباع "বন্য গাধা সিংহের ভয়ে পলায়ন করে।"

ইবনু আব্বাস রা. থেকে আবু ছামরা বর্ণনা করেছেন, শব্দটির অর্থ একদল লোক। তাঁর থেকে শব্দটির অর্থ বর্ণিত হয়েছে মানুষের অনুভূতি ও ক্ষীণ আওয়াজ। তাঁর থেকে فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ এর অর্থ বর্ণিত হয়েছে "শিকারীর রজ্জু থেকে পালায়ন করেছে।" তাঁর থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, আরবি ভাষায় مِنْ قَسْوَرَةٍ এর অর্থ হলো- সিংহ, হাবশী ভাষায় নিক্ষেপকারী, ফারসী ভাষায় বাঘ।

---

৫১. সূরা আল বাকারাহঃ ১২৫
৫২. সূরা আল মুদ্দাস্সিরঃ ৫০

ইবনুল আরাবী বলেন, শব্দটির অর্থ রাতের প্রথমাংশ। فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ অর্থ রাতের অন্ধকার থেকে পালায়ন করেছে।

ইকরিমা শব্দটির অর্থ বলেন, রাতের প্রথমাংশের অন্ধকার। যায়দ ইবনু আসলাম বলেন, শক্তিশালী পুরুষ। আরবগণ প্রতিটি কঠিন জিনিসকে قَسْوَرَةٍ বলে থাকেন।[৫৩]

এভাবে ইমাম আল কুরতুবী রহ. স্বীয় তাফসির গ্রন্থে সর্বত্র অপরিচিত ও কঠিন শব্দসমূহের ব্যাখ্যা করেছন।

ত. গোঁড়ামি পরিহার: তাফসির আল কুরতুবীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো গোঁড়ামী পরিত্যাগ করা। ইমাম আল কুরতুবী স্বীয় তাফসির গ্রন্থে আহকাম বিষয়ক আয়াতের তাফসিরে ফিকহী মাসয়ালা বর্ণনা করেছেন। কোনো মাযহাবের প্রতি কোনোরূপ বিরূপ ধারণা ব্যতিরেকে বিনয় ও সংযমের সাথে ইমামগণের ফিকহী মতামত পেশ করেছেন এবং তার ওপর দলিল ভিত্তিক আলোচনা-পর্যালোচনা করে স্বীয় মতামত প্রদান করেছেন। মতামত প্রদান করার ক্ষেত্রে কেনো প্রকার গোঁড়ামির আশ্রয় গ্রহণ না করে তিনি চলেছেন দলিলের সাথে ইনসাফের পথে। তিনি মালিকী মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও মালিকী মাযহাবকে প্রাধ্যন্য না দিয়ে যে মতের পক্ষে যথার্থ দলিল রয়েছে সে মতের প্রবক্তা যেই হোন না কেন ইনসাফের তাকীদে সে মতকেই প্রধান্য দিয়ে তিনি সঠিক মাসয়ালা বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপূর্ণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন।

থ. কিস্‌সা-কাহিনী পরিহার: তাফসির আল কুরতুবীর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো কিস্‌সা-কাহিনী ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পরিহার করা। ইমাম আল কুরতুবী বলেন, আমি তাফসির আল কুরতুবীতে বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থে মুফাস্‌সিরগণের বর্ণিত কিস্‌সা-কাহিনী ও উপাখ্যান এবং ঐতিহাসিকগণের বর্ণিত তথ্য ও ঘটনাবলী পরিহার করেছি। তবে সম্পূর্ণরূপে নয়, বরং নিতান্ত প্রয়োজনে একেবারেই না হলে নয় এ পর্যায়ে কিছু কিছু গ্রহণ করেছি, যার সহায়তা নিয়েছি কুরআনের তাফসির করা এবং আহকামের আয়াতসমূহ মাসায়িল সহকারে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে। এসব মাসায়িল আহকামের আয়াতসমূহের অর্থ সুস্পষ্ট করে দেয় এবং তার চাহিদা ও দাবির প্রতি তাফসির অধ্যয়নকারীদের পথ প্রদর্শন করে।[৫৪]

ইমাম ইবনুল আরাবী কর্তৃক তার বিরোধীদের প্রতি আক্রমণের ক্ষেত্রে ইমাম আল কুরতুবীর ভূমিকা: আমরা দেখতে পাই যে, ইমাম আল কুরতুবী রহ. ইনসাফের তাকীদে বহু জায়গায় ইবনুল আরাবী আল মালিকীকে প্রতিহত করেছেন। বিরোধীদের নিন্দা এবং তাঁর বিপরীত মত গ্রহণকারী ওলামায়ে কেরামের প্রতি কঠোর ভাষা ব্যবহার করার কারণে তাঁকে তিনি তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

"আর তোমরা খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর থেকে মাদক ও উত্তম রিযিক গ্রহণ করে থাকো।"[৫৫]

---

৫৩. তাফসীর আল কুরতুবী, ১৯খ. পৃ. ৫৮
৫৪. তাফসীর আল কুরতুবীর ভূমিকা, পৃ: ৬।
৫৫. সূরা আন নাহল : ৬৭।

এ আয়াতের তাফসিরে ইবনুল আরাবী আল-মালিকী হানাফী ও আরো যারা নাবীয (খেজুর ভিজানো শরবত বা পানীয়)-কে হালাল বলেছেন তাঁদেরকে নির্বোধ কাফিরদের সাথে তুলনা করে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। এর জবাবে ইমাম আল কুরতুবী ইবনুল আরাবীকে ভর্ৎসনা করে বলেন, বোধ-বুদ্ধির অক্ষমতার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতম আলেমগণকে কাফেরদের সাথে মিলানো বড়োই দুঃখজনক।[৫৬]

মোটকথা ইমাম আল কুরতুবী রহ. এই তাফসিরে গবেষণা ও অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন, সমালোচনা করার ক্ষেত্রে ছিলেন ন্যায়পরায়ন, আলোচনা ও বিতর্ক করার ক্ষেত্রে ছিলেন পূর্ণ সংযমী, তাফসিরের সকল দিক ও বিষয়ে ছিলেন সম্যক জ্ঞাত ও পরিচিত। ইসলামি শরী'আতের সকল শাখায় তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ, সর্বত্রই ছিলো তাঁর অবাধ বিচরণ এবং সব বিষয়ে ছিলো তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য।[৫৭]

উপসংহার: ইমাম আল কুরতুবী ছিলেন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। তাফসীর আল কুরতুবী তাঁর কর্মময় জীবনের অবিস্মরণীয় কীর্তি। বিস্ময়কর রচনাশৈলী, অনবদ্য উপস্থাপনা ও ভাষার লালিত্যে তাফসীরখানা অনন্য। যে কোনো ব্যক্তি যদি কেবল এ তাফসীরখানিই ভালোভাবে অধ্যয়ন করে তাহলে তার কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, উসূল, বালাগাত, আরবি ভাষা, সাহিত্য, আরবি ব্যাকরণ এবং ইলমুল আরূদসহ ইসলামী সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করার জন্য যথেষ্ট হবে। এ তাফসীরখানি অধ্যয়ন করলে মনে হবে সত্যিই এটি কুল-কিনারাহীন জ্ঞানের এক মহাসাগর।

***

৫৬. দেখুন, তাফসীর আল কুরতুবী, ১০ম খ, পৃ: ৮৫-৮৬; আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরূন, ২য় খ, পৃ: ৪৬৪; www.masrawy.com প্রাগুক্ত।

৫৭. আত তাফসীল ওয়াল মুফাসসিরূন; ২য় খ, পৃ: ৪৬৪। www.masrawy.com প্রাগুক্ত।

মুহাম্মদ বিন আলী আশ্‌ শাওকানী ও তাঁর তফসির ফাতহুল কাদীরঃ একটি পর্যালোচনা

প্রফেসর আ.ন.ম. রফীকুর রহমান

ভূমিকাঃ আল কুরআন বিশ্বমানবতার মুক্তি ও কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একমাত্র নির্ভুল আসমানী কিতাব, যা দীর্ঘ তেইশ বছরে নাযিল হয়েছে বিশ্বশান্তির অগ্রদূত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। কুরআন নাযিলের লক্ষ্য হলো, কুরআন পড়ে ও বুঝে বাস্তব জীবনে তার সুষ্ঠ প্রয়োগ করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যই প্রয়োজন পড়েছে কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের। তাফসির গ্রন্থ কুরআনেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। কুরআনকে বুঝার জন্য, কুরআনের ভাবকে বোধগম্য করার জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের তাফসির গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুরআনের একটি আয়াত অপর আয়াতের তাফসির করে দিয়েছে।

আবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের তাফসির পাওয়া যায়। এমনিভাবে সাহাবায়ে কিরামও কুরআনের তাফসির করেছেন। এ সমস্ত তাফসিরকে তাফসির বিররিওয়ায়াহ বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে তাবেয়ী, তাবে'-তাবেয়ী এবং পরবর্তী ইসলামি জ্ঞান বিশারদগণের নিকট থেকে কুরআনের তাফসির পাওয়া যায়, এগুলোকে বলা হয় তাফসির বিদদিরায়াহ। তাফসির শাস্ত্রে যাঁদের অবদান উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় ভাস্বর, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মুহাম্মাদ বিন আলী আশ্‌শাওকানী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। আল্লামা শাওকানী, তাঁর রচিত তাফসির গ্রন্থ ফাতহুল কাদির-এ দুই ধরনের তাফসিরকেই একত্র করেছেন। এদিক থেকে তাঁর তাফসির গ্রন্থটি অনন্যসাধারণ।

আল্লামা শাওকানীর জীবনকথা

বংশ পরিচয়ঃ নাম মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আল হুসাইন আশশাওকানী অত:পর সানআনী। কুনিয়াহ আবু আলী, উপাধি বদরুদ্দীন।

জন্মঃ ১১৭৩ হিজরি যুলকা'দা মাসের ২৮ তারিখ সোমবার দুপুর বেলা নিজ শহর ইয়েমেনের অন্তর্গত হিজর-এর শওকান নামক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। কারো কারো মতে শওকান সান'আর নিকটবর্তী সাহমিয়াহ অঞ্চলের একটি গ্রামের নাম। সান'আ থেকে তার দূরত্ব ১ দিনের পথ। কেউ কেউ বলেছেন, শওকান বাহরাইনের একটি এলাকার নাম। তবে প্রথম মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। শওকান-এর সাথে সম্পর্কিত করেই তাঁকে শওকানী বলা হয়। এ এলাকাটি পূর্ব থেকেই নেক ও যোগ্য আলেমগণের আবাসভূমি ছিলো। তাঁর পিতাও ছিলেন সেকালের একজন খ্যাতিমান স্বনামধন্য আলেম।

শৈশবকাল ও শিক্ষা জীবনঃ তাঁর শৈশবকাল কাটে সান'আতে মাতা-পিতার আদর যত্নে। পিতার নিকটই তাঁর লেখা পড়ার হাতে খড়ি। তিনি জ্ঞানের পিপাসা নিবারণের জন্য বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ করেন। তাঁর পিতাসহ সেকালের বড়ো বড়ো আলিমগণের নিকট থেকে তাফসির, হাদিস, ফিকহ, উসুলে ফিকহ, আরবি সাহিত্য, আরবি ব্যাকরণ, বালাগাত, ইলমে 'আরূদ, ফারায়েয, ইলমে কিরায়াতসহ বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কুরআন-সুন্নার ব্যাপক গবেষণা করেন।

খ্যাতনামা আলেমগনের সাহচার্য লাভের মাধ্যমে তিনি সমকালীন শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের কাতারে নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম হন।

প্রসিদ্ধ উসতাযবৃন্দের নাম: সেকালের বরেণ্য আলেমগণ ছিলেন তাঁর উস্তায। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ উসতাযবৃন্দের নাম এবং তাদের নিকট পঠিত বিষয় ও গ্রন্থের নাম:

০১. স্বীয় পিতা, আলী বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আশশাওকানী (মৃত্যু ১২১১ হি.) ছোটবেলা থেকে পিতার তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া করেন। প্রথমে সহীহ্-শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত শিখেন, তারপর হিফজ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন। বিভিন্ন পুস্তকের কিছু কিছু মতন মুখস্ত করেন। পিতার তত্ত্বাবধানে তাঁর ভবিষ্যত জীবনের ভিত গড়ে উঠে।

০২. আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ (১১৫৮-১২২৭ হি.) তাঁর সাহচর্যে আল্লামা শাওকানী ১৩ বছর ছিলেন। তাঁর নিকট অধ্যয়ন করেন اَلْاَزْهَار গ্রন্থ এবং তার ব্যাখ্যা ও হাশিয়া। উক্ত গ্রন্থ দু'বার পড়ার পর তৃতীয়বারে গবেষণা পদ্ধতিতে খুব মনোনিবেশ সহকারে তা অধ্যয়ন করেন। তাঁর নিকট আরো পড়েন 'উছায়ফিরী রচিত اَلْفَرَائِض এবং নাযিরী কর্তৃক তার ব্যাখ্যা ও হাশিয়া। আরো পড়েন بيان ابن مظفر এবং তার হাশিয়া।

০৩. আহমদ বিন আমের আল হাদানী (১১২৭-১১৯৭) তাঁর নিকট অধ্যয়ন করেন اَلْاَزْهَارএবং তার ব্যাখ্যা اَلْفَرَائِض অধ্যয়ন করেন দু'বার।

০৪. আহমদ বিন মুহাম্মদ আল হারাযী (১১৫৮-১২২৭) আল্লামা শাওকানী তাঁর সাহচর্যে ১৩ বছর কাটান। তাঁর নিকট পড়েন اَلْفِقْه ও اَلْفَرَائِض।

০৫. ইসমাঈল বিন আল হাসান আল মাহদী (১১২০-১২০৬) তাঁর নিকট অধ্যয়ন করেন হারীরী রচিত مُحَلَّةُ الْاَعْرَاب ও তার ব্যাখ্যা شرح بحرق। আরো অধ্যয়ন করেন علم الصرف , علَم المعانى , علم البيان এবং الاموال।

০৬. হাসান বিন ইসমাঈল আল মাগরিবী (১১৪০-১২০৮) তাঁর নিকট পড়েন কুতুবী রচিত الرسالة الشمسية তার হাশিয়া المطول তার হাশিয়া شرح الغاية তার হাশিয়া حاشة السعد , العضد। তাঁর নিকট শ্রবণ করেন صحيح المسلم , شرح بلوغ المرام এর কিছু অংশ এবং ইমাম নববী রচিত সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা। তাঁর নিকট আরো শুনেন সুনান আবু দাউদ, খাত্তাবীর المعالم এবং شرح ابن رسلان এর কিছু অংশ।

০৭. সিদ্দীক আলী আল মুযজাজী (১১৫০-১২০৯) : তাঁর নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করার অনুমতি পান।

০৮. আব্দুর রহমান বিন হাসান আল্ আকওয়া (১১৩৫-১২০৭) : তাঁর নিকট পাঠ করেন আমীর হুসাইন রচিত الشفاء।

০৯. আব্দুর রহমান বিন কাসেম আল মাদানী (১১২১-১২১১) : তাঁর নিকট পড়েন شرح الأزهار।

১০. আব্দুল কাদের বিন আহমদ শারাফুদ্দীন আল কাওকাবানী (১১৩৫-১২০৭) : তাঁর নিকট অধ্যয়ন করেন علم التفسير, علم الحديث, المصطلح।

১১. আব্দুল্লাহ বিনইসমাঈল আন নুহামী (১১৫০-১২২৮) : তাঁর নিকট পড়েন النحو , الصرف , المنطق , الحديث , الصول।

১২. আব্দুল্লাহ বিন আল হাসান বিন আলী (১১৬৫-১২১০) : তাঁর নিকট পড়েন شرح الجامى।

১৩. আলী বিন ইবরাহীম বিন আলী (علي بن ابراهيم بن علي) (১১৪০-১২০৭) : তাঁর নিকট শুনেন صحيح البخارى ।

১৪. আলী বিন হাদী (১১৬৪-১২৩৬) : তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করেন।

১৫. আল কাসেম বিন ইয়াহ্ইয়া আল খাওলানী (১১৬২-১২০৯) : তাঁর নিকট অধ্যয়ন করেন الكافية ও তার ব্যাখ্যা, شرح الرضى على الكافية , شرح الخبيصى على الكافية , الشافية । সাইয়েদ মুফতি রচিত তার ব্যাখ্যা السعد এবং তার আরেকটি ব্যাখ্যা شرح الجامى ।

১৬. হাদী বিন হাসান আলকারিনী (১১৬৪-১২৪৭) : তাঁর নিকট থেকে গ্রহণ করেন شرح المنتقى ইত্যাদি।

১৭. ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ আলহাওছী (১১৬০-১২৪৭) : তাঁর নিকট পড়েন المساحة , الفرائض , الحساب , الضرب ।

১৮. ইউসুফ বিন মুহাম্মদ বিন 'আলা (১১৪০-১২১৩) : তাঁর পক্ষ থেকে আল্লামা শাওকানীকে সকল কিছু রেওয়ায়াত করার অনুমতি দেয়া হয়।

শিক্ষাদানঃ বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জনের পর তিনি জ্ঞান বিতরণে মনোনিবেশ করেন। জ্ঞান আহরণের জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জ্ঞানপিপাসুরা পঙ্গপালের মতো ছুটে আসতে থাকে তাঁর দরবারে। ভারত ও ইয়েমেন এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি অকাতরে বিলাতে থাকেন আল্লাহ্ প্রদত্ত ইলম। জ্বালাতে থাকেন জ্ঞানের মশাল, যা দূর করে দিতে সক্ষম হলো অনেক ক্ষেত্রেই জাহেলিয়াতের অন্ধ বিশ্বাস। ইজতিহাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হলো তাঁর ছাত্রগণ। তাঁর যশখ্যাতি সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি নিজেকে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজে ব্যস্ত রাখেন। মৃত্যুকালে রেখে যান তাঁর অসংখ্য ছাত্র, যারা শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ধারাকে অব্যাহত রাখেন।

তাঁর ছাত্রবৃন্দঃ তাঁর ছাত্র অনেক যারা তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান নিয়েছেন। ড. মুহাম্মদ বিন হাসান আল গিমারী বলেন, তাঁর ছাত্র সংখ্যা ৮৩ জন। ড. আব্দুল গণী কাসেম গালেব বলেন, তাঁর ছাত্র সংখ্যা ৯২ জন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগণ অধিক প্রসিদ্ধঃ

০১. তাঁরই পুত্র আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী আশ শাওকানী (১২২৯-১২৮৯)

০২. মুহাম্মদ বিন আহমদ আসসৃদী (১১৭৮-১২৩৬)

০৩. আহমদ বিন আহমদ আসসান'আনী (১১৮৬-১২২৩)

০৪. আহমদ বিন আলী বিন মুহসিন (১১৫০-১২২৩)

০৫. মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন হাশিম (১১৭৮-১২৫১)

০৬. আব্দুর রহমান বিন আহমদ (১১৮০-১২২৭)

০৭. আহমদ বিন আব্দুল্লাহ (মৃত্যু-১২২২)

০৮. আলী বিন আহমদ বিন হাজের আসসান'আনী (১১৮০-১২৩৫)

এদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিত ছিলেন।

রচিত গ্রন্থাবলী : বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর ১১৪ খানা চমৎকার পুস্তক, পুস্তিকা রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

০১. ফাতহুল কাদীর আল জামে' বায়না ফান্নাই আররিওয়াতি ওয়াদ্ দিরায়াতি মিনাত তাফসির।

০২. নায়লুল আওতার শরহি মুনতাকাল আখবার।

০৩. আল্ ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ ফিল আহাদিসিল মাওদুয়াহ।

০৪. আল্ ফাতহুর রাব্বানী মিন ফাতাওয়া আল ইমাম আশ্-শাওকানী।

০৫. ইরশাদুল ফুহূল ইলা তাহ্কীকিল হাক্কি মিন ইলমিল উসূল।

০৬. আল্ বাদ্‌রুত তালি বিমাহাসিনি মিন বা'দিল কারনিস্ সাবি'।

০৭. ওয়াইলুল গামাম 'আলা শিফাইল উয়াম।

০৮. তুহফাতুয যাকেরীন শরহে 'উমদাতুল হিসনিল হাসীন।

০৯. আদ্ দুরারুল বাহিয়্যাহ্।

১০. আস্‌সায়লুল জাররার আল মুতাদাফফিক 'আলা হাদায়িকিল আয্হার।

১১. ইরশাদুস সিফাত ইলা ইত্তিফাকিশ শারাই' আলাত তাওহীদ ওয়াল মা'য়াদ ওয়াননুবুওয়াহ।

১২. আদাবুত তালাব ওয়া মুনতাহাল আরাব, আরো অনেক গ্রন্থ, যা মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথ অনুসরণে সহায়তা করে।

এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর আরো অনেক পুস্তিকা। যেমন :

০১. শরহুস সুদূর ফী তাহরীমে রফইল কুবুর।

০২. তীবুন নাশর ফী মাসায়িলিল উশর।

০৩. রিসালাহ ফী হাদ্দিস সাফার আল্লাযি ইয়াজিবু মা'আহুল কাসর।

আকিদা-বিশ্বাস : প্রথম দিকে তিনি শিঈ ইমাম যায়দের মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি অনেক জ্ঞান অর্জন করেন, কিতাব রচনা করেন এ মাযহাবের । এ মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় আলেম হিসেবে তাঁকে গণ্য করা হতো। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি ব্যাপক হাদিস অধ্যয়ন করেন এবং সে কালের হাদিসবেত্তা হিসেবে গণ্য হন। মুজতাহিদ হিসেবে আবির্ভূত হন। তখন তাঁর বয়স ছিলো তিরিশ এর কাছাকাছি। তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে, এ উম্মতের কল্যাণ একমাত্র কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণের মাঝেই নিহিত। তিনি মনে করতেন, আল্লাহ যাকে ইজতিহাদ করার যোগ্যতা দান করেছেন, তার জন্যে ইজতিহাদ না করা হবে কুফর। তিনি 'আস্‌সায়লুল জাররার আল মুতদাক্কিক আলা হাদাইকিল আযহার' নামে একটি কিতাব রচনা করেন। এ কিতাবে তিনি অন্ধ তাকলীদকে বর্জন করে দলিল ভিত্তিক মত দেয়ার প্রতি জোর দেন। এতে অন্ধ তাকলীদের অনুসারীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তারপর তিনি "আলকাওলুল মুফীদ ফী আদিল্লাতিল ইজতিহাদ ওয়াত তাকলীদ" নামে আর এটি কিতাব রচনা করেন।

এ কিতাব লেখার পর সান'আতে অন্ধ মুকাল্লিদ এবং দলীলের অনুসারীদের মাঝে সংঘাত দেখা দেয়। শওকানী নির্দিষ্ট কোনো মায্হাব বা নির্দিষ্ট কোনো মতকে অনুসরণ না করে স্বীয় ইজতিহাদের ভিত্তিতে রায় দিতেন। তাঁর রচিত হাদিসগ্রন্থ 'নায়লুল আওতার' পাঠে তা সহজেই বুঝা যায়। প্রথমে তিনি সাহাবা, তাবেয়ীন এবং বিভিন্ন দেশের আলিমগণের মতামত তুলে ধরেছেন, প্রত্যেকের দলিল বর্ণনা করেছেন। সবশেষে তাঁর পছন্দীয় রায় এবং তার স্বপক্ষে দলিল উপস্থাপন করে মাসয়ালার সমাপ্তি টেনেছেন।

তিনি খুবই উঁচু মানের আলেম, মুফতী ছিলেন। ইজতিহাদের মাধ্যমে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার মতো যোগ্যতা তাঁর ছিলো। তিনি শির্ক বিদ'আতের কট্টর বিরোধী ছিলেন। জ্ঞানচর্চাই ছিলো তাঁর জীবনের ব্রত।

১২০৯ হিজরিতে ইয়ামনের প্রধান কাযী ইয়াহইয়া বিন সালেহ আশশাজারী আসসাহুলীর মৃত্যুর পর ইমাম শওকানী বহু চিন্তা ভাবনার পর কুরআন-সুন্নাহ প্রচার ও প্রসারের মাধ্যম হিসেবে দীনের স্বার্থে এ পদ গ্রহণ করেন।

তাঁর আকিদা ছিলো সালাফের আকিদা। আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে কোনো তাবীল, তাহরীফ ব্যতীত আল্লাহর শান অনুযায়ী যেমন হওয়া দরকার তেমনটাই তিনি বিশ্বাস করতেন। দলিল হিসেবে তিনি এ আয়াতকে উল্লেখ করেছেন :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহর ছিফাতকে স্বীকার করা হয়েছে এবং সাদৃশ্যকে অস্বীকার করা হয়েছে। তিনি তাঁর এ মতকে বিভিন্ন পুস্তকে বিশেষ করে 'আততুহাফ ফী মাযাহিবিস্ সালাফ' এবং 'কাশফুশ শুবুহাত আনিল মুশতাবিহাত' গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি কারো যুক্তিহীন অনুকরণ করে নয়, বরং নিজের গবেষণা ও ইজতিহাদের ভিত্তিতেই এ আকিদা পোষণ করতেন। কোনো ব্যক্তি নয়, কুরআন ও সুন্নার অনুসরণই মুসলিম উম্মাহ্র কর্তব্য। তাঁর লিখনির মাধ্যমে তিনি তা স্মরণীয় করে রেখে গেছেন।

চরিত্র : তাঁর চরিত্র নিয়ে তাঁরই শিষ্য অনেকেই পুস্তক রচনা করেছেন। তন্মধ্যে কাযী আল্লামা মুহাম্মদ বিন হাসান আশ্শাজনী আযযিমারী রচিত 'আততিকসার ফী জায়্যেদে যমানে 'আল্লামাতিল আকালীমে ওয়াল আমসার" অধিক প্রসিদ্ধ। তিনি 'ইলম অন্বেষণ ও প্রচারের কাজ ব্যতীত লোকদের সাথে বেশি মিশতেন না। বিশেষ করে সরকার এবং সরকারের সাথে যারা সম্পর্ক রাখে তাদের থেকে দূরে থাকতেন।

বিশ বছর বয়স থেকেই তিনি ফাতওয়া প্রদান শুরু করেন। এক্ষেত্রে তিনি এতো খ্যাতি লাভ করেন যে, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকেরা তাঁর নিকট ফাতওয়ার জন্যে আসতো। তিনি এর বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করতেন না। খুবই সাধারণ জীবন যাপন করতেন। স্বল্প তুষ্ট থাকতেন।

পিতার মৃত্যুর পর কাজীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ছাত্র শিক্ষকের পেছনে অনেক অর্থ ব্যয় করতেন। তাঁর হাতে সাদাকা ও দান-খয়রাতের প্রচুর অর্থ আসতো। তিনি সমুদয় অর্থ বণ্টন করে দিতেন। দুনিয়ার মোহ তাঁর মাঝে পরিলক্ষিত হয়নি। তাঁর জীবনের লক্ষ্যই ছিলো আল্লাহর দীনের প্রচার-প্রসার এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা।

তাঁর ছাত্র ইসমাঈল বিন আলী বিন হাসান বলেন, দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রকাশ্যভাবে বা ইশারা-ইংগিতে তিনি কখনও কারো নিকট মাথা নত করেননি। তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রখর মেধাবী মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁর শিক্ষক ও ছাত্রদের সাথে তাঁর ব্যবহার ছিলো অমায়িক। কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার কোনো কঠোরতা ছিলো না। তাঁর কঠোরতা ছিলো বিভিন্ন বাতিল মতের বিরুদ্ধে। তিনি উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

মৃত্যু : ১২৫০ হিজরি, জুমাদাল আখিরা ২৭ তারিখ বুধবার রাতে তিনি সানআতে এবং ভিন্ন মতে **১২২৫** হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

তাফসির ফাতহুল কাদীর : পর্যালোচনা

আল্লামা শাওকানীর কর্মময় জীবনের অবিস্মরণীয় কীর্তি হলো 'তাফসির ফাতহুল কাদীর'। এর মূল নাম হলো ফাতহুল কাদীর আল্‌জাম' বাইনা ফান্নায়ির রিওয়ায়াত ওয়াদদিরায়াত মিন 'ইলমিত তাফসির (فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير)। এ কিতাবখানি মূলত উসূলে তাফসিরের অন্তর্ভুক্ত এবং উসূলে তাফসিরের একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র। এ তাফসিরখানিতে আল্লামা শাওকানী তাফসির বিদদিরায়া (تفسير بالدراية) এবং তাফসির বিররিওয়ায়াহ (تفسير بالرواية)-কে একত্র করেছেন। তাই এটি তাঁর একটি অনন্য তাফসির গ্রন্থ। প্রথমে তিনি সুন্দরভাবে দিরায়াহ (دراية) ভিত্তিক তাফসির করেছেন। দিরায়াহ শেষে খুবই সুনিপুণভাবে রিওয়ায়াহ (رواية) ভিত্তিক তাফসির করেছেন। এটি রচনা শুরু করেন ১২২৩ হিজরীর রবিউস সানী মাসে এবং সমাপ্ত করেন ১২২৯ হিজরী রজব মাসে। এটি পাঁচ খণ্ডে ছাপা হয় মিসরে।

তাফসির লেখার কারণ : প্রতিটি যুগেই যুগের চাহিদা মেটাবার জন্যে তাফসির বিশারদগণ এগিয়ে এসেছেন এবং কুরআনের বিভিন্ন তাফসির রচনা করেছেন। মুফাস্‌সিরগণের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দৃষ্টিভংগিতে কুরআনের তাফসির করেন। তাই কুরআনের বিভিন্ন তাফসির বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আল্লামা শাওকানী তাঁর দৃষ্টিভংগিতে আরেকখানি তাফসির লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তা এজন্য যে, এতোদিন পর্যন্ত যা তাফসির লেখা হয়েছে, তা ছিলো দুই ভাগে বিভক্ত। ক. তাফসির বির রিওয়ায়াহ (تفسير بالرواية) শুধুমাত্র রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসির লেখা হয়েছে। দিরায়ায়াহ্ বা আকল, বুদ্ধিভিত্তিক কোনো তাফসিরের ছোঁয়া তাতে লাগেনি। খ. তাফসির বিদদিরায়া (تفسير بالدراية) শুধুমাত্র বুদ্ধিভিত্তিক তাফসির, এতে رواية স্থান পায়নি। কোথাও ছিটেফোটা রিওয়ায়াহ্ আসলেও বিশুদ্ধতার মোটেই খেয়াল করা হয়নি। আল্লামা শাওকানী দু'টির সমন্বয়ে একখানি তাফসির লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন, যাতে রিওয়ায়াহ্ (رواية) এবং দিরায়ায়াহ্ (دراية) দু'টিই সমানভাবে গুরুত্ব পায়। কোনোটাকেই খাটো করে দেখা হবে না। তাফসির ফাতহুল কাদীর আল্লামা শাওকানীর সেই চিন্তারই ফসল। এতে তিনি উভয় তাফসিরই সমান গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছেন।

বৈশিষ্ট্য: তাফসির করার ক্ষেত্রে তিনি আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন, ফিক্‌হী মাসয়ালাগুলোতে ইমামগণের মতামত তুলে ধরেছেন। তাদের প্রত্যেকের দলিল উল্লেখ করে কোনো একটি মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বিভিন্ন আয়াতের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন এবং আরবি ভাষা ও ব্যাকরণের প্রতি লক্ষ্য রেখে অর্থের পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। যে সমস্ত আয়াতে একাধিক কিরায়াত রয়েছে, তা উল্লেখ করে কিরায়াতের পার্থক্য অনুযায়ী অর্থের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। যেমন সূরা আনফালের ১১ নম্বর আয়াত :

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ

يغشيكم বাবে ইফ'আল -এর ওযনে, فاعل (কর্তা) হলেন আল্লাহ্ نعاس শব্দটি مفعول। এ কিরায়াত হলো নাফে' এবং মদিনাবাসীর।

আর একটি কিরায়াত হলো يغشيكم النعاس এ কিরাতে نعاس হলো فاعل বা কর্তা। এ কিরায়াত হলো ইবনে কাসীর ও আবু আমর-এর। আবার অন্যরা পড়েছেন يغشيكم النعاس বাবে تفعيل -এর ওজনে।

তাঁর তাফসিরে علم البلاغة -এর আলোচনা বাদ পড়েনি। যেমন সূরা বাকারার ১১ নম্বর আয়াত انما نحن مصلحون এখানে انما শব্দটি قصر অর্থাৎ সীমাবদ্ধকরণের শব্দ, এটা علم المعاني-এর অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে উক্ত সূরার ১৯ নম্বর আয়াত : يجعلون اصابعهم في اذانهم এখানে أصابع শব্দটি مجاز হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা علم البديع-এর অন্তর্ভুক্ত।

আল্লামা শাওকানী তাঁর তাফসিরে صرف (ক্রিয়াপদের রূপান্তর) নিয়েও আলোচনা করেছেন। যেমন সূরা বাকারার ১৪ নম্বর আয়াতে واذا لقوا الذين امنوا এখানে لقوا শব্দটি মূলত لقيوا ছিলো। ياء এর পেশটি কাফে দেয়ার পর ياء ইয়া এবং واو (ওয়াও) অক্ষর দু'টি সাকিন হওয়ায় ياء-টিকে বাদ দেয়ায় لقوا হয়ে গেলো।

এভাবে نحو ، صرف ، بلاغة কোনোটিই আলোচনা করতে তিনি ছাড়েননি। শব্দের শাব্দিক অর্থ ও পারিভাষিক অর্থ উল্লেখ করে এখানে কোন্ অর্থ গ্রহণ করতে হবে তাও উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরা বাকারার তিন নম্বর আয়াত ويقيمون الصلاة এতে اقامة এবং صلاة -এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ উল্লেখ করে এখানে কোন্ অর্থ নেয়া হবে উল্লেখ করেছেন। কোনো শব্দ প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকলে তাও তিনি আলোচনা করেছেন। যেমন : উক্ত সূরার ১০ নম্বর আয়াত في قلوبهم مرض

এখানে مرض-এর শাব্দিক অর্থ উল্লেখ করার পর লিখেছেন যে, এটি শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে পুরো তাফসিরটি তিনি একই ধারাবাহিকতায় রচনা করেছেন। বিভিন্ন শব্দের ব্যাকরণগত আলোচনা করতে গিয়ে মুবাররাদ, ফাররা, আবু উবায়দা প্রমুখ আরবি ব্যাকরণবিদের মতামত আলোচনা করেছেন। কোনো শব্দের অর্থ উল্লেখ করে আরবি কবিতার সাহায্যে তার যথার্থতা প্রমাণ করেছেন। যেমন : خداع শব্দের মূল অর্থ فساد এর সমর্থনে ইবনুল আরাবি ছা'লাব-এর কবিতা দিয়ে প্রমাণ করেছেন :

أبيض اللون رقيق طعمه ، ليب الريق إذا الريق خدع

এভাবে তাঁর তাফসির গ্রন্থে অসংখ্য কবিতার সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর গ্রন্থটিকে গতানুগতিক একটি তাফসির গ্রন্থ বললে ভুল হবে। যেভাবে نحو ، صرف ، بلاغة ، لغة ، اصطلاح কবিতা ইত্যাদির ব্যাপক আলোচনা এসেছে এমন আর একখানি তাফসির গ্রন্থ খুঁজে বের করা সহজসাধ্য নয়। দিরায়াহ তাফসিরের ক্ষেত্রে নিজেকে একজন মুজতাহিদ ভেবেই স্বাধীনভাবে তাফসির করেছেন।

তাফসির বিদ্‌দিরায়াহ শেষ করে তিনি তাফসির বির্‌রিওয়ায়াহ্ শুরু করেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রথমে মুহাম্মদ সা., পরে সাহাবি, তাবেয়ী, তাবে'উ-তাবেয়ী ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণের মতামত উল্লেখ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি পুরো সনদ উল্লেখ না করে শুধু হাদিস গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে সাহাবি থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমন ১ম খণ্ডের ৪৫ পৃষ্ঠায় :

أخرج أحمد في المسند عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله شياطين والجن فقلت : يا رسول الله وللانس شياطين؟ قال نعم •

"অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাদিসের মান উল্লেখ করেননি এবং সনদের রাবীগণের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি। যেমন উল্লেখিত হাদিসটি সহীহ্, হাসান, জয়ীফ কিছুই উল্লেখ করেননি।

তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সনদ সম্পর্কে কথা বলেছেন। যেমন ১ম খণ্ডের ৪৫ পৃষ্ঠার প্রথমদিকে উল্লেখ করেছেন :

قد اخرج الواحدي والثعلبي بسند واه لأن فيه محمد بن مروان وهو متروك •

তাঁর তাফসির গ্রন্থে অনেক জয়ীফ ও মাওদূ হাদিস স্থান পেয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি। যেমন সূরা মায়িদার ৫৫ নম্বর আয়াত :

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ •

এ আয়াতের তাফসিরে তিনি এমন একটি হাদিস এনেছেন, যা রসূলুল্লাহ সা. এর ইনতেকালের পর আলী রা. এর খিলাফতের ব্যাপারে শিয়াদের বানোয়াট একটি হাদিস। তা হলো : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, আলী রা. রুকূ অবস্থায় একটি আংটি দান করেছেন। রসূলুল্লাহ সা. সাওয়ালকারীকে প্রশ্ন করলেন, তোমাকে এ আংটিটি কে দিয়েছে? সে উত্তর দিলো, ঐ রুকূকারী ব্যক্তি, তখন আল্লাহ নাযিল করলেন : إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (ফাতহুল কাদীর ২/৪৮)

আরেকটি মওদূ বা বানোয়াট রিওয়ায়াত.. يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ (সূরা ২ মায়িদা : আয়াত ৬৭)।

আবু সায়িদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত। উক্ত আয়াতটি আলী বিন আবু তালিবের খিলাফতের ব্যাপারে গাদীরে খুম-এর দিন নাযিল হয়েছে। (সূরা ২ : আয়াত ৫০)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, আমরা রসূল সা.-এর যুগে পড়তাম-

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৫৭)

এ ধরনের বানোয়াট রেওয়ায়াত বর্ণনা করার পরও আল্লামা শাওকানী রেওয়ায়াত সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি।

তাকলীদ ও মুকাল্লিদের নিন্দা: শাওকানী তাঁর তাফসির গ্রন্থে তাকলীদ ও মুকাল্লিদের কঠোর নিন্দা করেছেন। এমনকি যে সমস্ত আয়াত মুশরিকদের নিন্দায় তাদের পিতৃপুরুষদের অন্ধ অনুসরণের কারণে আল্লাহ নাযিল করেছেন, সে সমস্ত আয়াত বিভিন্ন মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসারীদের ব্যাপারে প্রয়োগ করে তাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতে রসূলিল্লাহ বর্জনকারীদের মাঝে তাদেরকে শামিল করেছেন। যেমন সূরা আ'রাফের ২৮ নম্বর আয়াত :

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ •

"যখন তারা কোনো অশ্লীল কার্যকলাপ করে তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এটা করতে দেখেছি এবং আল্লাহ্ও আমাদেরকে তা করার নির্দেশ দিয়েছেন। বলো,

আল্লাহ অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে এমন কথা বলছো, যা তোমরা জানো না।"

সূরা বাকারার ১৭০ নম্বর আয়াত :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

"যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তা অনুসরণ করো তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি আমরা তা অনুসরণ করবো। এমনকি তাদের পিতৃপুরুষরা যদিও কিছু বুঝতো না, সঠিক পথে পরিচালিত ছিলো না, তবুও (তাদের পথে চলবে?)"

এমনিভাবে সূরা যুখরুফের ২৩ নম্বর আয়াত, সূরা মায়িদার ১০৪ নম্বর আয়াত, সূরা লোকমানের ২১ নম্বর আয়াত, সূরা তাওবার ৩১ নম্বর আয়াত ইত্যাদি আয়াতগুলো আল্লাহ নাযিল করেছেন কাফির, মুশরিক ও ইহুদি গোষ্ঠীর নিন্দায়, যারা হেদায়াতের পথ বাদ দিয়ে পিতৃপুরুষদের দোহাই দিয়ে তাদের বাতিল পথকে অন্ধভাবে অনুসরণ করছে। অথচ আল্লামা শাওকানী এ আয়াতগুলোকে মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসারীদের ব্যাপারেও প্রয়োগ করে তাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং তাদেরকে কাফির মুশরিকদের কাতারে শামিল করেছেন।

আমি (প্রবন্ধকার) মনে করি, আল্লামা শাওকানী এখানে ইনসাফ করেননি। কারণ প্রত্যেক মুজতাহিদেরই লক্ষ্য সত্যকে উদঘাটন করা। তাই তারা কুরআন-সুন্নাহ নিয়ে সাধ্যমতো ব্যাপক গবেষণা করেছেন। ব্যক্তিস্বার্থ তাদের মোটেই উদ্দেশ্য ছিলো না। তাইতো মুজতাহিদ তাঁর সিদ্ধান্তে সঠিক হলে দু'টি সওয়াব, আর সিদ্ধান্তে ভুল হলেও নিয়তের ইখলাছের কারণে একটি সওয়াব পাবেন। আবার প্রত্যেকেই বলে গেছেন, হাদিস সহীহ পাওয়া গেলে সেটিই আমার মত। তাই তাদেরকে অভিযুক্ত করা সঠিক নয়।

আবার আম জনতার পক্ষে হাদিস অধ্যয়ন করা, হাদিস যাচাই-বাছাই করে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাও সম্ভব নয়, কিন্তু না জানার অজুহাত দিয়ে আমল থেকে বিরত থাকারও সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেছেন :

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"তোমরা যদি না জানো, তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞেস করো।" (সূরা আন নাহল : আয়াত ৪৩; সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত ৭)

অতএব কোনো একজন মুজতাহিদের পথ ধরে চলতে হবে যতোক্ষণ না নিজে কুরআন সুন্নাহ অনুসন্ধান করে চলার পথ নির্ধারণের বিশেষ যোগ্যতা লাভ না করবে।

শহীদগণের হায়াত সম্পর্কে তাঁর মত: শহীদগণের হায়াত সম্পর্কে আল্লাহ্ সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ নম্বর আয়াতে বলেন : وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তোমরা তাদেরকে মৃত বলে কখনো ধারণা করোনা, বরং তারা জীবিত, তাদের রবের নিকট থেকে তাদেরকে রিযিক দেয়া হয়।"

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে হায়াত বলতে বাস্তব হায়াতকেই বুঝানো হয়েছে, যদিও কিছু কিছু মুফাসসির হায়াত বলতে রূপক অর্থ নিয়েছেন। ইমাম শাওকানী এখানে বাস্তব অর্থেই হায়াতকে বুঝিয়েছেন।

তাওয়াসসুল বা উসীলা (মাধ্যম) অবলম্বনে তাঁর মতঃ আল্লাহ পাক রসূলুল্লাহ সা.-কে বলেছেন: قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ:

"বলুন, আমি আমার নিজের জন্যে না ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখিনা উপকার করার। কিন্তু আল্লাহ যা চান (তা-ই হবে)"। (সূরা ইউনুস : আয়াত ৪৯)।

এখানে রসূলুল্লাহ সা.-কে বলা হচ্ছে, তিনি নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখেন না, তাহলে অপরের কল্যাণ করা বা না করার তো প্রশ্নই উঠে না। আর যেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে ভালোমন্দ করার ক্ষমতা রাখেন না, সেখানে অন্য কেউ ভালোমন্দ করার ক্ষমতা রাখার প্রশ্নই আসে না, সে যে কেউ হোক। অতএব যে বিপদ আল্লাহ ছাড়া কেউ দূর করার ক্ষমতা রাখে না, তা দূর করার জন্যে অন্য কারো সাহায্য প্রার্থনা করা, আর যা কিছু আল্লাহ ছাড়া কেউ দিতে পারে না, তা অন্যের নিকট চাওয়া শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা শাওকানী উক্ত আয়াতের তাফসিরে এ বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

মুতাশাবিহ-এর ব্যাপারে আল্লামা শাওকানীর অবস্থান

মুতাশাবিহ আয়াতকে কোনো ব্যাখ্যা ব্যতীতই তার বাহ্যিক অবস্থার উপর তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। আর এটাই হলো সালাফে সালেহীনের মত। যেমন-

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২৫৫)

কুরসি শব্দটির ব্যাখ্যা বিভিন্নজন বিভিন্নরূপ করেছেন। আবার মু'তাযিলার একটি দল কুরসির অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছে। কিন্তু সঠিক রায় হলো কুরসি তার বাহ্যিক অর্থেই ব্যবহৃত, তবে সেটি কেমন তা আমাদের জানা নেই।

এমনিভাবে সূরা আল আ'রাফের ৫৪ নম্বর আয়াত :

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

আল্লামা শাওকানী বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ১৪টি মত রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে সঠিক ও অধিক উত্তম মত হলো সালাফে সালেহীনের মত। তা হলো, আল্লাহ তাঁর আরশে আসীন আছেন, কিভাবে আছেন তা আমাদের জানা নেই, তিনি যেভাবে থাকার সেভাবেই আছেন। আল্লামা শাওকানী সকল মুতাশাবিহ্-এর ক্ষেত্রে একই নীতি অবলম্বন করেছেন। এটাই হলো একমাত্র সঠিক পন্থা। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা।

মু'তাযিলাদের বিভিন্ন রায়ের ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান বা নীতিঃ যায়দিয়াহ দলটি অনেক ক্ষেত্রেই মু'তাযিলা আকিদা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে এবং আকিদাগত অনেক রায়ই মু'তাযিলা থেকে গ্রহণ করেছে। যেমন, মু'তাযিলাদের বিশ্বাসঃ দুনিয়া ও আখেরাতে কোথাও আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়, সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দেয়া, অসৎকর্মকারীদের শাস্তি দেয়া আল্লাহর অবধারিত কর্তব্য। এভাবে আকিদাগত অনেক ক্ষেত্রেই মু'তাযিলাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস রয়েছে, যা সালাফে সালেহীনের আকিদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

আল্লামা শাওকানী এ সমস্ত ক্ষেত্রে সালাফে সালেহীনের আকিদাই বেছে নিয়েছেন যা সম্পূর্ণই কুরআন-সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যশীল। আল্লামা শাওকানী তাঁর তাফসির গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণভাবে সহীহ আকিদার উপর ভিত্তি করেই রচনা করেছেন।

ফাতহুল কাদীরের অবস্থান: তাফসিরের জগতে ফাতহুল কাদীরের একটি উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। এটি একটি উন্নত মানের তাফসির। এ গ্রন্থে কুরআনের তাফসির সাবলীল ভাষায় বর্ণিত হওয়ায় পাঠক সমাজের নিকট সমাদৃত। এটি একটি প্রামাণ্য তাফসির গ্রন্থ। ভারতবর্ষে এর পরিচিতি কম হলেও আরব বিশ্বে এটি একটি নির্ভরযোগ্য তাফসির হিসেবে পরিচিত ও সমাদৃত। ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় মদীনাসহ আরব জগতের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ তাফসিরখানি সিলেবাসভুক্ত রয়েছে। এ গ্রন্থখানির সূচনায় কুরআনুল করিমের ফজিলত এবং কুরআনুল করিম বুঝার প্রয়োজনীয়তা দু'টি অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

উপসংহার: আল্লামা শাওকানী শুধুমাত্র একজন মুফাস্সিরই ছিলেন না, বরং ইসলামের অন্যান্য বিষয়েও যথেষ্ট অবদান রেখে মুসলিম উম্মার চলার পথকে সহজ ও সুগম করে গেছেন। আল্লাহর কালামকে বুঝার ক্ষেত্রে তাঁর তফসিরখানি জ্ঞানপিপাসুদের পিপাসা নিবারণে যথেষ্ট অবদান রাখছে। বিশেষ করে রিওয়ায়াহ (رواية) ও দিরায়াহকে (دراية) সমন্বয় করে তিনি যে অনবদ্য তাফসির রচনা করেছেন, এর দৃষ্টান্ত বিরল। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

রেফারেন্স :

১. মুহাম্মদ বিন 'আলী আশ্শাওকানীর ফাতহুল কাদীর-এর ভূমিকা।
২. Encyclopedia.
৩. শাওকানী : আল বাদরুত তালে' (البدر الطالع)
৪. সিদ্দিক হাসান খাঁন : আবজাদুল উলুম (أبجد العلوم)
৫. সিদ্দিক হাসান খাঁন : আত্ তাজুল মুকাল্লাহ (التاج المكلل)
৬. আল বোগদাদী : হেদায়াতুল আরেফিন (هداية العارفين)
৭. আল বাগদাদী : ইজাহুল মাকনুন (ايضاح المكنون)
৮. আল কায়তানী : আর রিসালুতুল মুসতাতরিফাহ (الرسالة المستطرفة)
৯. আল কায়তানী : ফাহরাসুল ফাহারিস (فهرس الفهارس)
১০. উমর রেজা : কাহ্হালাহ, মু'জামুল মুয়াল্লিফিন (معجم المؤلفين)
১১. আবদুল মুতায়াল আসসাইদি : আল মুজাদ্দেদুনা ফিল ইসলাম(المجددون فى الاسلام)
১২. জুবারাহ : নাইলুল আওতার (نيل الوطر)
১৩. আল বাজালি : তাবাকাতুল ফুকাহায়িল ইয়ামান (طبقات فقهاء اليمن)
১৪. আজজারকালি : আল ইলাম (الاعلام)
১৫. আযযাহহাফুছ ছানআনি, দুররুল হুরুল আইন (درر الحور العين)
১৬. আদ্ দিমারি : সিরাতুল হাদি (سيرة الهادى)
১৭. হাসান বিন আহমদ আসেক, আদদিবাজুল খোসরাওয়ানি (الديباج الخسروانى)
১৮. আজজুনদার : আততিবরিজ ফি তারাজিমিল উলামা যাবিত তাময়ীয (التبريز فى تراجم العلماء)
১৯. ড. শোবান মুহাম্মদ ইসমাইল : ইমাম শাওকানী ওয়ামানহাজুহু উসূলুল ফিকহ (الامام الشوكانى ومنهجه فى اصول الفقه)
২০. মুফাসসির ড. মো. হাসান বিন আহমদ আল গামারি : ইমাম শাওকানী (الإمام الشوكانى)

***

সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা ও তাঁর তাফসির 'আল-মানার'

প্রফেসর ড. আ. ফ. ম. আবদুল কাদের

ভূমিকা: উনিশ ও বিশ শতকে সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এ সময়ে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের তাফসির গ্রন্থ প্রণয়নে অনেক যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী অনবদ্য অবদান রাখেন। তাঁদের প্রণীত এইসব তাফসির গ্রন্থ তাফসির শাস্ত্রে অনন্য সংযোজন। আল্লামা সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা (১২৮২ হি. / ১৮৬৫ খৃ.-১৩৫৪ হি. /১৯৩৫খৃ.) ছিলেন এ সময়ের ইসলামি সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা এবং আধুনিক তাফসির রচয়িতাগণের অগ্রদূত। তাঁর রচিত তাফসির গ্রন্থের নাম "তাফসির আল-কুরআন আল হাকীম।" আল-মানার নামক ইসলামি ম্যাগাজিনে প্রথমে এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল বিধায় এটি "তাফসির আল-মানার" নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। গ্রন্থখানি প্রচলিত ধারার তাফসির গ্রন্থসমূহের চাইতে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি, গৌরবোজ্জ্বল সোনালী অতীত পুনরুদ্ধার এবং পশ্চাদপদ মুসলিম উম্মাহকে প্রগতির ধারায় একাত্ম করার প্রয়াস তাফসির আল-মানার-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মুসলিম উম্মাহর সমস্যাদি চিহ্নিত করে তা সমাধানের দিকনির্দেশনা প্রদান তাফসির আল-মানারকে সমসাময়িক তাফসির গ্রন্থসমূহের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় মর্যাদায় সমাসীন করেছে।

জন্ম ও বংশ পরিচয়: সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা ইবন আলী রিদা ইবন মুহাম্মদ শামসুদ্দীন ইবন মুহাম্মদ বাহাউদ্দীন ইবন মানলা ইবন আলী খলিফা আল-কালমুনী আল-তরাবলুসী ১২৮২ হিজরি সালের ২৭ জমাদিউল আউয়াল মোতাবেক ১৮৬৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর সিরিয়ার লেবাননের অন্তর্গত তারাবলুস থেকে তিন মাইল দূরে কালমূন পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর বংশধারা ইমাম হুসাইন ইবন আলী রা. ইবন আবী তালিবের সাথে মিলিত হয়েছে।

বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন: সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদার পিতা আলী রিদা ছিলেন কালমূনের বিশিষ্ট শায়খ এবং সেখানকার মসজিদের ইমাম। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা-দীক্ষা পিতার নিকট অর্জন করেন। তাঁর পিতা প্রখর স্মৃতিশক্তি ও স্পষ্টবাদিতার জন্যে বিখ্যাত ছিলেন। বাল্য বয়সে সাইয়েদ রশীদ রিদা আল-কুরআন হিফয করেন এবং ইলমে কিরাআতের মৌলিক বিষয়াদি শিক্ষা গ্রহণ করেন। অত:পর হস্তলিপি, ধারাপাত ও গণিতশাস্ত্রে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে তিনি তরাবলুসে আল-মাদরাসাহ আল-রশীদীয়্যাহ ও আল-মাদরাসাহ আল-ওয়াতানীয়্যায় সাত বছর অধ্যয়ন করেন। সেখানে তিনি আরবি ভাষা, ইসলামি আইনশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, দর্শন, পরিবেশ বিজ্ঞানসহ পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করেন। তিনি ছিলেন শায়খ হুসাইন আল-জাসর এর শিষ্য যিনি আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা পদ্ধতির আদলে ইসলামি

সূত্র নির্দেশ:

১. ড. সালাহ আবদুল ফাত্তাহ আল খালেদী, তারীফ আল দারিমীন বি মানাহিজ আল মুফাসসিরীন, দামিষ্ক : দার আল কলম, ২০০২, পৃ. ৫৭০।

জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন এবং এই পদ্ধতি তিনি আত্মস্থ করেন জামে আল-আযহারের বিশিষ্ট আলিম মুহাম্মদ হুসাইন আল-মারসাফীর কাছ থেকে।

ক্রমে সাইয়েদ রশীদ রিদা শায়খ হুসাইন আল-জাসর এর ঘনিষ্ঠ শিষ্যে পরিণত হন এবং তাঁর পাঠচক্রের সদস্য হিসেবে নিয়মিত তাঁর শিক্ষা মজলিসে উপস্থিত হতে থাকেন। এ সময় তিনি ইমাম আবূ হামেদ আল-গাযালীর ইহ্ইয়াউ' উলূম আদদীন গ্রন্থখানি গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন। ১৮৯৭ সালে শায়খ আল-জাসর তাঁকে আরবি ভাষায় ইসলামি আইনশাস্ত্র এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় পাঠদানের অনুমতি প্রদান করেন। একই সময়ে তিনি শায়খ মাহমুদ নাশাবাত এর নিকট হাদিস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং এ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পর হাদিস রিওয়ায়াতের অনুমতি লাভ করেন। এ ছাড়াও তরাবলুসের প্রখ্যাত ওলামায়ে কিরামের মধ্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষক ছিলেন শাইখ আবদুল গণি আর-রাফিঈ, মুহাম্মদ আল-কাউসী, মুহাম্মদ আল-হুসাইনী প্রমুখ। এসব শিক্ষকের নিকট থেকে তিনি তাফসির, হাদিস, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।[২] এসময় তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন।

প্রাথমিক সংস্কার আন্দোলন: বাল্যকালে সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা কালমূন পল্লীর জিদ্দা জামে মসজিদের একটি নির্জন কক্ষে অবস্থান করতেন। এখানে তিনি জ্ঞানার্জন, ইবাদত, সালাত, দোয়া, আল-কুরআন তিলাওয়াত এবং জ্ঞান-গবেষণায় ব্যাপৃত থাকতেন।[৩] বাল্যকালে তিনি অসম সাহসী ছিলেন। উসমানী শাসকবৃন্দ এবং সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের রক্তচক্ষুকে তিনি থোড়াই পরোয়া করতেন। এদের বিরুদ্ধে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে সংগঠিত করতে সচেষ্ট হন। তিনি তাঁর দাওয়াতি ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র হিসেবে নিজের গ্রামকেই বেছে নেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী হওয়ার পর তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল, প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় বক্তৃতা করতেন। আল-কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতির মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্যকে প্রামাণ্য ও সুদৃঢ় করার চেষ্টা করতেন। তিনি ফিকহী মাসায়িল বর্ণনা করতেন এবং বিদআত ও সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতেন। সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা কেবল মসজিদে বক্তৃতা করেই ক্ষান্ত থাকেননি, তিনি জনসমাগমে, চায়ের দোকানে ও কফির আড্ডায় হাজির হয়ে উপস্থিত জনতাকে উপদেশ দিতেন এবং তাদেরকে সালাত আদায়ের জন্যে তাগিদ দিতেন। এতে তিনি যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেন।

তাঁর উপদেশ বক্তব্য শুনে অনেকেই ফরজ বিধানসমূহ প্রতিপালনে এগিয়ে আসে এবং শরীয়তের বিধিনিষেধ প্রতিপালনে অভ্যস্ত হয়। তিনি তাঁর গ্রামের মহিলাদের জন্যেও পৃথক শিক্ষামজলিসের আয়োজন করেন। তাঁর নিজ বাড়িতে আয়োজিত এসব মজলিসে তাহারাত, ইবাদত, আকাইদ, আখলাক প্রভৃতি বিষয়ে তিনি সহজ-সরল ভাষায় বক্তব্য পেশ করতেন। শরীয়তের বিধি-বিধান পালনে তিনি অত্যন্ত আন্তরিক ও যত্নবান ছিলেন। তিনি পবিত্র হজ্জ আদায়ের মনস্থ করলে সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে তাঁর হজ্জের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের প্রস্তাব দেয়া হয়। কিন্তু তিনি বিনয়ের সাথে তা

---

২. মুহাম্মদ সাঈদ মারসী, উযামাউল ইসলাম, কায়রো : মুয়াস্সাসাহ ইকরা, ২০০৫, পৃ. ২৯৫।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, হজ্জ সামর্থ্যবানদের উপর ফরয। আমি আমার আম্মা ও সহোদরকে সাথে নিয়ে এ ফরয আদায়ের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি।[৪]

শায়খ মুহাম্মদ আবদুহ-এর সান্নিধ্যে: সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা তরাবলুসে অধ্যয়নকালে শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু (১৮৪৮খৃ.-১৯০৫খৃ.) স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে বৈরুতে আগমন করেন। উরাবী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার অপরাধে তাঁকে দেশান্তরিত করা হলে তিনি বৈরুত আগমন করে মাদরাসা আস-সুলতানিয়ায় পাঠদান শুরু করেন। সাইয়েদ রশীদ রিদা রাজনীতি বিমুখ ছিলেন। তিনি মনে করতেন, তা'লীম ও তারবিয়াতের মাধ্যমেও সংস্কার সাধন সম্ভব। শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু বৈরুতে অবস্থানকালে সাইয়েদ রশীদ রিদার পক্ষে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ কিংবা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তিনি শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু এর সংস্কার আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হন। তাই তিনি শায়খের সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্যে সদা ব্যাকুল থাকতেন। শায়খ আবদুহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আমন্ত্রণক্রমে দু'বার তরাবলুস আগমন করলে সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি প্যান ইসলামি আন্দোলনের প্রবক্তা সাইয়েদ জামাল উদ্দীন আফগানীর (মৃত্যু ১৩১৪ হি./১৮৯৭ খৃ.) সাথেও সাক্ষাৎ করে ধন্য হতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সাইয়েদ আফগানী তুরস্কের আস্তানায় শাসকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে অনেকটা বন্দীদশায় অতিবাহিত করার কারণে তাঁর এ প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। ফলে তিনি সাইয়েদ জামাল উদ্দীন আল-আফগানীর শিষ্যত্ব লাভে ব্যর্থ হন।

সাইয়েদ রশীদ রিদা সিরিয়ায় অবস্থানকালে ফ্রান্স থেকে সাইয়েদ জামাল উদ্দীন আল-আফগানী ও শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু কর্তৃক প্রকাশিত "আল-উরওয়াতুল উছকা" পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর হস্তগত হয়। এসব সংখ্যা তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন। এই পত্রিকায় শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু ইসলামের সামগ্রিক দিক উপস্থাপন করেন এবং ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন। এটি তাঁর হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং তাঁর চিন্তার রাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু-এর তাফসির সম্পর্কিত লেখাগুলোও তাঁকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। এই পত্রিকার তিনটি মৌলিক বিষয় তাঁর দৃষ্টিতে ব্যতিক্রমধর্মী বলে প্রতীয়মান হয়:

এক : সৃষ্টিজগতে আল্লাহর চিরাচরিত বিধান, সমাজ গঠন পদ্ধতি, জাতির উত্থান-পতন এবং শক্তিমত্তা ও দুর্বলতার কারণসমূহ উদঘাটন;

দুই : ইসলামের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণের দিকনির্দেশনা, মুসলমানদের সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সমৃদ্ধি এবং সামরিক সৌর্যবীর্যের বর্ণনা যা শরীয়তের সুরক্ষা এবং মিল্লাতের স্বার্থ ও মর্যাদা সংরক্ষণের জন্যে প্রয়োজন।

তিন : দীনকে মুসলমানদের জাতীয়তা নিরূপণের উপায় হিসেবে উপস্থাপন, যা তাদেরকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। কারণ, বংশ, ভাষা কিংবা ভৌগোলিক সীমারেখার মাধ্যমে জাতীয়তা নিরূপণ করা হয় না।[৫]

---

৪. প্রগুক্ত, পৃ. ২৯৫

৫. সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা, তাফসীর আল কুরআন হাকীম, আল শাহীর বি তাফসীর আল মানার, বৈরুত : দার আল মারিফাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১

প্রথম জীবনে সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা সূফীবাদের দিকে ঝুঁকে পড়লেও 'আল-উরওয়াতুল উছ্‌কা' পত্রিকাটির কয়েকটি সংখ্যা পড়ার পর তিনি আল-কুরআনের আলোকে আত্মশুদ্ধি এবং আল-কুরআনের নির্দেশনার আলোকে পরকালে নাজাতের উসীলা অন্বেষণে ব্যাপৃত হন। ফলে তিনি মিসরে শায়খ মুহাম্মদ আবদুহ্ এর সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েন।[৬] সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা ১৩১৫ হিজরি মোতাবেক ১৮৯৮ সালে মিসরে হিজরত করেন। প্রথমে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে এখানে কয়েক দিন অবস্থান করে এখানকার ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহ পরিদর্শন করেন। অত:পর তিনি কায়রো চলে যান এবং শায়খ মুহাম্মদ আবদুহ্ এর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। মূলত এখান থেকেই তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। তাঁর চিন্তাধারা, সংস্কারমূলক কর্মসূচী, গ্রন্থ রচনা, তাফসির প্রণয়ন এসব কিছুর মূলেই ছিলো শাইখ মুহাম্মদ আবদুহ্ এর অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনা।

সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদার সংস্কারমূলক কার্যক্রম: মিসরে এসে সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা দীনি দাওয়াত, সংস্কারমূলক কার্যক্রম, শিক্ষার উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করতে থাকেন। প্রায় একমাস অতিবাহিত হওয়ার পর শায়খ মুহাম্মদ আবদুহ্ তাঁকে সংস্কার আন্দোলন সফল করার লক্ষ্যে সংবাদপত্রকে অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণের আহ্বান জানান। তাঁর মতে সংবাদপত্র হলো এমন এক গণমাধ্যম জনজীবনে যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এর মাধ্যমে তালীম তারবিয়াত তথা শিক্ষা-প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ভাবের আদান-প্রদান, নিজস্ব চিন্তাধারা তুলে ধরা, সামাজিক অবক্ষয় রোধ এবং প্রচলিত বিদয়াত ও অজ্ঞতা দূরীকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা সম্ভব। শায়খের এই নির্দেশনার আলোকে তিনি একটি পত্রিকা সম্পাদনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এজন্যে তিনি প্রাথমিকভাবে লাভ-লোকসানের হিসাব করেননি।

সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা ধর্মীয় পণ্ডিত, দা'য়ী ও খতীবদের জন্যে কায়রোতে মাদরাসা আদ-দাওয়াহ ওয়াল-ইরশাদ নামক একটি দীনি শিক্ষায়াতন প্রতিষ্ঠা করেন। এতে ধর্মতত্ত্ব, তাফসির, হাদিস, ফিকহ্, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান করা হতো। এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নকারীদের মধ্যে বিশিষ্ট দায়ী ফিলিস্তিনের সাইয়েদ আমীন আল-হুসাইনী এবং শায়খ মুহাম্মদ আবদুত তাহের এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শায়খ আবদুত্ তাহের পরবর্তীতে দারুল হাদিস এর প্রতিষ্ঠাতা এবং মক্কায় মসজিদুল হারামের ইমাম ছিলেন।[৭]

সাইয়েদ রশীদ রিদা ১৩১৫ হি. / ১৮৯৮ সালের শেষদিকে কায়রো থেকে 'আল-মানার' নামক একখানি সাময়িকী প্রকাশ করেন। এতে ফিক্‌হ ও আকাইদ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর, সংবাদ, মুসলিম উম্মাহর চিন্তাধারা ও রাজনীতি এবং মুসলিম বিশ্বে স্বাধীনতা আন্দোলন প্রভৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নিবন্ধ প্রকাশিত হতো। এই সাময়িকী ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার সাধনে তাঁর চিন্তাধারা প্রচারের ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদান রাখে। ইসলামের সকল দিক ও বিভাগের বাস্তবধর্মী ব্যাখ্যার কারণে পত্রিকাটি মুসলিম বিশ্বে Encyclopedia of Islam হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। বেশ কয়েক বছর অব্যাহতভাবে এর ৩৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর এর প্রকাশনা

---

৬. প্রগুক্ত, পৃ. ১১
৭. মুহাম্মদ সাঈদ মারসী উযামাউল ইসলাম, পৃ. ২৯৬

সাত মাস বন্ধ থাকে। অত:পর তাঁর শিষ্য বাহজাত আল-বায়তারের সম্পাদনায় এটি পুনরায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এর প্রকাশনা তিন বছর বন্ধ থাকার পর ইমাম হাসান আলবান্নার তত্ত্বাবধানে এটি পুনরায় প্রকাশিত হয়।

আল-মানার পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা আল-কুরআনের তাফসির প্রকাশ করতেন, যা পরবর্তীতে তাফসির আল-কুরআন আল-হাকীম তথা তাফসির আল-মানার নামে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার নামানুসারে তিনি কায়রোতে আল-মানার নামক একটি প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সংস্থা থেকে তাঁর নিজস্ব এবং অন্যান্য খ্যাতনামা লেখকগণ কর্তৃক রচিত অনেক মূল্যবান ইসলামি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।[৮]

সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদার সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের প্রভাবে পরবর্তীতে শাসকবৃন্দের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। মিসরের শাসক শরীফ হুসাইনের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সৌদী আরবের মালিক আবদুল আযীয আলে সউদ তাঁকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি মনে করতেন। সাইয়েদ রশীদ রিদা মাঝেমধ্যে তাঁকে পত্র লিখতেন। এক পত্রে সাইয়েদ রশীদ রিদা উল্লেখ করেন, আমি মহানবী সা.-এর সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার, বিদয়াত নির্মূলের, সাহাবায়ে কিরামের জীবনাদর্শের আলোকে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের, ধর্মীয় সংস্কার, পুনর্গঠন ও ইসলামি সমাজ বিনির্মাণ এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার উদ্ভাবনে যথাযথ ভূমিকা পালনের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।[৯] মালিক আবদুল আযীয তাঁর উপর পবিত্র মক্কায় মসজিদুল হারাম এবং পবিত্র মদিনায় মসজিদে নববীতে ইমামতির দায়িত্ব পালনের জন্যে দু'জন ইমাম নিয়োগের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এই দায়িত্ব পেয়ে তিনি মক্কায় মসজিদুল হারামের জন্যে শায়খ মুহাম্মদ আবদুত্ তাহের এবং মদিনার মসজিদে নববীর জন্যে আবদুর রাযযাক হামযাকে ইমাম নির্বাচিত করেন।[১০]

সাইয়েদ রশীদ রিদার রচনাবলী: বাল্যকাল থেকেই সাইয়েদ রশীদ রিদা ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেন। মিসরে শাইখ মুহাম্মদ আবদুহু এর সান্নিধ্যে আসার পর তাঁর কলম আরো শানিত হয়। এ সময় তিনি বেশ কিছু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হলো :

০১. আল হিকামাহ আশ শরীয়াহ ফী মুহাকামাতি আল কাদিরিয়্যাহ ওয়া আল রিফায়িয়্যাহ্।
০২. তারীখ আল উসতায আল ইমাম আল শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু
০৩. আল ওয়াহী আল মুহাম্মদী
০৪. হুকুমুন নিসা ফিল ইসলাম
০৫. যিকর আল মাওলিদ আন নববী সা.
০৬. আল মানার ওয়াল আযহার
০৭. আল ওয়াহদাহ আল ইসলামিয়্যাহ

---

৮. ড. সালাহ আবদুল ফাত্তাহ আল খালেদী, তারীফ আল দারিসীন, পৃ. ৫৭০-৭১।
৯. মুহাম্মদ সাঈদ মারসী, উযামাউল ইসলাম, পৃ. ২৯৬
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

০৮. ইউসরুল ইসলাম ওয়া উসূল আত তাশরী' আল-আম্ম
০৯. মাজাল্লাহ আল মানার
১০. আল খিলাফাহ ওয়াল ইমামাহ আল উযমা
১১. আল ওয়াহাবিয়্যুনা ওয়াল হিযাজিয়্যুনা
১২. আস্‌ সুন্নাহ ওয়াশ শী'আহ
১৩. মানাসিকুল হাজ্জ, আহকামুহু ওয়া হুকমুহু
১৪. তাফসির আল কুরআন আল কারীম তথা তাফসির আল মানার
১৫. হাকীকাতুর রিবা
১৬. রিসালাতুন ফী হুজ্জাতিল ইসলাম আল গাযালী
১৭. আল মাকসূরাহ আল রশীদিয়্যাহ
১৮. নিদা লিল জিনস আল লাতীফ
১৯. মুসাওয়াতুর রাজুলি বিল মারআতি
২০. শুবহাত আল নাছারা
২১. হুজাজুল ইসলাম

মৃত্যু: সৌদী সরকারের সাথে সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদার খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। ১৯৩৫ সালে সৌদী আরবের আমীর সউদ ইবন আবদুল আযীয মিসর সফর করেন। তিনি দেশে ফেরার সময় সাইয়েদ রশীদ রিদা তাঁকে বিদায় জানানোর জন্যে একই গাড়িতে সুয়েজ পর্যন্ত গমন করেন। এ সময় তিনি আমীরকে অনেক উপদেশ দেন। রাতে সুয়েজে অবস্থান এবং বিশ্রামের প্রস্তাব দেয়া হলেও তিনি তা গ্রহণ করেননি। ফলে দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি এবং রাতের অনিদ্রার ধকল তিনি সহ্য করতে পারেননি। চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী তিনি পুরো পথে আল-কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। পথিমধ্যে গাড়ির গতি বাড়ার সাথে সাথে তাঁর মাথা ঘোরা শুরু হয়। তিনি সফরসঙ্গীকে বললেন যেনো গাড়ির ভেতরে তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি গাড়ির ভেতরে মৃত্যুবরণ করেন। এটি হলো ২৩ জুমাদাল উলা, ১৩৫৪ হিজরি মোতাবেক ২২ আগস্ট, ১৯৩৫ ঈসায়ী। তাঁর রচিত তাফসির আল-মানার এর সর্বশেষ বাক্যটি ছিলো:[১১]

فنسأله تعالى ان يجعل لنا خير حظ منه بالموت على الاسلام

"আমরা মহান আল্লাহর নিকট এই দোয়া করছি, তিনি যেনো আমাদেরকে ইসলামের উপর মৃত্যু দান করে আমাদেরকে সৌভাগ্যশালী করেন।"

তাঁকে কায়রোতেই দাফন করা হয়।

উনিশ ও বিশ শতকে তাফসির চর্চা: উনিশ ও বিশ শতকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শনসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। এ সময়ে অনেক আরব-অনারব মনীষী আল-কুরআনের তাফসির গ্রন্থ প্রণয়নে অনবদ্য অবদান রাখেন। এসব গ্রন্থ তাফসির শাস্ত্রে অনন্য সংযোজন। এ সময়ে যে সব মুফাসসির তাফসির গ্রন্থ প্রণয়ন করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন-

---

১১ আল মানার এর সূরা ইউসুফ এর ১০১ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

০১. সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা- তাফসির আল কুরআন আল হাকীম প্রকাশ, তাফসির আল মানার (অসম্পূর্ণ)।
০২. শায়খ আহমদ মুস্তফা আল মারাগী- তাফসির আল মারাগী।
০৩. শাইখ তানতাভী জাওহারী- তাফসির আল জাওয়াহির।
০৪. মুহাম্মদ আবদুল লতীফ ইবন আল খতীব- আওদাহুত তাফসির।
০৫. মুহাম্মদ ফরীদ ওয়াজদী- আল মাছহাফ আল মুফাস্‌সির।
০৬. হাসনাইন মুহাম্মদ মাখলূফ- সাফওয়াতুল বায়ান লিমাআনিল কুরআন।
০৭. মুহাম্মদ মাহমুদ হিজাযী- আল তাফসির আল ওয়াদেহ।
০৮. আবদুল জলীল ঈসা- তাফসির আল কুরআন আল কারীম লিল কিরাআতি ওয়াল ফাহমিল মুস্তাকীম।
০৯. আবুদল করীম আল খতীব- আল তাফসির আল কুরআনী লিলকুরআন।
১০. মুহাম্মদ আবদুল মুনয়িম আল জামাল- আল তাফসির আল ফরীদ লিল কুরআন আল মাজীদ।
১১. মুহাম্মদ আবদুল মুনয়িম খাফাজী- তাফসির আল খাফাজী।
১২. মুহাম্মদ সাইয়েদ তানতাভী- আল তাফসির আল ওয়াসীত।
১৩. মাহমুদ শালতূত- তাফসির আল কুরআন আল কারীম (অসম্পূর্ণ)।
১৪. সাইয়েদ কুতুব- ফী যিলাল আল কুরআন।
১৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী- তাফহীমুল কুরআন।
১৬. মুফতী মুহাম্মদ শফী- মা'আরেফুল কুরআন।
১৭. জামাল উদ্দীন আল কাসেমী- মাহাসিন আল তাভীব।
১৮. মুহাম্মদ ইযযত দারোয়াহ- আল তাফসির আল হাদিস।
১৯. মুহাম্মদ তাহির ইবন আশূর- আল তাহরীর ওয়াল তানভীর।
২০. আবদুর রহমান ইবন নাছের আল সাদী- তাইসীরুল কারিম আল রহমান ফী তাফসীরি কালাম আল মান্নান।
২১. মুহাম্মদ আল আমীন আল শিনকীতী, আদওয়া আলবায়ান ফী তাফসির আল কুরআন বিল কুরআন।
২২. সাঈদ হাভী-আল আসাস ফীত তাফসির।
২৩. মুহাম্মদ আলী আল ছাবুনী- সাফওয়াতুত্ তাফাসির, রাওয়ায়ি আল বায়ান ফী তাফসির আল কুরআন।

আল কুরআন সম্পর্কে সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদার দৃষ্টিভঙ্গী: শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু আল কুরআনকে মুসলিম উম্মাহ্‌র জীবন চলার পাথেয় মনে করতেন এবং মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সংস্কারের একমাত্র মাধ্যম মনে করতেন।[১২] তাঁর সুযোগ্য শিষ্য সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদাও একই দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতেন। সাইয়েদ রশীদ রিদা বলেন, মহান আল্লাহ্ মানব জাতির হেদায়াত গ্রন্থ ও আলোকবর্তিকা হিসেবে মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাযিল করেন। যেনো মানব জাতি কিতাব ও হিকমার শিক্ষার আলোকে নিজেদেরকে আত্মিক ও নৈতিকভাবে পরিশুদ্ধ করতে পারে এবং

---

১২ মুহাম্মদ আল ছাব্বাগ, লামহাত ফী উলূম আল কুরআনওয়া ইত্তিজাহাত আত্ তাফসীর, বৈরুত : আল মাকতাব আল ইসলামী ১৯৭৩, পৃ. ২১৬

নিজেদেরকে পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণের উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারে। এটি শাসকবৃন্দের আইনগ্রন্থের ন্যায় নিছক কোনো গ্রন্থ নয়, এটি দূরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা গ্রন্থও নয়, এটি ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা সম্বলিত কোনো ইতিহাস গ্রন্থও নয়, এটি কোনো শৈল্পিক আলোচনা সম্বলিত কিংবা পেশাগত দক্ষতা অর্জনের আলোচনা সম্বলিত কোনো গ্রন্থ নয় যা জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হতে পারে। কারণ, এসব কিছু অর্জনের যোগ্যতা মহান আল্লাহ মানব জাতিকে প্রদান করেছেন। এসব কিছুর জন্যে আসমানি কিতাবের প্রয়োজন নেই।[১৩] তিনি বলেন, মহান আল্লাহ আরব জাতিকে আল কুরআনের মাধ্যমে সঠিক পথের দিশা দেন এবং বিশ্বজনীন দাওয়াতের মাধ্যমে বিশাল অনারব জাতি-গোষ্ঠীকে হেদায়াত দান করেন। ফলে মুসলিম জাতি বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হয় এবং তারা আল কুরআনের নির্দেশনার আলোকে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যসহ সন্নিহিত সকল জনপদ শাসন করে।[১৪]

দরসে তাফসির থেকে তাফসির আল মানার: সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা ছিলেন শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু এর জ্ঞানের উত্তরাধিকারী এবং তাঁর চিন্তা চেতনার মুখপাত্র।[১৫] এ উভয় মনীষীর চিন্তা-চেতনা, আকীদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ এবং কর্মপন্থায় তেমন কোনো পার্থক্য ছিলনা বলে তাঁদের মধ্যে কোনো বিষয়ে কখনো দ্বিমত হয়নি।[১৬] তাফসির আল মানার গ্রন্থের রচয়িতা সাইয়েদ রশীদ রিদা হলেও মূলত এটি শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু এর তাফসির বিষয়ক চিন্তার ফসল।

সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ মিসর পৌঁছে শায়খ মুহাম্মদ আবদুহুকে আল উরওয়াতুল উছকায় প্রকাশিত তাফসির বিষয়ক চিন্তাধারার আলোকে একখানা তাফসির গ্রন্থ প্রণয়নের অনুরোধ জানালে শায়খ আবদুহু জবাব দেন, আল কুরআনের সকল দিক ও বিভাগকে সামনে রেখে পূর্ণাঙ্গ তাফসির গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। এর অসংখ্যা তাফসির গ্রন্থ বিদ্যমান যার প্রত্যেকটিতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্বলিত বিষয়াদি রয়েছে। তবে এর বিশেষ কিছু আয়াতের ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। সম্ভবত আমার জীবনকালে এর পরিপূর্ণ তাফসির গ্রন্থ প্রণয়ন সম্পন্ন করতে পারবো না।[১৭]

অত:পর তিনি শায়খ মুহাম্মদ আবদুহুকে জামে আল আযহারে তাফসির বিষয়ে দরস প্রদানের বিনীত অনুরোধ জানান।[১৮] শায়খ আবদুহু এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং জামে আল আযহারে রীতিমত ধারাবাহিকভাবে আল কুরআনের তাফসিরের পাঠদান শুরু করেন। সাইয়েদ রশীদ রিদা এই দরসে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন এবং গভীর মনোযোগ সহকারে তা শুনতেন ও লিখে রাখতেন।[১৯] দরসশেষে অবসর সময়ে শায়খের বক্তব্যের আলোকে তিনি তা সুবিন্যস্ত করতেন এবং এতে সংযোজন-বিয়োজন করে তা শায়খকে দেখাতেন। তাঁর কোনো কোনো বন্ধু এটি আল-মানার পত্রিকায়

---

১৩ সাইয়েদ মুহাম্মদ রশদি রিদা, তাফসীর আল মানার ১ম খণ্ড, পৃ. ৪।

১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

১৫ মুহাম্মদ হুসাইন আল যাহবী, আত্ তাফসীর ওয়াল্ মুফাসসিরূন, মিসর : ১৯৭৬, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭৭।

১৬ আবদুর রহমান আছেম, হায়াত আল শায়খ রশীদ, মিশর : মাজাল্লাহ নূরুল ইসলাম, ৫ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৩৫৪হি.।

১৭ সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা, তাফসীর আল মানার, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭।

১৮ ড. সালাহ আবদুহু ফাত্তাহ আল খালেদী, তারফি আল দারিসীন, পৃ. ৫৭০।

১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭০।

প্রকাশের অনুরোধ জানালে শায়খের অনুমতি নিয়ে তিনি এটি তাফসির আকারে ১৩১৮ হিজরির মুহাররম মাসে আল মানারের তৃতীয় সংখ্যা থেকে এর প্রকাশ শুরু করেন এবং নাম দেন তাফসির আল কুরআন আল হাকীম। আল মানার পত্রিকায় প্রকাশের কারণে পরবর্তীতে এই তাফসির গ্রন্থখানি তাফসির আল-মানার নামে সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করে।

তাফসির আল মানার প্রণয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা তাঁর তাফসির আল মানার প্রণয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন, ইতোপূর্বে তাফসির শাস্ত্রের মতো গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে তার অধিকাংশেই পাঠকগণকে আল কুরআনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়নি। এইসব গ্রন্থে পদ প্রকরণ, ব্যাকরণের নীতিমালা, অলংকার শাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় ও পরিভাষা বর্ণনা, দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা, ফকীহগণের গবেষণালব্ধ মাসায়িল বর্ণনা, সূফীবাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, বিভিন্ন দল-উপদলের মাযহাবী আলোচনা, ইসরাঈলী রিওয়ায়াতের সমাবেশ ঘটানো এবং পদার্থ ও জ্যোতির্বিদ্যাসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশদ আলোচনা বিদ্যমান। তাছাড়া এইসব গ্রন্থে আকাশ, পৃথিবী, মহাবিশ্ব, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যাসহ এমন সব বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যা আল কুরআন নাযিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবনে বাধার সৃষ্টি করে।[২০]

ইতোপূর্বে রচিত তাফসির গ্রন্থসমূহের অসম্পূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে সাইয়েদ রশীদ রিদা উল্লেখ করেন, তাফসির বিল মাছূর তথা রিওয়ায়াত নির্ভর তাফসিরে উল্লেখিত অধিকাংশ রিওয়ায়াত আল কুরআন বুঝার পথে অন্তরায় হয়ে দেখা দেয় কিংবা আল কুরআন নাযিলের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুধাবনে উদাসীন করে দেয়। আল কুরআন নাযিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো আত্মর পরিশুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ, যা রিওয়ায়াত নির্ভর তাফসিরে অনুপস্থিত।[২১] ফলে সাইয়েদ রশীদ রিদা নতুন আঙ্গিকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে একখানি তাফসির গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি বলেন, অতএব এমন একখানি তাফসির গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হলো, যার মূল লক্ষ্য হবে আল কুরআন হেদায়াতের যেই মিশন নিয়ে নাযিল হয়েছে, তা গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা। বর্তমান বিশ্বের সামগ্রিক অবস্থার প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হবে। সকল শ্রেণীর পাঠকের জ্ঞান ও বোধের প্রতি লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় এটি প্রণয়ন করা হবে। আর যেসব দার্শনিক ও জড়বাদীরা আল কুরআনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সন্দেহ-সংশয়ের বীজ বপন করেছে এতে তাদের সন্দেহ-সংশয়ও নিরসন করা হবে।[২২]

তাফসির আল মানার রচনার সময়কাল ও রচনা পদ্ধতি: শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু এর দরসে তাফসিরের আলোচনাসমূহ সুসংবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা আল কুরআনের তাফসির প্রণয়নের প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করলেও মূলত তাফসির আল মানার প্রণয়নের চূড়ান্ত কাজ শুরু করেন আল মানার পত্রিকা প্রকাশের পর। শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু এর মৃত্যুর পূর্বে এর দু'টি খণ্ড প্রকাশিত হয়। পারা ভিত্তিক বিভক্ত এর দ্বাদশ খণ্ড রচনার কাজ সম্পন্ন হয় ১৩৫৪ হি. / ১৯৩৫

---

২০ সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা, তাফসীর আল মানার, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭।
২১ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০।
২২ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০।

ঈসায়ী সালে আল কুরআনের ১২শ পারায়। অবশ্য তিনি সূরা ইউসুফের ১০১ তম আয়াতের তাফসির সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে তাঁর শিষ্য বাহজাত আল বায়তার এই সূরার অবশিষ্ট ১০টি আয়াতের তাফসির তাঁর অনুসৃত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করে তাঁর নামে সূরা ইউসুফের তাফসির স্বতন্ত্র খণ্ডে প্রকাশ করেন।[২৩]

সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা তাঁর তাফসির আল মানারের ভূমিকায় তাঁর তাফসির প্রণয়ন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেছেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন, তাফসির আল মানার তাঁর শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু এর রচনা পদ্ধতি অনুসরণে রচিত। যেমন তিনি তাঁর শায়খ এর মৃত্যুর পর আল মানার এর ৫ম খণ্ড সম্পন্ন করে এর সমাপ্তিতে উল্লেখ করেন:[২৪]

تم الجزء الخامس من التفسير .... وفى أثناء هذا الجزء انتهب درس الاستاذ الامام عليه الرحمة والرضوان وسير فى تتمة التفسير إن شاء الله على الطريقة التى اخذناها عنه ونهتدى بهديه فيها ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق •

"পঞ্চম খন্ডের তাফসির প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হলো। .... আর এই খণ্ড সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে উস্তাদ ইমাম রহ. এর দরস সম্পন্ন হলো। ইনশাআল্লাহ শায়খের পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং তাঁর নির্দেশনার আলোকে পরবর্তী অংশের তাফসির প্রণয়নের কাজ অব্যাহত থাকবে।"

উপরোক্ত দিকগুলো বিবেচনা করে তাফসির আল মানার এর রচনাকাল ও এর রচনা পদ্ধতিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায় :

এক : শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু এর হুবহু ভাষা ও চিন্তাধারা সম্বলিত তাফসির যা শায়খ তাফসিরের দরসে পেশ করেছেন এবং সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা এটি লিপিবদ্ধ করে পরবর্তীতে বিন্যস্ত আকারে শায়খের নিকট পেশ করে তাঁর অনুমোদন নিয়েছেন। এটি হলো আল-মানার এর প্রথম খণ্ড।

দুই : শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু এর চিন্তাধারা এবং সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদার ভাষা সম্বলিত তাফসির। এটি হলো তাফসির আল মানার এর পরবর্তী ৪টি খণ্ড। শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু তাফসিরের দরসে যে বক্তব্য পেশ করেন তার আলোকে সাইয়েদ রশীদ রিদা নিজের ভাষায় তা লিপিবদ্ধ করেন। এজন্যে তাফসির আল মানার এর প্রথম খণ্ড এবং পরবর্তী ৪টি খণ্ডের ভাষা, বক্তব্য ও উপস্থাপনা পদ্ধতিতে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তী ৪টি খণ্ড সাইয়েদ রশীদ রিদা রিওয়ায়াত নির্ভর তাফসিরের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় বিস্তৃত আকারে উপস্থাপন করেন।

তিন : সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদার নিজস্ব ভাষা, চিন্তাধারা ও পদ্ধতি অনুসরণে রচিত তাফসির। তাফসির আল মানার এর ৬ষ্ঠ খণ্ড থেকে ১২শ খণ্ড পর্যন্ত এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়। এইসব খণ্ডে রশীদ রিদাকে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত দেখা যায়। তিনি মূলত নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করে একখানি ব্যাপকভিত্তিক তাফসির গ্রন্থ প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন। সুতরাং দেখা যায়, তাফসির আল মানার এর শেষের খণ্ডগুলো অনেক বেশি

---

২৩ মুহাম্মদ আল ছাব্বাগ, লামহাত ফী উলূম আল কুরআন, পৃ. ২২৪।
২৪ সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা তাফসীর আল মানার ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৬।

পরিপক্ক, সুবিন্যস্ত, বিজ্ঞানসম্মত ও বস্তুনিষ্ঠ, যাতে পূর্ববর্তী সকল মুফাসসিরের তথ্যাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে।

তাফসির আল মানার এর বৈশিষ্ট্য: তাফসির আল মানার শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু ও সাইয়েদ রশীদ রিদার গভীর গবেষণার ফসল। ফলে প্রচলিত তাফসির গ্রন্থসমূহ যে ধারায় প্রণীত হয়েছে তাফসির আল মানারে তার চাইতেও স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মূলত এটি রচিত হয়েছে মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক প্রয়োজনকে সামনে রেখে। তাই এতে ভাষাশৈলীর বিশ্লেষণের চাইতেও সমাজ-সভ্যতার প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কোনো কোনো বিষয়ের আলোচনায় সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদাকে মুজতাহিদ বলে মনে হয়। এসব বিষয় সামনে রেখে তাফসির আল মানার এর বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

এক : আল-কুরআনের তাফসির প্রণয়নে সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা পূর্ববর্তী মুফাস্সিরগণকে হুবহু অনুসরণ করেননি, বরং অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব গবেষণার আলোকে স্বাধীনভাবে মতামত পেশ করেছেন।[২৫]

দুই : সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা আল কুরআনকে আল কুরআনের মাধ্যমে বুঝার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন, আল কুরআনের কিছু কিছু আয়াত অন্য কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা পেশ করে থাকে।[২৬] ফলে একই বিষয়ে আলোচিত আল কুরআনের সকল আয়াতের ব্যাখ্যা একই স্থানে উল্লেখ করেন।[২৭] এর ফলে তাফসির আল মানার বিষয় ভিত্তিক তাফসিরের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

তিন : তাফসির আল মানারে তিনি মহানবীর সা. সহীহ হাদিস, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণের মতামত এবং আরবদের বাক্যরীতি প্রভৃতির মাধ্যমে আল কুরআনের মর্মার্থ উপস্থাপন করেন।[২৮]

চার : সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা আল কুরআনের শব্দগত ব্যাখ্যা এবং ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রের খুঁটিনাটি ও জটিল বিষয়াদি আলোচনা করেননি। বরং তিনি তাফসির জালালাইন এর সংক্ষিপ্ত তাফসির পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তবে পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণ যেসব আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসির পেশ করেননি তিনি সেগুলোর বিস্ত ারিত তাফসির পেশ করেছেন।[২৯]

পাঁচ : সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা ইসলামের সঠিক মর্মার্থ উপস্থাপন এবং মানব জাতির ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্যের দিকনির্দেশনার জন্যে তাফসির আল মানার প্রণয়ন করেন।[৩০]

ছয় : সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা সংবাদপত্রের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন বলে তিনি সমাজের সকল শ্রেণী, পেশা ও দৃষ্টিভঙ্গির লোকের সাথে গভীরভাবে মেলামেশার সুযোগ পান। ফলে তাফসির আল মানারে সকল শ্রেণী ও পেশার

---

২৫ মুহাম্মদ হুসাইন আল যাহবী, আল তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭৭।
২৬ সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা, তাফসীর আল মানার ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৯।
২৭ প্রগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৬।
২৮ প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৬।
২৯ ড. সালাহ আবদুল ফাত্তাহ আল খালেদী, তাফসীর আল দারিসীন, পৃ. ৫৭৫-৭৬।
৩০ সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা, তাফসীর আল মানার, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭।

লোকদের জন্যে দিকনির্দেশনা বিদ্যমান। তিনি বিশ্বাসী তথা আস্তিকদেরকে যেমন দীনের উপর অটল-অবিচল থাকার প্রেরণা যুগিয়েছেন অনুরূপভাবে নাস্তিকদের মতামত খণ্ডন করে তাদের সামনে তাফসির আল মানারে ইসলামের শ্বাশত সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন। যেনো তারা ইসলামের সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামি জীবনাদর্শে বিশ্বাসী হতে পারে।[৩১]

সাত : যেসব বিষয় মুসলিম উম্মাহকে সুন্নাহ ও হাদিসের উপর আমল করা থেকে বিরত রাখে, মুসলিম উম্মাহ্‌র বিশ্বাস ও দর্শনে বিচ্যুতি ঘটায় এবং মুসলিম উম্মাহকে সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ির পর্যায়ে নিয়ে যায় সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে তা খণ্ডন করেন। তিনি আল কুরআনের তাফসিরে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত ও মাওদূআত গ্রহণের বিরোধী ছিলেন।[৩২]

আট : যেসব বিষয় সাইয়েদ রশীদ রিদা তাঁর শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু থেকে যথাযথভাবে আত্মস্থ করতে পারেননি সেসব বিষয় তিনি ঢালাওভাবে শায়খের নামে চালিয়ে না দিয়ে বরং নিজের ভাষায় লিখে বলেন, قال ما هناه (শায়খ যা বলেছেন তার অর্থ এই দাঁড়ায়), او مثاله (অথবা অনুরূপ কিছু বলেছেন) او ما ملخصه (শায়খের বক্তব্যের সারকথা হলো এই) প্রভৃতি।

নয় : সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আল কুরআনের আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের প্রকৃত অর্থের পরিবর্তে এর পরোক্ষ ও রূপক অর্থ গ্রহণ করেন।[৩৩] এক্ষেত্রে তিনি আল্লামা যামাখশারী এবং শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু এর রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করেন।

দশ : সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আল কুরআন থেকে সরাসরি মাসয়ালা উদ্ভাবন করেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি মাসয়ালা উদ্ভাবনে জমহুর আলেমগণের বিপক্ষে অবস্থান নেন। যেমন পিতামাতার জন্যে ওছিয়ত সম্পর্কিত সূরা আল বাকারার ১৮০তম আয়াতটি মীরাছের আয়াত এবং ওয়ারিসের জন্যে ওছিয়ত রহিতকরণ সম্পর্কিত হাদিস দ্বারা মানসূখ হয়েছে বলে জমহূর আলিমগণ মত প্রকাশ করেছেন।

পক্ষান্তরে সাইয়েদ রশিদ রিদার মতে আয়াতটি মানসূখ হয়নি। কারণ এটি মীরাছের আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, বরং পরিপূরক।[৩৪] অনুরূপভাবে তিনি অনেক ফিকহী মাসয়ালার উপর নিজের মতকে প্রাধান্য দেন। যেমন তিনি পানি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন এবং ফকীহগণের অনুসৃত মতের সমালোচনা করে তাফসির আল মানার গ্রন্থে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন।[৩৫]

এগার: সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদার তাফসির আল মানার গ্রন্থখানি রিওয়ায়াত ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার সমন্বয়ে রচিত, যাতে শরীয়তের বিধি-বিধান, বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনা পদ্ধতি, মুসলিম বিশ্বের সংকট ও তা উত্তরণের উপায় সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল

---

৩১ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬। আল যাহাবী আল তাফসীর ওয়া আল মুফাসসিরূন, ২য় খণ্ড পৃ. ৫৮০।
৩২ সাইয়েদ রশীদ রিদা, তাফসীর আল মানার ১ম খণ্ড, পৃ. ১০।
৩৩ প্রাগুক্ত ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৪৬-৪৭।
৩৪ প্রাগুক্ত ১ম খণ্ড পৃ. ১৩৪-৩৭।
৩৫ প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড পৃ, ১২৮-১২৯।

ভাষায় সঠিক সমাজের উপযোগী করে উপস্থাপন করেছেন। ফলে সাধারণ পাঠকগণ যেমন এর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন, বিজ্ঞান ও গবেষণা মনস্থ পাঠকগণও এতে তাঁদের গবেষণার উপাদান খুঁজে পান।

উপসংহারঃ সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা ছিলেন ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষত তাফসির শাস্ত্রের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত আল মানার নামক তাফসির গ্রন্থখানি সমকালীন পণ্ডিত মহলে জনপ্রিয় তাফসির হিসেবে সমাদৃত হয়েছে। কোনো মুফাসসির আল মানার রচয়িতার সমকক্ষতা অর্জন করতে পারবে না বলে শায়খ আল মারাগী মত ব্যক্ত করেন।[৩৬] তিনি তাঁর তাফসির গ্রন্থে অন্য মুফাসসিরের মতামত ও বক্তব্য উপস্থাপনের চাইতেও নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীন মতামত প্রকাশকে অগ্রাধিকার দেন। এতে মানব সভ্যতার উৎকর্ষ ও বিকাশে আল কুরআনের কালজয়ী অবদান বিবৃত হয়েছে।

সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা আল কুরআনের তাফসিরে শব্দ, পদ, ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রের অনুশীলন প্রভৃতিকে অন্তঃসারশূন্য তাফসির মনে করতেন। এতে তিনি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের সার্বজনীন আদর্শকে তুলে ধরেন। তাঁর তাফসিরে জাতিতাত্ত্বিত ইতিহাস, জাতির উত্থান-পতনের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, নীতিবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা একে সমাজবিজ্ঞানীদের একাডেমিক গবেষণার গ্রন্থে পরিণত করে। অপরদিকে আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াতগুলোর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোকে তাফসির উপস্থাপন একে বিজ্ঞান গবেষকদের রেফারেন্স গ্রন্থে পরিণত করে।

***

---

৩৬ মুহাম্মদ সাঈদ মারসী, উযামাউল ইসলাম, পৃ. ২৯৬।

মুফতি মুহাম্মদ শফী রহ. ও মা'আরিফুল কুরআন
একটি পর্যালোচনা
ড. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ

ভূমিকা : মহাগ্রন্থ আল কুরআন অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মতো পুস্তক নয়। এটি হচ্ছে নিখিল বিশ্বের মহান স্রষ্টা আল্লাহর কালাম এবং তাঁর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাব। পানি পড়া, শবিনা খতম পড়া, লাশের চারদিকে গোল হয়ে বসে তাকে পড়ে শোনানো এবং তাবীজের ব্যবসার যোগান দেয়ার জন্য এটি নাযিল করা হয়নি। বরং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আমরা আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সকল কিছুর সুস্পষ্ট বিবরণ (সমাধান), পথনির্দেশ, রহমত ও মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ হিসেবে।" (সূরা আন নাহল : আয়াত ৮৯)

এ কুরআন হচ্ছে মুসলমানদের জন্য জ্ঞান ও শক্তির উৎস। এ মহাগ্রন্থ প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ কিতাবের আলোকে মানবজাতি তাদের জীবনের সকল অঙ্গন ও দিগন্তকে ঢেলে সাজাবে। এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে কুরআনকে উপলব্ধি করা ও বুঝা। কুরআন বুঝার অন্যতম উপায় হচ্ছে তাফসির সাহিত্য অধ্যয়ন। ইসলামের প্রথম যুগ থেকে তাফসির চর্চা শুরু হয়। বিভিন্ন ভাষায় তাফসিরের বই সংকলন ও অনুবাদ কর্ম অব্যাহত আছে।

হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীর একটি প্রসিদ্ধ তাফসিরের কিতাব হচ্ছে 'মাআরিফুল কুরআন'। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় খুব অল্প সময়ের মধ্যে এ তাফসিরটি বিশ্ব মুসলিম সমাজের কাছে সমাদৃত হয়। এর ব্যাপকতা ও প্রসারতার অন্যতম কারণ হচ্ছে বাংলা ভাষায় এর অনুবাদ।

বাংলায় অনূদিত হওয়ায় তাফসিরটি খুব দ্রুত সমগ্র বিশ্বে বাংলাভাষী মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়ে। এ তাফসির প্রণয়ন করেছেন বিশ্ববরেণ্য আলেমে দীন মুফতি মুহাম্মদ শফী রহ. (মৃত্যু ১৩৯৬ হি.)।

ক. সংক্ষিপ্ত জীবনী

১. মুফতি মুহাম্মদ শফী রহ. -এর সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

মুফতি মুহাম্মদ শফী রহ. ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তাঁর সমকালীন অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণানায় বলা যায়, তখন রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজিত ছিলো। ইংরেজদের গদ্দিনশীন তাবেদার সরকারের শাসন ছিলো। মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত থাকলেও তাদের মাঝে রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব ছিলো। একদল আলেমের কাছে ইসলামে রাজনীতি স্বীকৃত ছিলো না।

মুসলমানদের কাছে ইসলাম ছিলো অপরিচিত ও বিপর্যস্ত। কিছু আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টিকে ইসলামের প্রতিচ্ছবি মনে কর হতো। আদর্শিক ও ধর্মীয়ভাবে মুসলমানদেরকে আরও বিপর্যস্ত করার জন্য ইংরেজ বেনিয়ারা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে ডেকে নিয়ে তার মাথায় নবুয়তের তাজ বসিয়ে দেয়। পয়গাম হিসেবে মুখে তুলে দেয়,

জিহাদকে রহিত করার জন্য আল্লাহ আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। বিভ্রান্ত হয় ধর্মচ্যুত ও আদর্শচ্যুত কিছু মুসলিম জনগোষ্ঠী।

সামাজিকভাবে মুসলমানরা ছিলো দৈন্যদশাগ্রস্ত ও অবহেলিত। নিরীহ ও নিঃস্বের সংখ্যাধিক্য ছিলো মুসলমানদের মাঝে। ঠাকুর আর ব্রাহ্মণদের বদান্যতার উপর নির্ভরশীল ছিলো তাদের সামাজিক জীবন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির গোটাটাই পশ্চিমা লেবাসে সাজানো ছিলো। কলিকাতা আলিয়া মাদরাসাসহ কিছু কিছু মাদরাসা থাকলেও কেবল ধর্ম দিয়ে কর্ম সাধনের লক্ষ্যে পরিচালিত হতো। ব্যক্তিগত ও বেসরকারি পর্যায়ে কিছু মাদরাসা ছিলো কেবল কুরআন হাদিস ও ফিক্‌হ ইত্যাদি শিখার জন্য। হিন্দু, মোঘলীয়, তুঘলোকীয় ও ইংরেজ শাসনের প্রভাব ও প্রতাপে মুসলমানরা বহুধা বিভক্ত ছিলো। ইসলামের সঠিক ধারণা তাদের কাছে অনুপস্থিত ছিলো।

এমনি মুহূর্তে একটি আশাবাদ জাগ্রত হলো, ভারত বর্ষের এক সিংহশার্দুল ১৯৩৮ সাল থেকে জাতিকে মহাসত্যের দিকনির্দেশনা দিতে শুরু করেন। এ সুবাদে অনেকেই এ নিয়ে চিন্তা শুরু করলো। বেরিয়ে আসলো গবেষক ও চিন্তাবিদদের একটি গোষ্ঠী। এদের একজন ছিলেন মুফতি মুহাম্মদ শফী। তিনি আদর্শিকতায় ও চিন্তা-চেতনায় ঐ সিংহ পুরুষের মতো হলেও প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক কারণে প্রত্যক্ষ ময়দানে আত্মপ্রকাশ করেননি। তারপরও বিপর্যস্ত ও বিপাকে পতিত মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশাল অবদান রাখতে সক্ষম হন। তাঁর তাফসির মা'আরিফুল কুরআনের মাধ্যমে উম্মাহকে দিকনির্দেশনা দেয়ার প্রয়াস পান।

২. নাম, বংশ পরম্পরা, জন্ম, জন্মস্থান ও মৃত্যু

নামঃ মুহাম্মদ শফী, পিতার নাম মাওলানা ইয়াসীন উছমানী, মাতার নামঃ সাঈদা, পিতামহের নাম মিয়াজী আলী, প্রপিতামহ মিয়াজী করিমুল্লাহ। ১৩১৪ মোতাবেক ১৮৯৬ সালে উত্তর প্রদেশের সাহরানপুর জেলার দেওবন্দ শহরে এক ঐতিহ্যবাহী আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১]

পূর্বপুরুষরা সাহরানপুর জেলার মংলোর থানাধীন জওরাসী নামক এলাকায় বসবাস করতেন। পরবর্তীতে প্রপিতামহ দেওবন্দ শহরে এসে বসতি স্থাপন করেন। জন্মের পর মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গোহী রহ. মুহাম্মদ শফী নাম চয়ন করেন।

পিতা দেওবন্দ মাদরাসায় ফারসি বিভাগের প্রসিদ্ধ শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে খ্যাতনামা আলেম, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ ও ইসলামি চিন্তাবিদ।[২]

১১ শাওয়াল, ১৩৯৬/৬ অক্টোবর, ১৯৭৬ সালে এ মহান জ্ঞানসাধকের মৃত্যু হয়। করাচি দারুল উলুমের চত্বরেই তাঁকে দাফন করা হয়। ড. আব্দুল হাই আরিফী [৩] তার সালাতুল জানাযা আদায় করেন। এক লাখের বেশি লোক তাঁর নামাযে জানাযায় শরিক হয়।

শিক্ষাজীবন

মুফতি সাহেবের সুযোগ্য পিতার তত্ত্বাবধানে ভারতের প্রসিদ্ধ দেওবন্দ মাদরাসাতেই তাঁর শিক্ষাজীবনের শুরু হয়। একটি ধর্মীয় পরিবারের রীতি অনুসারে শুরুতেই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা লাভ করেন তিনি।

---

০১. ইসলামি বিশ্বকোষ, খণ্ড: ২১, পৃষ্ঠা: ১৬২, তাফসির মা'আরিফুল কুরআন ভূমিকা, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৪।
০২. ইসলামি বিশ্বকোষ-২১, পৃষ্ঠা : ১৬২।
০৩. আশরাফ আলী থানবী রহ. -এর নিয়োগপ্রাপ্ত খলিফা, থানা ভবনে তাঁর মৃত্যুর পর দায়িত্ব পালন করেন।

সাহরানপুরে নানার বাড়িতে অবস্থানকালে সেখানকার হিফজখানায় তিনি কয়েক পারা কুরআন শরীফ মুখস্থ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি হাফেজ আব্দুল আযীম ও হাফেজ নামদার খানের নিকট হিফজ ও কুরআনের প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন।[৪]

পরবর্তীতে পরিপূর্ণ কুরআনুল কারীম হিফজ করেছেন কিনা তাঁর জীবনী গ্রন্থগুলোতে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। ইসলামি বিশ্বকোষে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শারীরিক দুর্বলতাহেতু তিনি এ ধারা বেশি দিন চালু রাখতে পারেননি।[৫]

উর্দু, ফারসি, অংক, জ্যামিতি ও প্রাথমিক আরবি শিক্ষা তিনি লাভ করেন স্বীয় পিতার নিকট। তারপর ১৩৩১ হি. সালে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসার আরবি বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৩৩৫ সাল পর্যন্ত দারসে নিযামির শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দারসে নিযামির সমগ্র পাঠ্যসূচি এমন সব দক্ষ উস্তাদের নিকট পড়ার সৌভাগ্য হয় যাদের তুল্য বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের উস্তাদ বর্তমান বিশ্বের কোথাও পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।[৬]

মাধ্যমিক স্তরে আরবি ভাষা শিক্ষাকালে তিনি সময় সময় শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহ.-এর দারসেও হাজির হতেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, কোনো কোনো সময় তাঁর বুখারি শরীফের দারসে বসে বরকত হাসিল করার সুযোগ লাভ করেছি।[৭]

অসাধারণ মেধা ও প্রখর ধীশক্তি বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে প্রকটিত ছিলো। ফলে তিনি ছাত্র বয়সেই নামকরা উস্তাদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। ছাত্র জীবনেই তিনি মুফতি আযিবুর রহমানের ফাতওয়া লিখনের কাজে সহযোগিতা করতেন।[৮]

দারুল উলুমে শিক্ষাদানকালে তিনি মাওলানা থানবী রহ. এর পরামর্শক্রমে গ্রীক দর্শনের বহু গ্রন্থ, আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের বই-পুস্তকও অধ্যয়ন করেন। ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কেও তাঁর বেশ পড়াশুনা ছিলো। ইলমে শরিয়ার পাশাপাশি তিনি ইলমুত তাসাউফ লাভ করার দিকে পা বাড়ান। এমনকি এক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যা আমরা ভিন্ন অনুচ্ছেদে তুলে ধরবো।

৪. কর্মজীবন

তাঁর কর্মজীবনের শুরু হয় শিক্ষকতার মাধ্যমে। দারুল উলুম দেওবন্দে উচ্চতর শিক্ষা লাভের সময় ১৩৩৬ হিজরি সাল থেকে দুই-একটি সবক পড়ানোর অনুমতি তাকে দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৩৩৭ হিজরি সনে মাওলানা হাবিবুর রহমান তাকে জুনিয়ার ক্লাসগুলোতে পাঠদানের জন্য একজন নিয়মিত শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। যোগ্যতা, বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতা তাকে খুব অল্প সময়ের মাঝে উচ্চতর ক্লাসগুলোতে পাঠদানের আসনে সমাসীন করে।

১৩৬২ হিজরি পর্যন্ত তিনি প্রায় ২৭ বছর নিরলসভাবে এ শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.-এর

---

০৪. ইসলামি বিশ্ব কোষঃ খণ্ড- ২১, পৃষ্ঠাঃ ১৬২, তাফসিরে মা'আরিফুল কুরআনের ভূমিকা, খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ১৩।
০৫. ইসলামি বিশ্ব কোষ : প্রাগুক্ত
০৬. তাফসির মা'আরিফুল কুরআনের ভূমিকা, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা- ১৪
০৭. প্রাগুক্ত, বরকত হাসিলের বিষয়টি তার সুফীবাদী চিন্তাধারা থেকে উৎসারিত। এ ধারণা সহিহ আকিদার পরিপন্থী।
০৮. ইসলামি বিশ্বকোষ : খণ্ড- ২১, পৃষ্ঠা : ১৬২, তাফসির নুরুন কুরআন, খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ১৬৬।

বিশেষ অনুপ্রেরণায় হাদিস শিক্ষাদানে অনুপ্রাণিত হন। ফলে প্রথমে মুয়াত্তা ইমাম মালেক ও পরবর্তীতে সুনানু আবু দাউদের দারস দিতে থাকেন। ফিকহ্ ও আরবি সাহিত্যে ছিলো তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, এসব বিষয় শিক্ষাদানেও তিনি পিছিয়ে ছিলেন না।

কর্মজীবনে তিনি যেসব পদমর্যাদা লাভ করেন

১. ১৩৪৯ হিজরি সনে প্রধান মুফতি হিসেবে তাঁকে দারুল উলুম দেওবন্দের ফাতওয়া বিভাগের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। [৯]

২. ১৯৫০ খৃস্টাব্দে পাকিস্তান ল' কমিশন গঠন করা হলে মুফতি সাহেবকে উক্ত কমিশনের সদস্য নিযুক্ত করা হয়।

৩. ১৯৫০ খৃস্টাব্দে করাচির আরামবাগে বাবুল ইসলাম মসজিদে প্রতিদিন ফজর সালাতের পর দারসুল কুরআনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নিরলসভাবে ৯ বছর পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

৪. ১৯৫৪ সালে রেডিও পাকিস্তানের মা'আরিফুল কুরআন নামক কুরআন ভিত্তিক অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব তাঁকে প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, একটানা এগারো বছর পর্যন্ত রেডিও পাকিস্তানে তাঁর এই দারস অব্যাহত থাকে। [১০]

৫. ১৩৭০ হিজরি মোতাবেক ১৯৫১ সালে করাচিতে তিনি 'দারুল উলুম করাচি' প্রতিষ্ঠা করেন। দারুল উলুম প্রতিষ্ঠার পর থেকে মৃত্যুর চার বছর পূর্ব পর্যন্ত তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের শায়খুল হাদিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৬. ১৯৬০ সাল থেকে প্রায় ১৫/১৬ বছর তিনি পাকিস্তানের গ্র্যান্ড মুফতি বা মুফতি-এ আযম হিসেবে অলিখিতভাবে দায়িত্ব পালন করেন । [১১]

৫. মুফতি সাহেবের অবদান ও রচনাবলী

মুসলিম উম্মার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনেক বিস্তৃত। দীনি ইলমের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও পাণ্ডিত্য ছিলো বিধায় মুসলিম উম্মার জন্য বিশেষ করে ইসলামি জ্ঞানভাণ্ডারে তাঁর অবদান অনেক। নিম্নে কিছু বিষয় সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

১. রেডিও পাকিস্তানে কুরআন ভিত্তিক অনুষ্ঠান পরিচালনা

২. ১৩৭০ হিজরি সালে দারুল উলুম করাচি প্রতিষ্ঠা, বর্তমানে দারুল উলুম করাচি আন্তর্জাতিক মানের একটি ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। পৃথিবীর প্রায় সবকটি দেশ থেকে ছাত্ররা এসে এখানে দীনি ইলম অর্জন করছে।

৩. ফাতওয়া দানের যোগ্য লোক তৈরির লক্ষ্যে এবং মুসলিম উম্মাহকে সঠিক দিকনির্দেশনা দান করার সুবৃহৎ উদ্দেশ্যে করাচি আগমন করার পরপরই দারুল ইফতা প্রতিষ্ঠা করেন। এতে শরয়ী বিষয়াদি নিয়ে ব্যাপক গবেষণার কাজ করা হতো। [১২]

৪. ১৩৭৯ সালে করাচি দারুল উলুমের অধীনে ফিকহ শাস্ত্র তাখাসসুস (ডিপ্লোমা) চালু করেন। ২ বছর মেয়াদী এ তাখাসসুস ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম তাঁর চিন্তাধারার ফসল। এতে তাঁর তত্ত্বাবধানে বহু মুফতি ও ফকীহ তৈরি হয়।[১৩]

---

০৯. ইসলামি বিশ্ব কোষ, খণ্ড : ২১, পৃষ্ঠা : ১৬৩।
১০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৬৩।
১১. ইসলামি বিশ্ব কোষ : খণ্ড - ২১, পৃষ্ঠা : ১৬৪।
১২. আল বালাগ, মুফতি আজাম, সংখ্যা - ১৩৯৯ হি., ইসলামি বিশ্ব কোষ, খণ্ড: ২১, পৃষ্ঠা : ১৬৪।

৫. করাচিতে বড় বড় মুফতি ও আলেমদের সমন্বয়ে তাঁর প্রচেষ্টায় একটি মজলিসে তা'লীম বা শিক্ষাবোর্ড গঠন করা হয়।[১৪] এতে শিক্ষা পদ্ধতিতে সংযোজন ও আধুনিকায়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়।
৬. কাদিয়ানী তৎপরতা রোধে তাঁর অবদান অসামান্য ও চিরস্মরণীয়। এ ব্যাপারে তিনি রচনা, বিতর্ক অনুষ্ঠানে যোগদান, সরাসরি বক্তব্য ইত্যাদি উপায়ে কাদিয়ানী ফেরকার অসারতা প্রমাণ করেন।
৭. ফাতওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সমকালীন বিশ্বে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। তাঁর লিখিত ফাতওয়ার সংখ্যা ৭৭,১৪৪। [১৫] তন্মধ্যে দারুল উলুম দেওবন্দে লিখিত ফাতওয়া সংখ্যা, ৩৬,০৮২ টি, বাকিগুলো করাচিতে।
৮. দারুল ইফতা থেকে লিখিত ও প্রেরিত তাঁর প্রদত্ত মৌখিক ফাতওয়ার সংখ্যা লিখিত ফাতওয়ার সংখ্যার দ্বিগুণ হবে। তাঁর অবদান গোটা ভারতবর্ষ তথা মুসলিম উম্মার জন্য বিশাল ও প্রশংসনীয়।
৯. দারুল উলুম দেওবন্দ ও দারুল উলুম করাচিতে তাঁর সুদীর্ঘ প্রায় আটচল্লিশ বছরের শিক্ষকতার আমলে উপমহাদেশের হাজার হাজার ছাত্র ইলমে দীন শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, বার্মা, আফগানিস্তান, ইরান, তুর্কিস্তান, বুখারা, সমরকন্দ ও আফ্রিকার অসংখ্য জ্ঞানপিপাসূ নিজেদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারিত করার সুযোগ লাভ করেছেন তাঁর কাছ থেকে।

খ. রচনাবলী

তিনি হাদিস, তাফসির, ফিক্‌হ ও অন্যান্য বিষয়ে বিপুল সংখ্যক তত্ত্ব ও তথ্যবহুল রচনা আমাদের উপহার দিয়েছেন এবং ইসলামি জ্ঞানজগতকে এর মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর রচিত ছোট-বড়ো বইয়ের সংখ্যা ইসলামি বিশ্বকোষে ১৬২ উল্লেখ করা হয়েছে। কেবল ফিকহ্ শাস্ত্রেই তার রচনার সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে ৯৫ টি। তবে এসবের বিস্তারিত কোনো বর্ণনা আসেনি।

০১. মা'আরিফুল কুরআন, ৮ খণ্ডে প্রকাশিত এবং বাংলায় ও ইংরেজি ভাষায় অনূদিত।
০২. জাওয়াহিরুল ফিকহ, ২ খণ্ডে প্রকাশিত
০৩. আহকামুল কুরআন, ২ খণ্ডে প্রকাশিত
০৪. আলাতে জাদিদাহ কি শরয়ী আহকাম
০৫. খতমে নবুয়ত, প্রকাশিত বই, ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক অনূদিত
০৬. মাকামে সাহাবা (সাহাবিদের মর্যাদা)
০৭. আদাবুল মাসাজেদ (মসজিদের শিষ্টাচার)
০৮. শহীদে কারবালা- এটি বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত বই
০৯. দো শহীদ- (two martyrs)
১০. মসীহ্ মাওউদ কি পাহচান
১১. হাদিয়াতুল মাহদিয়ীন

---

১৩. ইসলামি বিশ্ব কোষ, খণ্ড - ২১, পৃষ্ঠা : ১৬৪।
১৪. তার ফাতাওয়া সম্বলিত কোস সংকলন প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই, তবে এ বিষয়ে গবেষণা হওয়া অত্যন্ত জরুরি।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৬৪।

১২. ইসলাম কা নিজামে আরাদী। এই বইটি ইসলামে ভূমি ব্যবস্থা নামে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক অনূদিত হয়।
১৩. ইসলাম কা নিজামে তাকসীমে দাওলাত
১৪. ইমদাদুল মুফতিয়্যিন- ২ খণ্ডে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বই।
১৫. তাসবীর কি শরয়ী হায়সিয়াত- ফটোগ্রাফের শরয়ী মর্যাদা
১৬. ওয়াহ্দাতে উম্মাত (Unity of the Ummah)
১৭. ভোট ওয়া ভোটার কি শরয়ী হাইসিয়াত
১৮. মুসিবত কে বাদ রাহাত
১৯. সুন্নাত ওয়া বিদ'আত
২০. দারী সোশ্যালিজম ওয়া ইসলাম
২১. প্রভিডেন্ড ফান্ড পর যাকাত আওর সূদ
২২. বীমা যেন্দেগী (জীবন বীমা)

৬. প্রসিদ্ধ উসতাদ ও শাগরিদবৃন্দ

০১. তাঁর পিতা মাওলানা ইয়াসীন উসমানী, তিনি শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসানের সহপাঠী ছিলেন।
০২. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী [১৬]
০৩. মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী [১৭]
০৪. শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান [১৮]
০৫. মাও. মুফতি আযিযুর রহমান [১৯]
০৬. মাওলানা ই'যায আলী
০৭. আল্লামা মুফতি ইবরাহীম বালয়াবী
০৮. মাওলানা সাইয়্যেদ আসগর হুসাইন
০৯. মাওলানা মুহাম্মদ রসূল খান
১০. মাওলানা আরশাফ আলী থানবী রহ.-এর কাছেও তিনি নৈতিক শিক্ষা বা কথিত তাসাউফ শিক্ষা লাভ করেন। [২০]

খ. তার প্রসিদ্ধ শাগৃরিদগণ : তাঁর শাগরিদদের মধ্যে যারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন নিম্নে তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো-[২১]

০১. মাওলানা ইউসুফ বিন নুরী [২২]
০২. মাওলানা মসিহ উল্লাহ খান
০৩. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়া

---

১৬. ফয়েজুল বারী সহ বহু গ্রন্থ প্রণেতা।
১৭. তিনি সম্পর্কে তার ফুফাতো ভাই ছিলেন, ফতহুল মুলহিমের রচয়িতা ও পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ আলেমে দীন।
১৮. তাঁর কাছে মুফতি সাহেব বুখারির দারস গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তার হাতে সুফি কায়দায় বায়'আতও হয়ে থাকেন।
১৯. ১৩৪৯ এর আগে দারুল উলুমের মুফতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
২০. বিস্তারিত দেখুন : মা'আরিফুল কুরআনের ভূমিকা, ১ খণ্ড, পৃষ্ঠ: ১৪, ইসলামি বিশ্ব কোষ, খণ্ড: ২১, পৃষ্ঠা: ১৬৩।
২১. বিস্তারিত দেখুন - ইসলামি বিশ্বকোষ : ২১ পৃষ্ঠা : ১৬৩।
২২. তিনি জামেফায়ে বিন নুবিয়ার প্রতিষ্ঠা : মা'আরিফুস সুনানের রচয়িতা, প্রসিদ্ধ আলেমে দীন।

০৪. মাওলানা আব্দুল হক হাক্কানী
০৫. কারী ফাতহ মুহাম্মদ
০৬. মাওলানা সাঈদ আহমাদ আকবরাবাদী
০৭. মাওলানা সরফরায খান সাফদার
০৮. মাওলানা ইহতেশামুল হক থানবী
০৯. মুফতি রশিদ আহমদ লুধিয়ানবী
১০. মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (খতীবে আজম, বাংলাদেশ)
১১. মাওলানা মুসলেহুদ্দীন (কিশোরগঞ্জ)
১২. মাওলানা মুফতি মহীউদ্দিন (বড় কাটরা, ঢাকা)
১৩. মুফতি রাফি উছমানী
১৪. মুফতি মাওলানা তকী উছমানী, এদের অনেকেই বিশ্ববরেণ্য আলেমদের সারিতে দাঁড়ানোর যোগ্যতাসম্পন্ন।

৭. ব্যক্তিত্ব , বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা

মুফতি সাহেব অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। আদর্শিকভাবে তিনি ছিলেন অবিচল ও অনঢ়। তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই ছিলো যে, পূর্বসূরী মনীষীদের রুচি-প্রকৃতি তাঁর মধ্যে একান্ত হয়ে গিয়েছিল। দীনের সকল ক্ষেত্রে তিনি পূর্ববর্তী বুজুর্গদের অনুকরণ করাকে জরুরি মনে করতেন। তাঁর জীবনপদ্ধতি ছিলো অত্যন্ত সাধাসিধে, স্বল্পে তুষ্টি ছিলো তাঁর অন্যতম গুণ। পার্থিব সম্পদের মোহ তাঁর মধ্যে প্রবল ছিলো না। কলিকাতা আলিয়ায় ৭০০ টাকা বেতনে চাকুরির প্রস্তাব দেয়া হলেও দারুল উলুমে ৬০ টাকা বেতনে চাকুরি করেছেন। দারুল উলুম করাচি প্রতিষ্ঠার পর চার বছর কোনো বেতন গ্রহণ করেননি।

ব্যক্তিগত ইবাদত ছিলো তাঁর স্বভাবগত। রাত জেগে তিনি নামায, যিকির ও তেলাওয়াত করতেন। অধ্যয়ন ও গবেষণা ছিলো তাঁর আত্মতৃপ্তির উপকরণ। তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, দারুল উলুম দেওবন্দের সুবৃহৎ গ্রন্থাগারের প্রায় সকল গ্রন্থই তিনি অধ্যয়ন করেছেন। রাত বারটা-একটা পর্যন্ত তিনি নিরলস লেখনীর কাজ করতেন।

দায়িত্ব পালনে তিনি ছিলেন একজন সচেতন ব্যক্তি। কখনো দায়িত্ব অবহেলা করতেন না। তাই বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাকে অর্পণ করা হয়। তিনি ক্যালিওগ্রাফি, সুন্দর লিখন, বুক বাইন্ডিং ইত্যাদিতে দক্ষ ছিলেন।

৮. রাজনৈতিক অবস্থান

মুফতি সাহেব সমসাময়িক বেশিরভাগ আলেমদের মতো রাজনীতিতে পিছিয়ে ছিলেন না। ইসলামের নামে রাজনীতি থেকে তিনি নিরপেক্ষতা গ্রহণ করেননি।

১৯৪৫ সালে কলিকাতায় জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম গঠন করা হলে মুফতি সাহেব এর সদস্য হন। ১৩৬২/১৯৪৩ সালে মাওলানা থানবী রহ. এর পরামর্শক্রমে পাকিস্তান আন্দোলনে জড়িত হওয়ার জন্য তিনি শিক্ষকতার পদ থেকে ইস্তফা দেন।

একটি আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে পূর্ণ দুই বছর রাত-দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি পাকিস্তান অর্জনের পক্ষে জনমত গঠনে ব্যাপৃত থাকেন। এজন্যে তিনি মাদ্রাজ থেকে পেশোয়ার এবং পশ্চিমে করাচি পর্যন্ত সফর করেন।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর পাকিস্তানের জন্য একটি ইসলামি সংবিধানের রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী ও অন্য কয়েকজন নেতার আহ্বানে

মুফতি সাহেব দেওবন্দ ছেড়ে পাকিস্তানে গমনের সিদ্ধান্ত নেন। ১লা মে, ১৯৪৮ সালে কেবল ছোট ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীকে সাথে নিয়ে পাকিস্তানের উদ্দেশে রওয়ানা হন। ৬ মে, ১৯৪৮ পাকিস্তান পৌছেন। তখন থেকে তিনি করাচিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী রহ.-এর মৃত্যুর পর ১৯৫৩ সালে তিনি কেন্দ্রীয় জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি নিযুক্ত হন।

১৯৭০ সালেও তিনি পাকিস্তানের রাজনীতিতে সরাসরি ভূমিকা রাখেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভায় যোগদান করেন। তবে নির্বাচনোত্তর ফলাফলে তিনি নিরুৎসাহিত হয়ে নিজস্বভাবে দেশ ও জাতির খিদমতে নিয়োজিত হন। উল্লেখ্য যে, শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান রহ. মাল্টা হতে প্রত্যাবর্তনের পর 'তাহরিকে খিলাফত' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। মুফতি সাহেব এতেও যোগদান করেছিলেন। সুতরাং পাকিস্তানের পক্ষে তথা ইসলামের পক্ষে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান ছিলো সুস্পষ্ট।

৯. ইলমুত তাসাউফ

ছাত্র জীবনেই মুফতি সাহেব দেওবন্দ মাদরাসায় অধ্যয়নের পাশাপাশি শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেবের দারসে বসতেন। শরিয়তের জ্ঞানের পাশাপাশি সুফি দর্শনে স্বীকৃত বাতেনী বা আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতিও তাঁর মনযোগ ছিলো। [২৩] শায়খুল হিন্দ রহ. মাল্টা থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর তিনি তাঁর হাতে বায়'আত হন। তাঁর মৃত্যুর পর পুনরায় মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এর হাতে বায়আত হন। ১৩৩৯ হিজরি সালে মুফতি সাহেব সূফি দর্শনানুসারে মাওলানা থানবী রহ. এর খেলাফত ও ইজাযত লাভ করেন।[২৪]

১০. দৃষ্টিভংগি

দৃষ্টিভংগি ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব ও আন্তরিক বিষয়। তারপরও প্রত্যেক গবেষক ও লেখক তার লেখনির মাধ্যমে স্বীয় মতাদর্শ ও দৃষ্টিভংগির প্রকাশ করে থাকেন। মুফতি সাহেবের শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবন যেহেতু দারুল উলুম দেওবন্দের পরিধিতে সীমাবদ্ধ ছিলো সেহেতু বলা যায়, দেওবন্দের দৃষ্টিভংগিতে তিনি প্রভাবিত ছিলেন।

১১. সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন

মুফতি সাহেবের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা নয়জন। এদের মধ্যে পাঁচজন পুত্র সন্তান, চারজন কন্যা। পুত্ররা হলেন-

০১. মাওলানা যাকী কায়ফী
০২. মাওলানা মুহাম্মদ রাদী
০৩. ওয়ালী রাবী- এম,এ
০৪. মাওলানা মুফতি রাফী ওসমানী, দারুল উলুম করাচির শিক্ষক ও পরিচালক ছিলেন।
০৫. মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ তকী উছমানী।[২৫] এমএ,এলএলবি, দারুল উলুম করাচির মহাপরিচালক, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের শরিয়ত আদালত। মাসিক আল বালাগের সম্পাদক।

---

২৩. আল কুরআনুল কারিম ও সহিহ হাদিসের আলোকে এ ধরনের কোনো শিক্ষার ভিত্তি মেলে না। বিস্তারিত দেখুন - আল মুনকিব মিনাদ দালাল, পৃষ্ঠা : ১৮।

২৪. ইসলাম বিশ্বকোষ খণ্ড : ২১ পৃষ্ঠা ১৬৪।

২৫. আরবিতে বহু গবেষণাধর্মী গ্রন্থের প্রণেতা, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আলেমে দীন। মুফতি সাহেব নিজেই তাকে গবেষণার কাজে নিয়োগ করেন। বিশ্বকোষ- ২১, পৃষ্ঠা : ১৬৫

মেয়েরা হচ্ছের মুহতারামা নাঈমা, আতীকাহ, হাসিবা ও রাকিবাহ। সন্তানদেরকে তিনি সত্যিকার উত্তরসুরি হিসেবে গঠন করেছিলেন। তার সন্তানরাও অমর কীর্তি সম্পাদনে সচেষ্ট আছেন।

'মাআরিফুল কুরআন' পরিচিতি

মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব উর্দু ভাষায় তফসির মাআরিফুল কুরআন সংকলন করেন। আনুমানিক ১৩৭৫ হিজরি থেকে ১৩৯২ হিজরির ২১ শাবান পর্যন্ত প্রায় ১৭ বছর এ তাফসির সংকলনে সময় লাগে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১৩৯০ হিজরি নাগাদ এর ১৩ টি পারার ভাষ্য লেখা সমাপ্ত হয়। কিন্তু সুদীর্ঘ রোগভোগ, বার্ধক্যের জড়তা এবং দেশের প্রতিকূল পরিস্থিতি উপেক্ষা করেই আল্লাহর অসীম রহমতে ১৩৯২ হিজরি ২১ শা'বান তারিখে মা'আরিফুল কুরআন লেখার কাজ সমাপ্ত হয়।[২৬] এটি উর্দু ভাষায় আট খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

মাসিক মদিনার সম্পাদক বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা মহিউদ্দিন খান বাংলা ভাষায় এর অনুবাদ করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮০ সালে এর প্রথম প্রকাশ করেন।

তাফসিরে মা'আরিফুল কুরআনের রচনা প্রসঙ্গে লেখক নিজেই বলেন, হাকীমুল উম্মাত থানবী রহ. রচিত 'বয়ানুল কুরআন'-কে আরও সহজ ভাষায় এ যুগের মানুষের মেধা ও সাধারণ পাঠকগণের চাহিদা অনুযায়ী সহজবোধ্য করে পেশ করার আরজু মনে মনে পোষণ করে আসছিলাম। আল্লাহর শোকর যে, মা'আরিফুল কুরআনের মাধ্যমে সেই আরজু তিনি পূর্ণ করে দিয়েছেন। কেনোনা এ তাফসির প্রধানত থানবী রহ.-এর বায়ানুল কুরআনকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে।[২৭]

ক. তাফসিরটির ধারাবাহিকতা

মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব তাঁর এ তাফসিরে সুন্দরতম ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন। এতে তিনি প্রথমে কুরআনের আয়াতের সাবলীল তরজমা করেন (আক্ষরিক নয়), তারপর উৎকলিত আয়াতগুলোর যোগসূত্র তুলে ধরেন। এরপর তাফসিরের সারসংক্ষেপ আলোচনা করেন। এটি الإجمالي المعنى এর মতো আয়াতগুলোর আলোচ্য বিষয়কে সাবলীল ভাষায় ফুটিয়ে তোলে। তারপর معارف বা আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় আয়াতের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী তুলে ধরেছেন, এরপর আয়াতে উল্লেখিত অথবা ইঙ্গিত প্রদত্ত مسائل (মাসাইল) একটি একটি করে আলোচনা করেছেন। কখনো কখনো সারকথা বা সারাংশ উল্লেখের মাধ্যমে তাফসিরের সমাপ্তি টেনেছেন।[২৮] মূলত তাফসির পেশ ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এ ধরনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করলে তাফসির বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পাঠকদের জন্য সহজ হয়।

সূরার শুরুতে নামকরণ, আয়াত সংখ্যা, নাযিলের সময়কাল ও সূরার ফযিলত তুলে ধরেছেন।[২৯] তবে এ ক্ষেত্রে সমগ্র তাফসিরে এক নিয়মের অনুসরণ করতে পারেননি।[৩০]

---

২৬. তাফসিরের ভূমিকা : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা : ১৬।
২৭. তাফসিরের ভূমিকা : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা : ৫৭।
২৮. তাফসির মা'আরিফুল কুরআন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা : ১৬১-১৫৮।
২৯. তাফসির মা'আরিফুল কুরআন (১/৯৩-৯৪)।

খ. তাফসিরের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব

০১. আয়াতের তরজমা বা অনুবাদের ক্ষেত্রে এ তাফসিরে সরাসরি শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান রহ. -এর তরজমার অনুসরণ করা হয়। তবে এক্ষেত্রে শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ.-এর দুই সন্তান শাহ রফীউদ্দীন ও শাহ আবদুল কাদের রহ.-এর অনুবাদের সহায়তা নেয়া হয়।

০২. মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এর তাফসিরে বায়ানুল কুরআনের সহজ সংকলন হিসেবে আয়াতের অনুবাদ দিয়ে তাফসিরের সারসংক্ষেপ পেশ করা হয়। এতে বায়ানুল কুরআনের আলোচ্য বিষয় সরাসরি চলে আসে।[৩১]

০৩. মা'আরেফ ও মাসায়েল সংযোজন। এতে ফিকহ সম্পর্কিত মাসলা মাসায়েল বর্ণনা করে কুরআনের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে সহজ ধারণা দেয়া হয়।

০৪. এক্ষেত্রে বেশিরভাগ মাসায়েল তিনি জাসসাসের আহকামুল কুরআন ও কুরতুবি-এর আলজামে' লিআহকামিল কুরআন থেকে সংকলন করেছেন।

০৫. মুফাসসির তার তাফসিরে পূর্বসূরীদের বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

০৬. আধুনিক মাসায়েলের ক্ষেত্রে সমসাময়িক উলামায়ে কিরামের সাথে মতবিনিময় করে সঠিক সিদ্ধান্ত পেশ করা হয়েছে। জবাব যাতে যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে।[৩২]

০৭. তাফসিরে সাধারণ পাঠকগণের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে শব্দের ব্যাখ্যা, ব্যাকরণের জটিল বিশ্লেষণ পরিহার করা হয়েছে।

০৮. এতে এমন সব তথ্য ও আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে যা পাঠ করলে কুরআনের মাহাত্ম্য ও রসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য বৃদ্ধি পায়, কুরআনের শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং আমল করার আগ্রহ জাগে।[৩৩]

০৯. এ তাফসির পাঠের মাধ্যমে তাফসিরে বায়ানুল কুরআন, শায়খুল হিন্দের তরজমা ও তাফসিরে বদরে আলম মিরাঠিও পড়া হয়ে যায়, যেহেতু এতে এসব তাফসিরে সার সংকলিত আছে।

১০. আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবে সৃষ্ট নতুন নতুন সমস্যা এবং এ যুগের ইহুদী-খৃস্টান ও প্রাচ্যবিদদের দ্বারা সৃষ্ট যেসব প্রশ্ন মুসলিমদের মনে নানা সংশয়-সন্দেহের সৃষ্টি করে এসব প্রশ্নের জবাব রসূলুল্লাহ সা.-এর শিক্ষার আলোকে এ তাফসিরে তুলে ধরা হয়েছে।

৩. সংকলন পদ্ধতি

মা'আরিফুল কুরআনের সংকলন পদ্ধতি ও নিয়মাবলীর ব্যাপারে মুফতি সাহেব ভূমিকাতে কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। তারপরও তাফসিরের বিস্তারিত পর্যালোচনার আলোকে এর সংকলনের নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো উল্লেখ করা যায়।

১. তাফসিরের মূল উৎস হিসেবে তিনি ছয়টি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন।

ক. কুরআনের মাধ্যমে কুরআনের তাফসির করা।

---

৩০. দেখুন তাফসির (২/২৫৭-৯)।
৩১. দেখুন তাফসিরের ভূমিকা (১/৫৮)।
৩২. প্রাগুক্ত : (১/৬০)।
৩৩. তাফসিরের ভূমিকা, খণ্ড :১, পৃ : ৫৯।

খ. হাদিসের মাধ্যমে কুরআনের তাফসির : তবে এক্ষেত্রে যাচাই বাছাই এর ব্যাপার রয়েছে। তার মতে যে কোনো হাদিস পেলেই তার আলোকে কুরআনের কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা স্থির করে ফেলা যথার্থ নয়।[৩৪]

গ. সাহাবিগণের বক্তব্যের মাধ্যমে কুরআনের তাফসির : রসূলুল্লাহ সা. এর সাহাবিগণ কুরআন নাযিলের গোটা পরিবেশ ও পটভূমি প্রত্যক্ষ করেছেন বিধায় কুরআনুল কারিমের তাফসিরের বেলায় তাদের বক্তব্য যতোটুকু প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য হবে পরবর্তীদের কথা ততোটুকু হবে না। তাই যেসব ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিস থেকে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না সেসব ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যই হচ্ছে সঠিক তাফসির।[৩৫]

ঘ. তাবেয়ীদের বক্তব্য : সাহাবিদের পরবর্তী মর্যাদা হলো তাবেয়ীদের। তাবেয়ীদের বক্তব্য তাফসিরের ক্ষেত্রে দলিল হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য থাকলেও তাদের বক্তব্যের গুরুত্বের ব্যাপারে কেউ মতভেদ করেনি।[৩৬]

ঙ. আরবি সাহিত্য[৩৭] : কুরআনের কিছু আয়াতের তাফসির কেবল আরবি সাহিত্যের ভাবধারা অবলম্বনেই করা হয়।

চ. চিন্তা-গবেষণা ও উদ্ভাবন[৩৮] : কুরআনের ক্ষেত্রে যতোই চিন্তা-গবেষণা করা হবে ততোই নিত্য নতুন রহস্যাবলী কুরআন থেকে উদঘাটিত হবে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, পূর্বে উল্লেখিত পাঁচটি উৎসের সাথে তা সাংঘর্ষিক হতে পারবে না।

১. হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি সুস্পষ্ট কোনো নিয়ম উল্লেখ করেননি। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, হাদিসে আছে, হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে ইত্যাদি বক্তব্যের মাধ্যমে হাদিস বর্ণনা করেছেন।[৩৯]

২. ইসরাঈলী বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি হাফেয ইবনে কাসীরের নীতির অনুসরণ করেছেন।[৪০] তিনি মনে করেন এ জাতীয় রেওয়ায়াত উল্লেখ করা বৈধ, তবে এতে কোনো প্রকার ফায়দা নেই।[৪১]

৪. তাফসিরের উল্লেখযোগ্য প্রশংসনীয় দিকসমূহ

১. এতে আধুনিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমাধান পেশ করা হয়। যেমন : দ্বিজাতিতত্ত্ব,[৪২] সৌর ও চান্দ্র বছরের হিসাব,[৪৩] ঔষধ হিসেবে হারাম বস্তুর ব্যবহার[৪৪], পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলামি শূরানীতির পার্থক্য[৪৫] ইত্যাদি।

---

৩৪. প্রাগুক্ত : পৃ : ৪৯।
৩৫. প্রাগুক্ত : পৃ : ৪৯, এই নীতিতে মুফতি সাহেব অবিচল থাকতে পারেননি।
৩৬. প্রাগুক্ত : পৃ : ৫০।
৩৭. আরবি সাহিত্য না বলে আরবি ভাষা বললে সঠিক ও উত্তম হতো।
৩৮. চিন্তা-গবেষণাকে ইতোপূর্বে কেউ কুরআন তাফসিরের উৎস হিসেবে উল্লেখ করেছেন তা আমার জানা নেই। তবে কুরআন বুঝা ও উপলব্দির জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।
৩৯. তাফসির মা'আরেফুল কুরআন : (১/৩২৮, ৩৬৯)।
৪০. তাফসির ইবনে কাসির : (১/১৮)।
৪১. তাফসিরের ভূমিকা, খণ্ড : ১, পৃ : ৫১।
৪২. তাফসির মা'আরিফুল কুরআন (সংক্ষেপিত) পৃ: ৩৯২।
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ : ৩৯৮।
৪৪. তাফসির মা'আরিফুল কুরআন, খণ্ড: ১, পৃ: ৪০০-৪০১।

২. এতে কুরআনের মাসায়েলসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করায় তাফসিরুল কুরআনের পাশাপাশি আহকামুল কুরআনও সহজে জানার সুযোগ হয়।[৪৬]

৩. সাধারণ পাঠকদের বোধগোম্যতা ও ধীশক্তির বাইরে জটিল ও সূক্ষ্ম কোনো বিষয় এতে আলোচনা না করায় তাফসিরটি সহজ ও বোধগোম্য হয়েছে।

৪. অপ্রাসঙ্গিক গল্প ও কিস্‌সা না থাকায় এ তাফসিরখানি মৌলিকত্ব পেয়েছে। এর বেশিরভাগ আলোচনাই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়।

৫. সমালোচনামূলক বিষয়সমূহ

গোটা তাফসিরে এক ও অভিন্ন নিয়মের অনুসরণ করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তুলে ধরা যায়।

১. হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে এক নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি। এতে প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডের মাঝে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

২. সূরার শুরুতে কখনো নামকরণসহ বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, কখনো উল্লেখ করা হয়নি।

৩. আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা হয়নি। কখনো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, কখনো একেবারে সংক্ষেপ করা হয়েছে।[৪৭]

২. ফিকহি মাসায়েলের ক্ষেত্রে বিভ্রাট :

০১. শিশুদের দুগ্ধদান প্রসংগে বলেন : "এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, স্তন্যদানের সময়সীমা দু'বছর ঠিক করা হয়েছে। এরপর মাতৃস্তনের দুধ পান করানো চলবে না তবে কুরআনের কোনো কোনো আয়াত এবং হাদিসের আলোকে ইমাম আবু হানিফা রহ. শিশুর দুর্বলতার ক্ষেত্রে ত্রিশ মাস বা আড়াই বছর পর্যন্ত এ সময়সীমাকে বর্ধিত করেছেন। আড়াই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিশুকে মাতৃস্তনের দুধ পান করানো সকলের ঐকমত্যে হারাম।[৪৮]

০২. জামায়াতে নামায প্রসংগে বলেন : এসব রেওয়ায়াত জামায়াত ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তাগণের স্বপক্ষে দলিল। কিন্তু অধিকাংশ উলামা, ফুকাহা সাহাবা ও তাবেঈনের মতে জামায়াত হলো সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, কিন্তু ফজরের সুন্নাতের ন্যায় সর্বাধিক তাকিদপূর্ণ সুন্নাত।[৪৯]

০৩. ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখা ফরয, এবং বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম, এ প্রসংগে বলেন: মুজতাহিদ ইমামগণ নিজ নিজ ইজতেহাদ দ্বারা বিধান বর্ণনা করেছেন এবং এতে মতাদর্শের বিভিন্নতার কারণে পরস্পরের মধ্যে মতভেদও হয়েছে। এ ধরনের মতভেদ রসূলুল্লাহ সা.-এর আমল থেকে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হয়ে আসছে এবং এটা যে উম্মাতের জন্য রহমতস্বরূপ এ বিষয়ে ফিকহবিদগণ একমত।[৫০]

---

৪৫. প্রাগুক্ত : খণ্ড : ১, পৃ : ১৭২।
৪৬. উদাহরণ হিসেবে দেখুন (১/৫৪৭, ৫৪৮, ৬/২২৮, ২/৩৬৩, ৩৬৪)।
৪৭. দেখুন তাফসির মা'আরেফুল কুরআন : (১/৫২৩, ১/২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯)।
৪৮. তাফসির মা'আরিফুল কুরআন, খণ্ড : ১, পৃ : (৫৪৭-৫৪৮) কাদের ঐকমত্যে হারাম ? এ বক্তব্য স্পষ্ট নয়। হানাফিদের প্রায় সকল কিতাবে এটাকে জায়েয বলা হয়েছে। দেখুন: আল মাবসূত, সারাখসি (৬/৩৭৫) বাদায়েউস সানায়ে' (৮/১০৮), তাবয়িনুল হাকায়েক: (৬/১১৫) আল এ'নায়াহ (৫/১৩২)।
৪৯. তাফসির মা'আরিফুল কুরআন (১/২০০)।
৫০. তাফসির মা'আরিফুল কুরআন (স) পৃ : ১২১২।

৬. সমকালীন তাফসিরের মাঝে মা'আরিফুল কুরআনের স্থান

চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত তাফসিরগুলো হচ্ছে[৫১]

০১. জামেউত তাফসির, নবাব কুতুবুদ্দীন খান দেহলবী রচিত। তাফসিরের ভাষা উর্দু।
০২. ফাতহুল বায়ান: নবাব সিদ্দিক হাসান খান কণৌজী রচিত। তাফসিরের ভাষা আরবি।
০৩. গায়াতুল বায়ান ফি তা'বীলিল কুরআন: এটি মুহাম্মাদ হাসান আমতহীর রচনা
০৪. ফাতহুল মান্নান : মাওলানা আব্দুল হক দেহলবী রচিত। এটি উর্দু ভাষায় ৮ খণ্ডবিশিষ্ট। তাফসিরে হাক্কানী নামেও এটি পরিচিত
০৫. তাফসিরে ওহিদী : মওলবী ওয়াহীদুজ্জামান জং হায়দারাবাদী, এটি রচনা করেন।
০৬. তরজুমানুল কুরআন : মাওলানা আবুল কালাম আযাদ রচিত। দুই খণ্ড
০৭. বায়ানুল কুরআন : মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রচিত
০৮. তাহকীকুল বায়ান : শেখ আব্দুল হাদি বুখারি রচিত।
০৯. তাফসিরে মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরি
১০. তাফসিরে ব্রেলবী : আহমদ রেজা খান ব্রেলবী রচিত।
১১. তাফহীমুল কুরআন : মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী রচিত।
১২. মা'আরিফুল কুরআন : মুফতি মুহাম্মদ শফী রচিত।

এসব তাফসিরের মাঝে আরব বিশ্বে কানৌজী সাহেবের ফাতহুল বায়ান সুপরিচিত ও বহুল প্রচলিত। তবে তাফসিরটি ইমাম শাওকানী -এর ফাতহুল কাদীরের প্রায় হুবহু নকল বলে মৌলিকত্ব পায়নি।

তাফসির মা'আরিফুল কুরআন একটি প্রসিদ্ধ তাফসির। প্রথমে বায়ানুল কুরআনের পরিচিত থাকলেও পরবর্তীতে মা'আরিফুল কুরআন বহুল পরিচিতি লাভ করে। বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ তাফসিরগুলোর শুরুতেই এর নাম থাকবে। পাঠক সংখ্যার দিক থেকে তাফহীমুল কুরআনের পরেই এর স্থান।

খেলাফতের ব্যাপারে তাঁর উপস্থাপনা, [৫২] সুদ সম্পর্কে তাঁর আলোচনা,[৫৩] ভোট সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য[৫৪] পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলামি শূরা নীতির[৫৫] ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য মাওলানা মওদূদী রহ.-এর বক্তব্যের মধ্যে তেমন তফাৎ নেই। তবে কিছু মৌলিক ক্ষেত্রে এ দুই তাফসিরের মাঝে তফাত রয়েছে। যেমন মাওলানা মওদূদী রহ. তিন পর্যায়ে শ্রেণী বিন্যাসকৃত সুফিবাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের সূফীবাদের অসারতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। পক্ষান্তরে মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব এতে জীবন্ত মাছের মতো গভীরে প্রবেশ করেছেন।

---

৫১. এখানে কেবলমাত্র ভারত বর্ষের তাফসিরগুলো উল্লেখ করা হয়েছে দেখুন : তাফসির সাহিত্যের ইতিহাস পৃ : ৬১-৬৪, তাফসিরের বুৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পৃ : ৬১।
৫২. মা'আরিফুল কুরআন : (১/১৮৬)।
৫৩. প্রাগুক্ত : (১/৬১০-৬২৭)।
৫৪. প্রাগুক্ত :
৫৫. মা'আরিফুল কুরআন (১/১৭২)।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি, মুসলিম উম্মাহ মুফতি সাহেবের এ বিশাল ও অসাধারণ অবদানের জন্য তাঁর কাছে ঋণী। তিনি তাঁর রচিত তাফসির মা'আরিফুল কুরআনের মাধ্যমে উম্মাহকে সত্য, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও হেদায়াতের দিকে দিকনির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ চেষ্টা বহুলাংশে গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত। তাঁর রেখে যাওয়া অবদান উম্মাহ্র কাছে অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র :

১. আল কুরআনুল কারীম।
২. তাফসির মা'আরিফুল কুরআন, মুফতি মুহাম্মদ শফী (উর্দু) করাচি, পাকিস্তান, ১৪০৫ হিজরি।
৩. তাফসির মা'আরিফুল কুরআন : অনূদিত, মাওলানা মহিউদ্দিন খান, (বাংলা) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭।
৪. তাফসির মা'আরিফুল কুরআন : সংক্ষেপিত, মাওলানা মহিউদ্দিন খান। কিং ফাহদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, সাউদি আরব।
৫. তাফসির নূরুল কুরআন : মাওলানা আমীনুল ইসলাম, ঢাকা বাংলাদেশ, ১৯৮৪।
৬. ইসলামি বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা- ২০০৫।
৭. তাফসির সাহিত্যের ইতিহাসঃ ড. আব্দুল ওয়াহিদ অনূদিত, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০২।
৮. আল মুনকিয মিনাদ্ দালাল, আবু হামেদ আল গাযালী, কায়রো, মিসর ১৯৮৩।
৯. উর্দু দায়েরা মাআরিফ ইসলামিয়া- পাকিস্তান ২০০৫।

***

তাফহীমুল কুরআন : একটি বিপ্লবী তাফসির

প্রফেসর খুরশীদ আহমদ

ভূমিকা: তাফহীমুল কুরআনের উপর সমালোচনা সাহিত্য হিসেবে লিখিত 'এক কিতাবে ইনকিলাব' (একটি বিপ্লবী তাফসির গ্রন্থ) অধ্যাপক খুরশীদ আহমদের একটি অনবদ্য সমালোচনা সাহিত্য। আধুনিক উর্দু সমালোচনা সাহিত্যেও বইটির অবদান অপরিসীম। একটি তাফসির গ্রন্থ একজন বোদ্ধা পাঠক কতো গভীরভাবে পড়তে পারেন, সেখান থেকে তিনি কিভাবে উপকৃত হয়েছেন, হেদায়েতের মহাগ্রন্থ কিভাবে সেই উঠতি এক কিশোর নওজওয়ানকে বর্তমান বিশ্বের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদ এবং প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ হিসেবে স্বীকৃতি পেতে, অন্যদিকে ইসলামি ছাত্র আন্দোলনের নেতা থেকে পাকিস্তানের উচ্চ পরিষদ তথা সিনেট সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কিভাবে তাফহীমুল কুরআন তার সাহিত্যে রস সঞ্চার করেছে তা উদ্ধৃত হয়েছে এ গ্রন্থে। মূলত এ তাফসির পদে পদে কিভাবে সাহায্য করেছে তাঁকে, তাই আলোচিত হয়েছে এখানে। (অনুবাদক)

সূচনা: তাফহীমুল কুরআনের সাথে আমার সম্পর্কটা এমন যেমন সম্পর্ক একজন ওস্তাদ ও শাগরিদের মধ্যে হয়ে থাকে কিংবা একজন পথিকের সাথে হয় পথপ্রদর্শকের। আমি ছত্রে ছত্রে এই তাফসির অধ্যয়ন করেছি, প্রতিটি লাইন মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আমার চিন্তায় আমার কর্মে তাফহীম আমার আংগুল ধরে রাহবরী করেছে। এমন একটি কিতাবের ব্যাপারে এমন এক ব্যক্তি যা কিছুই বলুক বা কামনা করুক না কেনো তার সাথে পারিভাষিক সমালোচনা বা আলোচনার কোনো সম্পর্ক নেই। যেভাবে একজন ব্যক্তি নিজের কথা নিজে লিখতে পারে না অথবা লিখতে গেলে হয়ে যায় স্বগতোক্তি; তাই আমি বলবো, আমিও এই তাফসির গ্রন্থের ব্যাপারে প্রথাগত সমালোচক হতে পারিনি, যার সাহায্যে আমি চিন্তা করবার পদ্ধতিগুলো শিখেছি। এ তাফসির আমার জীবনের ধারাকে পাল্টে দিয়ে নতুন পথে মূল ধারার সাথে মিলিত হয়ে পথ চলতে সিদ্ধান্তকর ভূমিকা পালন করেছে।

সূচনাভাগের নিবেদনের সাথে সাথে আমি এটাও বলতে চাই, বরং জোরের সাথেই বলছি, একজন ওস্তাদের সঠিক নিরীক্ষক, পর্যালোচক ও মূল্যায়নকারী তার ছাত্রই হতে পারে, বরং হয়েও থাকে। এভাবে হয়তো আমিও সেই অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে একজন যাদের জীবনে এই তাফসির বিপ্লবের জোয়ার আনার মাধ্যম হয়েছিলো। যদি এর মূল্যায়ন করি, এর গুরুত্ব, প্রভাব ও মর্যাদার বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করি তাহলে সেটা নিরর্থক হবে না। অত:পর শাগরিদ যদি জীবনে কোনো না কোনো পর্যায়ে গিয়ে অথবা জীবনের অন্যান্য পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন 'ওস্তাদের' সংস্পর্শে এসে থাকে এবং একজন একনিষ্ঠ ছাত্র হিসেবে সে যদি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ওস্তাদের মর্যাদা ও অবস্থান বিশ্লেষণ করবার যোগ্যতা অর্জন করে থাকে, তাহলে শাগরিদের সাক্ষ্য দ্বারা ওস্তাদের মর্যাদা অনুধাবন করতে কিছু না কিছু সাহায্য তো মিলতেই পারে। আজ এখানে এমনি এক ছাত্র তার ওস্তাদের ব্যাপারে কথা বলছে এবং স্বত:স্ফুর্তভাবে এসব কথা বলতে অনেকটা বাধ্য হচ্ছে।

তাফসির সাহিত্য ইসলামি চিন্তাধারার প্রথম নয়ন: মুসলিম উম্মাহ্‌র জীবন পবিত্র কুরআনের বন্ধনে আবদ্ধ। মুসলিম উম্মাহ্‌র উন্মেষ ঘটিয়েছে এই কুরআন, তার উত্থান, ক্রমবিকাশ এবং উন্নতির শিখরে আরোহণেও চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে কুরআন। মুসলিম উম্মাহ্‌র কিশতী চালানোর চালিকাশক্তি যেমন রয়েছে কুরআনে তেমনি আছে দাড়ি হাতে সারি গানের কাণ্ডারী। এই কুরআন উম্মাহ্‌র বিশেষ মেজাজের ধারক হয়েছে এবং এই কিতাবই তাকে প্রত্যেক যুগে প্রতি পদক্ষেপে যাবতীয় সমস্যার আবর্ত থেকে বের হয়ে আসতে শিখিয়েছে। কুরআন মুসলিম জাতির জন্য শুধুই একটি ধর্মগ্রন্থ নয়, বরং এ কুরআন এ জাতির জীবনের প্রাণশক্তি। কুরআনের মর্যাদা এ জাতির অন্তরে অন্তরাত্মার মতো, এ যেনো হৃদপিণ্ড অথবা হৃদয়ের প্রাণস্পন্দন। যতোক্ষণ কুরআন সক্রিয় আছে, জাতি আছে জীবন্ত। কুরআন ছাড়া এই মুসলিম জাতির জীবিত থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই।

পবিত্র কুরআনের এই মৌলিক গুরুত্ব আরো একটি বিষয় আমাদের সামনে পরিষ্কার করে দেয়। তাহলো, প্রত্যেক যুগে মুসলমানদের সর্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও মেধাশক্তি এই কিতাবকে বুঝাবার জন্য এবং বর্ণনা করবার দাবি পূরণের জন্য কেন ব্যয়িত হলো। মুসলিম মনীষী এবং জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণের জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষা ও জ্ঞানচর্চার অন্যতম ক্ষেত্র ছিলো কুরআনের মর্মকথা অনুধাবন এবং তাফসির সাহিত্য রচনা। এদিক থেকে বিবেচনা করলে মুসলিম মানসে চিন্তার প্রথম নয়ন তাফসির সাহিত্য রচনা। তাফসির সাহিত্যের অবদানের বিষয় বিবেচনা করতে গেলে প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক এলাকাতে এক্ষেত্রে কীর্তিমান গুণীজনের সাক্ষাত মিলবে। ইসলামের ইতিহাসে যতো চেষ্টা-সাধনা এবং গবেষণা তাফসির সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে হয়েছে, তা নি:সন্দেহে অন্য কোনো ক্ষেত্রে হয়নি। পবিত্র কুরআনের সম্পর্ক জীবনের প্রতিটি বিষয়ের সাথে। এজন্য পবিত্র কুরআনের তাফসির ইসলামি চিন্তাধারার আকর। তাফসির সাহিত্যের মধ্যে চিন্তার গভীরতা, বিশালতা ও ব্যাপকতার সমন্বিত সমাবেশ লক্ষ করা যায়। পবিত্র কুরআনের তাফসির রচনা মুসলিম জাতির এমন এক অনন্য জ্ঞানচর্চার মনুমেন্ট যা বিশ্বের অন্য কোনো জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায় না।

কেবলমাত্র আরবী ভাষাতেই কুরআনের বারো শতাধিক প্রকাশিত তাফসির পাওয়া যায়; অন্যদিকে অপ্রকাশিত তাফসির যে কতো সংখ্যক হবে তা শুমার করা অসম্ভব। উর্দু ভাষায় আড়াই শত পরিপূর্ণ সমাপ্ত তরজমা ও তাফসির পাওয়া যায় এবং সাড়ে তিন শত অসম্পূর্ণ তরজমা ও তাফসির বিদ্যমান। পৃথিবীতে এমন কোনো ভাষা নেই যে ভাষাভাষীদের মাঝে মুসলমান থাকবার পরও তাদের সাহিত্য তাফসিরে কুরআন হতে বঞ্চিত।

তাফসিরে কুরআনের সূচনা হয়েছিল কুরআন নাযিলের অব্যবহিত পর থেকেই। আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন তা দু'টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ।

এক: কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ কুরআন এবং

দুই : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যাঁর মহান সত্তার উপর আসমানী কিতাব আল-কুরআন নাযিল হয়েছে।

হেদায়েত ও পথ প্রদর্শনের এই চিরায়ত পদ্ধতি হযরত আদম আ: থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত চলেছে। এই ইলাহী পদ্ধতি মোতাবেক নবী করীম সা. মানবজাতিকে যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং পথ প্রদর্শন করেছেন তা নিম্নরূপ :

ক. আয়াতসমূহ তেলাওয়াত : অর্থাৎ কুরআন পাক যেভাবে তাঁর উপর ন্যাযিল হয়েছে তা আল্লাহর বান্দাহগণকে শুনানো এবং অহিলব্ধ জ্ঞানকে তার অবিকল রূপে মানবজাতির নিকট পৌঁছানো।

খ. হুকুমসমূহ তামিল : আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াত অনুযায়ী তিনি নিজে আমল করেছেন এবং মানুষের নিকট একটি অনুকরণীয় নমুনা পেশ করেছেন। এই নমুনা সামনে রেখে রসূলুল্লাহ সা.-এর আনুগত্য করে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে।

গ. আয়াতসমূহের শিক্ষা প্রদান এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ: অর্থাৎ কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। আল্লাহর বান্দাদের নিকট কুরআনের নিগূঢ় তাৎপর্য ও মূল বক্তব্য তুলে ধরা। রসূলুল্লাহ সা. কুরআনের প্রাথমিক শ্রোতাদের ভুল ধারণা ও অন্তরলোকে উত্থিত নানা ধরনের সংশয়ের অপনোদন করেছেন, তাদেরকে আলকুরআনের আলোকে সুশিক্ষিত করে তুলেছেন। তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আমলী আচরণগত জটিলতা নিরসন করেছেন, তাদের হৃদয়ে প্রশান্তির আয়োজন করেছেন, তাদেরকে এই কিতাবের এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দাবিসমূহের, এই কুরআন প্রদত্ত কর্মসূচী ও সংশোধন পদ্ধতির, এই কুরআনের আলোকিত জীবনদর্শনের এবং কুরআনী জীবন বিধানের এক একজন সেনানীতে রূপান্তরিত করেছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত তিনটি কাজ আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। তিনি কুরআনের দাওয়াতকে সম্প্রসারিত করেছেন এবং একটি বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন যে আন্দোলনের কথা কুরআন বলে। পবিত্র কুরআনের পথে চালিত করে নবী করীম সা. ব্যক্তিগত জীবন এবং সামাজিক পরিমণ্ডলের চেহারাই বদলে ফেলেন। ইসলামি সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে তিনি ইতিহাসের সেই নবযুগের সূচনা করেন, যেজন্য হেরা গুহায় নূরের সেই কিরণ বিকিরণ শুরু হয়েছিলো। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সা. যা কিছু করেছেন এরই নাম কুরআনের তাফসির।

পরবর্তী যুগে এবং যুগসমূহে তাফসির সাহিত্য বিষয়ক যেসব কাজ হয়েছে, তার সবই রসূলুল্লাহ সা. প্রদত্ত তা'বীল ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আলোকেই করা হয়েছে। মৌলিকভাবে সকল তাফসির সাহিত্য রচয়িতাগণ নিম্নোক্ত তিনটি দৃষ্টিভংগীর আলোকে কাজ করে গেছেন:

এক: এটা পরিষ্কারভাবে উত্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সা. এবং তাঁর অনুবর্তী সূচনাকালের সাহাবায়ে কেরাম কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং এর বিভিন্ন আদেশ-নিষেধের কি অর্থ বুঝেছিলেন। পবিত্র কুরআনের আভিধানিক তাফসিরসমূহ এবং মাছূর (হাদিসভিত্তিক) তাফসির এ বিষয়ের বিশেষ রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরে।

দুই : প্রত্যেক যুগে যে সকল নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে সকল সংকট সৃষ্টি হয়েছিলো সেসব কিছু সেযুগেই পবিত্র কুরআনের হেদায়াত অনুযায়ী সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। মাসআলা-মাসায়েল এবং তির্যক প্রশ্নসমূহ মাথায় রেখে আলেম সমাজ পবিত্র কুরআনের দিকে চিন্তা, গবেষণা

ও বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করেছেন এটা জানার জন্য যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুরআন কি দিকনির্দেশনা দেয়। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন যাপন প্রণালী এবং আচার-ব্যবহার পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে কুরআন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রতিটি যুগে মানবতার সামনে কুরআন প্রদর্শিত জীবন যাপনের রাজপথ উন্মুক্ত করে তুলে ধরা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের ফিকহী তাফসিরসমূহ এ দিকটি খেয়াল রেখেই রচিত হয়েছিলো। আমরা এখানে ফিকাহ শব্দটিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছি। আদেশ আনুগত্যের চেতনায় ফিকহী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে আদেশ-নিষেধসমূহ, মাসআলা-. মাসায়েল এবং অনুগত মানসিকতা। বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসিরসমূহও মূলত এই সিলসিলার অংশ। এসব তাফসির দ্বারা বলা হয়েছে, কি ধরনের আবেগ ও মানসিক অবস্থায় এই আদেশ-নিষেধ জারী করা হয়েছে।

তিন : প্রতিটি যুগে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর এবং সেই যুগের বিশেষ নীতি-আদর্শ ও সংকট-সম্ভাবনাকে আমলে এনে চেষ্টা করা হয়েছে পবিত্র কুরআনের কৌশলগত শিক্ষাসমূহ পরিষ্কার করে তুলে ধরার। সাথে সাথে সন্দেহ-সংশয়সমূহ দূরীভূত করার চেষ্টা করা হয়েছে, বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তিসমূহ, স্বল্পজ্ঞানী ও নাদান লোকদের দ্বারা প্রচারিত বিভ্রান্তিসমূহ নিরসন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সময়ের সাথে উত্থিত ফিতনাসমূহ কুরআনের আলোকে নির্মূল করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানের উৎস ও ভাণ্ডার থেকে আহরিত উপাদান তাফসিরে সন্নিবেশিত করে শিক্ষার্থীদের নিকট আল কুরআনের শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও সমৃদ্ধ করা হয়েছে। ই'জাজুল কুরআন বিষয়ক তাফসির, কালামী ও যুক্তিভিত্তিক তাফসির এইসব প্রয়োজন পূরণেরই প্রচেষ্টা।

উপরোক্ত তিনটি দিক প্রতিটি যুগে আলেম সমাজকে তাফসির রচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক কাজের প্রতি বারংবার মনোনিবেশ করিয়েছে। এসব প্রচেষ্টা এবং জ্ঞান গবেষণার ফলে ও প্রভাবে বেশুমার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখা সম্প্রসারিত হয়েছে, ব্যাপকতা লাভ করেছে, উন্নতির পথে এগিয়ে গিয়েছে। কুরআনের শব্দাবলী, বাক্যগঠন প্রণালী এবং ছন্দ বোঝার জন্য অনেক অভিধান রচিত হয়েছে। এর বাণী তুলে ধারার জন্য ভাব প্রকাশের ও কথা বলার নান্দনিকতার উদ্ভব হয়েছে। সর্বোপরি সাহিত্য রচনার অংগনে সমালোচনা সাহিত্য নামক এক নতুন বিষয়ের অবতারণা ঘটেছে। এ কিতাব সংরক্ষণ, প্রচার, প্রচারণা ও মুদ্রণের জন্য কাতেবগণের অসামান্য অবদানে সৃষ্টি হয়েছে এ সম্পর্কিত লিখন শৈলীর। আধুনিক ক্যালিগ্রাফি কুরআনের আয়াতসমূহের সৌন্দর্যবোধ এবং নন্দনতত্ত্বকে তুলে ধরেছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কিসসা-কাহিনীসমূহের উত্তম মর্ম উপলব্ধির জন্য ইতিহাস, ভূগোল ও তুলনামূলক মতবাদসমূহের বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা উন্নতি লাভ করেছে। উসুলে ফিকহ, ফিকহ এবং তাসাউফ-এর ন্যায় শাস্ত্রসমূহের উদ্ভব হয়েছে পবিত্র কুরআন থেকে আদেশনিষেধ বের করা, আহকামসমূহ বোঝা এবং তার শিক্ষার অনুসন্ধান করতে গিয়ে। হাদীস শাস্ত্র, আসমাউর রিজাল, সহীহ হাদীস অনুসন্ধান ও মওযু হাদীসের শাস্ত্রজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে তাফসিরে নববীকে জানার জন্য এবং এই ব্যাপারে সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে, রসূলে পাক সা. এই কুরআন অনুযায়ী কিভাবে আমল করেছেন এবং কি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন।

কুরআন নির্দেশিত আইনসমূহ ও উত্তরাধিকার বণ্টনের বিধি ব্যাখ্যা করার জন্য ইলমে ফারায়েয-এর উদ্ভব হয়েছে। কুরআনের প্রতিরক্ষার খাতিরে ইলমে কালামকে সবাই জেনেছে এবং চিনতে পেরেছে। এমনকি কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আলোকে জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পকলার সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ যতোটুকুই কুরআনের আশ্রয় লাভ করেছে, সেগুলো ততোটুকুই তাফসির সাহিত্যের উপাদান ও রেফারেন্সে পরিণত হয়েছে। তাফসির সাহিত্যের কেন্দ্রীয় গুরুত্বের বিচারে ওগুলো কুরআনের খাদেমই ছিলো। কিন্তু এক পর্যায়ে পৌঁছে সেই কলাসমূহের ক্রমোন্নতি এমনভাবে হতে থাকলো যে, এক পর্যায়ে তাদের নিজস্ব স্বকীয়তার কারণে কুরআনের মূল স্রোতই তারা হারিয়ে ফেলে।

তাফসির সাহিত্যের কেন্দ্রীয় গুরুত্ব: এমন পরিস্থিতিতে তাজদীদে দীনের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত আল্লাহর নেক বান্দাহগণ কুরআনের জ্ঞান ও আমলকে তার প্রকৃত রাজপথে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছেন। তাদের প্রচেষ্টা ও সাধনার মূল লক্ষ্য ছিলো কুরআন প্রদর্শিত জীবনের রাজপথকে আবার পরিষ্কার করা, আলোকিত করা, অত:পর গোমরাহীতে নিমজ্জিত চিন্তা ও কর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআনের আলো জ্বেলে তার সংশোধন করা ও পরিমার্জন করা।

ইসলামি চিন্তাদর্শনে তাফসির সাহিত্যের উপরোক্ত গুরুত্ব স্বীকৃত। এরই আলোকে আমরা মনে করি, তাফসির সাহিত্য হচ্ছে মুসলিম বুদ্ধিমত্তা, মেধা শক্তির চমৎকার প্রতিফলন এবং এই জাতির পুরো ইতিহাস তাফসির সাহিত্যের আলোকে দেখা যেতে পারে।

হিমালিয়ান উপমহাদেশে তাফসির সাহিত্য: এই হিমালয়ান উপমহাদেশে দারসে কুরআন বা তাফসির সাহিত্যের ইতিহাস সহস্রাধিক বছরের প্রাচীন। ২৭০ হিজরী সনে আবদুল্লাহ বিন উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. একজন ইরাকী বংশোদ্ভূত সিন্ধী আলেমকে দিয়ে সর্বপ্রথম তাফসির সাহিত্য রচনা করান। ঐ আলেমের জন্ম ও শিক্ষাদীক্ষা হয়েছিলো বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ এলাকাতে। গজনভী আমলে রাজপুতনা ও পাঞ্জাব ছিল ইসলামি দাওয়াত ও তাবলীগের কেন্দ্রভূমি। এসময়ের ওলামায়ে তাফসিরের মধ্যে সাইয়েদ মুহাম্মদ ইসমাঈল বুখারীর নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম পূর্ণাঙ্গ তাফসির রচিত হয় হোসাইন শাফিয়ী কর্তৃক। তিনি নিযাম নিশাপুরী রহ. দৌলতাবাদী নামে সমধিক পরিচিত। ৭২৮-৭৩০ হিজরী সনের মধ্যে রচিত এই তাফসির পরবর্তী সময়ে ইরান থেকে প্রকাশিত হয় (গারায়েবুল কুরআন, তেহরান ১২৮০ হি.)। এরপর থেকে আজতক আরবি, ফারসি, ইংরেজি, উর্দু, বাংলা, সিন্ধি, পশতু ও অন্যান্য পাক ভারতীয় ভাষায় বেশুমার তাফসির সাহিত্য রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এ ধরনের রচনাকর্মের সিলসিলা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। এই তাফসির সমূহ সেভাবেই রচিত হয়েছে যেভাবে অন্যান্য মুসলিম দেশে তাফসির রচিত হয়েছে। এই তাফসিরসমূহের মধ্যে একটি বিশাল অংশ আছার (রিওয়ায়াত) ভিত্তিক তাফসির। আছার ভিত্তিক তাফসিরের বৈশিষ্ট্য হলো, এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হাদীসে নববী সা. ও সাহাবায়ে কেরামের মতামতের আলোকে করার চেষ্টা করা হয়। ই'জাজে কুরআন তথা মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিশেষত্ব এবং কুরআনের সাহিতিক কারুকার্য তুলে ধরার জন্যও বেশ কিছু তাফসির রচিত হয়েছে।

তাফসির সাহিত্যের অন্য একটি শাখা হলো কালামী তাফসির। কালামী তাফসিরে সমকালীন সমস্যাসমূহের যুগোপযোগী বিশ্লেষণ পাওয়া যায় এবং বিশেষভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক পরিভাষাগত দিক থেকে কুরআনী শিক্ষার হেকমত বর্ণনা করা হয়,

আপত্তিসমূহের জবাব দেয়া এবং সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। একইভাবে ফিকহী (আইনগত) বিষয়ের আলোচনা করতে গিয়ে ফিকহী তাফসির রচিত হয়েছে। সূফীগণ এখানে রচনা করেছেন সুফীবাদী তাফসির। এই উপমহাদেশে তাফসির সাহিত্যের প্রতিটি দিক ও বিভাগে মোটামুটি কাজ হয়েছে।

উর্দু ভাষায় তাফসির সাহিত্যের চর্চা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী রহ. এর খান্দানের মাধ্যমেই শুরু হয়। তাঁর দু'জন সুযোগ্য পুত্র সর্বপ্রথম উর্দু ভাষায় কুরআন অনুবাদ করেন। এটা যে কোনো ভারতীয় ভাষায় কুরআন অনুবাদের প্রথম পদক্ষেপ। অনুবাদ বা ভাষান্তর বা তরজমা যাই বলি সেটা হলো তাফসির সাহিত্য রচনার প্রথম পদক্ষেপ। শাহ আবদুল কাদের রহ. বিন শাহ ওয়ালিউল্লাহ কৃত তরজমা ও ব্যাখ্যা 'মাওদিহুল কুরআন' নামে প্রকাশিত হয়, যা আজও আমাদের মাঝে আছে। জ্ঞানপিপাসু মানুষ এই বর্তমান কালেও সেটা থেকে উপকৃত হচ্ছেন। তদীয় ভ্রাতা শাহ রাফীউদ্দিন রহ. কৃত তরজমাও তাফসিরে কুরআনের জগতে একটি মাইল ফলক হয়ে আছে। একই সময়ে হাকীম মুহাম্মদ শরীফ খান (১২২২ হি.) কৃত তরজমা ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রফেসর হামেদ হোসেন কাদেরীর মতে শেষোক্ত তরজমাটি উর্দু ভাষায় কুরআনের প্রথম তরজমা। (সূত্র: উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, প্রকাশকাল ১৯৫৭ খৃ:)

এসব ছিল প্রাথমিক প্রচেষ্টা। এরপর থেকে তরজমা ও তাফসিরের ক্রমাগত ধারা চলতে শুরু করেছে যা আজ অবধি চলছে। এক্ষেত্রে হাজার হাজার আল্লাহর বান্দা তাদের মেধা ও যোগ্যতার সাক্ষর রেখে কুরআনের পয়গামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। উর্দু ভাষার বেশীর ভাগ তাফসির সাহিত্য গতানুগতিক তাফসির ধারায় রচিত হয়েছে। কিছু তাফসিরকার কোন একটি বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে তাফসির রচনা করেছেন। কিছু তাফসির আছে জামে' তাফসির (আভিধানিক, ঐতিহাসিক, কালামী, ফিকহী ও বুদ্ধিবৃত্তিক), যেখানে সবকিছু একীভূত করা হয়েছে।

তাফসির সাহিত্যের এসব জ্ঞান-গবেষণাকারীর উপর নজর বুলিয়ে আসুন এবার আমরা তাফহীমের উপর দৃষ্টি দেই। আলাহামদু লিল্লাহ। তাফহীমুল কুরআন রচনা সমাপ্ত হয়েছে পরিপূর্ণতার সাথে। এই তাফসির গ্রন্থে সমগ্র কুরআন মজিদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তদুপরি এই কিতাবে কুরআন বোঝা এবং অনুধাবনের যে পথ দেখানো হয়েছে তা অধ্যয়নকালে কুরআন পাঠককে এক মুহূর্তের জন্যও কুরআনের মূল বাণীর সংগছাড়া করে না।

তাফহীমুল কুরআন এবং উপমহাদেশের মুসলিম জীবনের ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন

১৯২৫-২৬ সালেই মাওলানা মওদূদী রহ. সামাজিক সংশোধন ও রেনেসাঁর কাজের সূচনা করেন। খেলাফত আন্দোলনের বাহ্যিক ব্যর্থতা এবং তার সৃষ্ট মানসিক, সামাজিক, চারিত্রিক ও রাজনৈতিক সংকটসমূহ মাওলানা মুহতারামকে সেই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো যার প্রয়োজন তদানীন্তন ভারতবর্ষে আরও অনেকে অনুভব করেছিলেন বটে কিন্তু তারা এই কাজের পথে উত্থিত সমস্যা ও সংকট মোকাবিলায় দ্বিধান্বিত ছিলেন অর্থাৎ অগ্রসর হয়ে কাজটি করার সাহস করেননি। অনেকে সমগ্র জাতিকে এ কাজের জন্য ডাক দিয়েছেন। একাজের জন্য দামামা বাজিয়ে হাতে তলোয়ার তুলে নিয়ে সেই তলোয়ারে চুমো দিয়ে আবার তাকে সাজিয়ে রেখে দিয়েছেন।

এমত পরিস্থিতিতে একজন বলিষ্ঠ ঈমানের অধিকারী নওজোয়ান এ তরণীর কাণ্ডারীর দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিলেন। 'আল জিহাদ ফিল ইসলাম' বইটির জন্য গবেষণা, অধ্যয়ন ও চিন্তাভাবনা তাঁকে এ কাজের পথে এগিয়ে দেয়। ১৯২৮ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত সময় পার হলো চিন্তা-ভাবনা, অধ্যয়ন ও গবেষণা করে সর্বোপরি সিদ্ধান্ত নিতে। এসময় তাঁর অবস্থা ছিলো এই ছত্রের মত:

"ইসী কাশমাকাশ মে গুজরে মেরী যিন্দেগী কি রাতে

কাভী সোজ সাজ রূমী কাভী বেচ তাব রাযী।"

১৯৩২ সালে তিনি সম্পূর্ণ একনিষ্ঠ হয়ে নিজের কাজের লক্ষ ও চলার পথ নির্ধারণ করে নেন। অত:পর ১৯৩৩ সাল থেকে মাসিকপত্র তরজুমানুল কুরআনের মাধ্যমে কুরআনের বিপ্লবী বাণীর দাওয়াত পেশ করার সূচনা করেন। তার দাওয়াতের সূচনা হয়েছিলো কুরআনের মাধ্যমে এবং এর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবিন্দু ছিল আলকুরআন। মওলানা মওদূদী রহ.-এর সম্পাদনায় তরজুমানুল কুরআনের প্রকাশনা শুরু হলে এর প্রথম সংখ্যায় তিনি লিখেন:

"এই মাসিকপত্রটি আজ যে পর্যায়ে প্রবেশ করছে তা অত্যন্ত কঠিন ও বিপদসংকুল। কঠিন ও বিপদ সংকুল শুধুমাত্র এজন্যই নয় যে, এর ভবিষ্যত কর্মপন্থা অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ, বরং আজ যে হাতগুলো এই পত্রটির মহাভার তুলে নিচ্ছে তা পূর্বের ভারবাহী হাতগুলোর তুলনায় অনেক দুর্বল, একদিকে এই দুর্বলতা ও অক্ষমতা অন্যদিকে প্রার্থিত কাজ হলো ইসলামকে তার প্রকৃত আলোকে পেশ করতে হবে, যে আলোকে কুরআনে হাকীম তাকে পেশ করেছে। বলতে গেলে কাজটি সহজ মনে হয় কিন্তু বাস্তবতা ভিন্নরূপ। নবুওয়াতের দিনগুলোর পরে সঠিক ইলমের অভাব, কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রীক দর্শনের আগ্রাসন, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ, সর্বোপরি স্ববিরোধিতা এবং প্রবৃত্তির অন্ধ অনুসরণ আমাদের ও কুরআন বুঝার মধ্যে এমন সব পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছে, যে কুরআন আমাদের জন্য সহজ ও বোধগম্য করা হয়েছিলো তা আজ দুর্বোধ্য হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় ও এমন পরিস্থিতিতে কুরআন মজিদকে তার স্বরূপে পেশ করা নিঃসন্দেহ একটি সুকঠিন কাজ।"

এই সুকঠিন কাজটিরই সূচনা করলেন কুরআনের এই আশেক। মাওলানা মওদূদী রহ.-এর নিজ লেখনীতে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে প্রায় ৮০ টি পুস্তক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এমন মনে হয় যেনো প্রাথমিক আট-দশ বছরেই মওলানা মওদূদী রহ. অনুভব করে নিয়েছিলেন যে, তাঁর পুস্তকসমূহ দ্বারা তিনি অতি উত্তম উপায়ে আল কুরআনের বিপ্লবী দাওয়াত পেশ করছেন ও করবেন। তথাপি মুসলিম উম্মাহকে কুরআন প্রদর্শিত প্রকৃত দীনের দিকে নিয়ে আসা এবং এই দীনের আলোকে মুসলিম জাতির ঐতিহাসিক মিশন কল্যাণের দিকে আহ্বান: আমর বিল মারূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার এই ধারণার উপর তাদের বিবেককে জাগ্রত করবার জন্য কুরআনের সাথে তাদের সম্পর্ক জুড়ে দেয়া প্রয়োজন। এমনভাবে জুড়ে দেয়া প্রয়োজন যেনো কুরআন বর্তমান মুসলিম উম্মাহর জীবনের সংবিধান বনে যায় এবং জাতির বিশ্বজনীন দাওয়াতের মেনিফেস্টো বা ইশতেহার হয়ে যায়। এই উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নের জন্য খোদ কুরআনকেই ভিত্তিমূল বানাতে হবে এবং সামগ্রিকভাবে মুসলিম জাতির মধ্যে কুরআনের প্রকৃত বুঝ সৃষ্টি করতে হবে।

এই জাতীয় অনুভূতি সম্ভবত শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ.-এর মধ্যে তখন জাগ্রত হয়েছিলো যখন তিনি কুরআন মজিদের ফারসী তরজমা করবার বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং যার মাধ্যমে উপমহাদেশে মুসলিম জাতির জীবনের মোড় পরিবর্তনের ঐতিহাসিক কাজটি সম্পন্ন হয়। শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. কুরআনের সাথে জাতির সম্পর্ক নিবিড় করার সাথে সাথে জীবনের সামগ্রিক ইসলামি দর্শনকে তদীয় বিখ্যাত গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাতে পেশ করেছেন। *হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা* হচ্ছে কুরআন ও হাদীসের মর্মবাণীর আলোকে এক অনুপম ....?

ইতিহাসের একজন ছাত্র হিসেবে আমি মনে করি দীনের তাজদীদের ক্ষেত্রে শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ.-এর কুরআনের ফারসী অনুবাদ ও হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগার যে মর্যাদা মওলানা মওদূদী রহ.-এর তাফহীমুল কুরআনেরও মোটামুটি সেই মর্যাদা দেয়া যেতে পারে। কারণ তাফহীমুল কুরআনে কুরআন অনুবাদের একটি আধুনিক নতুন ধারা অবলম্বন করা হয়েছে এবং কুরআনের দাওয়াতকে কুরআনের মাধ্যমেই পেশ করা হয়েছে ও বর্ণনা করা হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাফহীমুল কুরআন মওলানা মওদূদী রহ.-এর পুরো জীবনের গবেষণা, সাধনা ও অধ্যবসায়ের স্বরূপই নয়, বরং মুসলিম উম্মাহর বর্তমান ও ভবিষ্যত পুনর্গঠন ও পুর্ননির্মাণের একটি আকর গ্রন্থও বটে।

ইসলামি আন্দোলনের সাথে রয়েছে তাফহীমুল কুরআনের নিবিড় সম্পর্ক। এমন একটি সত্যনিষ্ঠ দলের প্রয়োজনীয়তা ও গঠনের কাজ যে দল তথা সংগঠনের দায়িত্ব হবে ইসলামি বিপ্লব সাধনে সচেষ্ট থাকা। তা গঠনের কাজ মওলানা মোটামুটি ১৯৩৮ সালেই শুরু করে দিয়েছিলেন। আমি মনে করি, দল গঠনের ঊষালগ্নে আন্দোলনের দারুল ইসলামের দিনগুলোতেই মওলানা মওদূদী রহ. গভীরভাবে অনুভব করেন যে, এই সত্যনিষ্ঠ দলটির প্রশিক্ষণের মূল কোর্স রয়েছে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের মাঝেই। এ বিষয়ে তিনি নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে ফেলেন। এই যুগেই তিনি মানসিকভাবে তাফহীমুল কুরআন রচনা করার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই সংগঠনটি যখন সুসংগঠিত হওয়া শুরু করে তখন একেবারে প্রথম দিন থেকেই দরসে কুরআনের আয়োজন করা হয়। এটাই হলো সেই দরসে কুরআন যা ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শুরুতে তাফহীমুল কুরআন নামে পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশিত হয়। এইভাবে বা পদ্ধতিতে নতুন একজন প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে যে কোর্স কেন্দ্রীয় নেতা ও কর্মীদের তৈরি করেছিল এবং কিছু পাঠক দ্বারা পঠিত হচ্ছিলো তা সমস্ত জাতি তথা উম্মাতের জন্য সংরক্ষিত হয়ে গেলো।

উপরের কথাবার্তা এবং আলোচনার উপর গভীর দৃষ্টিপাত করলে তাফহীমুল কুরআনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব পরিষ্কার হয়ে যায়। এটা সেই তাফসির যা এ উপমহাদেশের মুসলমানদের এক কঠিন ও সিদ্ধান্তকর যুগে তমসাচ্ছন্ন জাতির উপর কুরআনের ছায়া দিয়ে এক নীরব বিপ্লব সাধন করে গেছে। সেই বিপ্লবী যুগ আজও শেষ হয়নি। দিকে দিকে আজও জ্বলে উঠেছে দীন ইসলামের লাল মশাল।

তাফহীমুল কুরআনের দু'টি মৌলিক বৈশিষ্ট্য

সন্দেহ নেই, দীনের যে খেদমত তাফহীমুল কুরআন করেছে এবং করে যাচ্ছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক ভূমিকার দাবি রাখে। শুধু এজন্যই নয়, বরং শুধুমাত্র জ্ঞানগত দৃষ্টিকোণ থেকেও তাফহীমুল কুরআনের মর্যাদা অনেক উচ্চে। এটা সেই গ্রন্থগুলোর অন্তর্ভুক্ত যেগুলো শত শত বছর ধরে আলোকচ্ছটা ছড়াতে থাকে। এ

তাফসির গ্রন্থ ইতিহাসের শুধুমাত্র একটি অংশ নয়, বরং নিজ যুগের ইতিহাসের স্রষ্টাও বটে। আমরা এখানে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তাফহীমুল কুরআনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করবো, বিশেষ করে যে দিক ও বিষয়গুলো তাফহীমুল কুরআনের মাঝে পাওয়া যায়।

সর্বপ্রথম আমরা দু'টি মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করবো যা তাফহীমুল কুরআনের মেজাজ, রীতি, পদ্ধতি, বর্ণনাভঙ্গী, তাফসির, বিষয়বস্তু, মুল আলোচ্য বিষয়, পটভূমি, মূল বক্তব্য, সাহিত্য, বিষয় নির্দেশিকা তথা সকল কিছুকে প্রভাবিত করে মূলত এই ঐতিহাসিক তাফসির গ্রন্থের বিচিত্র বর্ণনা কৌশল ও অনুপম উপস্থাপনা রীতিকে তুলে ধরে।

প্রথম মৌলিক কথা হলো, তাফহীমুল কুরআনে যে দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন পাকের আলোচনা করা হয়েছে তা বলে দেয় যে, এই কিতাব একটি 'সহীফায়ে হেদায়াত' বা হেদায়াত গ্রন্থ। একটি হেদায়াতের গ্রন্থ হিসেবে আল কুরআন প্রত্যেক ব্যক্তিতে এবং পুরো জাতির মধ্যে চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা, বিশ্লেষণ, অধ্যয়ন ও অনুশীলনের একটি বিশেষ প্রবণতা চালু করতে চায়। এই কিতাব মানুষের মাঝে একটি নতুন চেতনা জাগ্রত করে দেয়। দাসত্বের চেতনা জাগ্রত করে দেয় এবং ব্যক্তির মূল ব্যক্তিত্বের সনাতন দৃশ্যপট পাল্টে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করে এবং পাঠক সবকিছু নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শুরু করে। চিন্তা পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সাথে সাথে এই হেদায়াত গ্রন্থ ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবন পুনর্গঠনের একটি পরিপূর্ণ রূপরেখা পেশ করে। এই কিতাব সিরাতুল মুস্তাকিমের একটি পরিষ্কার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে এবং সাথে সাথে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে এবং গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতে বিস্তারিতভাবে জরুরি দিকনির্দেশনা দান করে আইন প্রণয়নে, নীতি নির্ধারণে, সংবিধান রচনায়, সর্বপ্রকার আচরণ বিধানে ও কার্যপ্রণালী গ্রহণে। এই দিকনির্দেশনা শুধুমাত্র নীতি ও আইন সম্পর্কিত বিষয়ই নয়, বরং মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের আলোচনা এসেছে তাফহীমুল কুরআনে, চাই ব্যক্তিগত জীবন হোক বা সামাজিক জীবন, রাজনীতি কিংবা অর্থনীতি, শাসন, বিচার বা ব্যবসা-বাণিজ্য, দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে কৃষ্টি-কালচার, সর্বোপরি জাতীয় জীবন থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যন্ত। আর এভাবেই এই হেদায়াত গ্রন্থ আল কুরআনুল করীম যুগের যাবতীয় দাবি পূরণ পূর্বক একটি পরিপূর্ণ জীবনযাপন প্রণালী পেশ করেছে। এই কিতাব একজন মানুষ তখনই বুঝতে পারবে এবং এর দাবিসমূহ পূরণ করতে পারবে যখন জীবনের সামগ্রিক বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত করে সে কুরআন প্রদর্শিত পথে নিজ জীবনের প্রবাহকে পরিচালিত করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হবে।

এমন নয় যে, এই কথাগুলো ইতোপূর্বে আর কেউ বলেনি। মূলত হেদায়াত গ্রন্থ হওয়ার ধারণা প্রতিটি তাফসির গ্রন্থেই পাওয়া যায়। একই সাথে. পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হওয়ার ধারণা অতীতেও ছিল এবং আধুনিক যুগের অনেক তাফসির সাহিত্যিক তো তাদের রচনায় উল্লিখিত বিষয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তাফসির আল-মানার এবং মওলানা আবুল কালাম আযাদ রচিত তরজুমানুল কুরআন। দু:খজনক হলেও সত্য যে, ঐ দু'টি তাফসির গ্রন্থ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

অবশ্য চিন্তার বিষয় হলো, সাধারণভাবে বিশেষ ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগি এতোটা প্রবল ছিলো যে, Complelete code of life হিসেবে ইসলামের উপস্থাপনটি পরিষ্কার হয়ে

উঠেনি। কালামী তাফসীর আকীদাগত আলোচনায় ভরপুর আর রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীরে ইসারঈলিয়াত সমগ্র পরিবেশকে মেঘাচ্ছন্ন করে দিয়েছে। আভিধানিক ও সাহিত্যিক তাফসীরে সাধারণভাবে শব্দালংকার ও ভাষালংকারকে এতোটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, শব্দের অর্থ মূল অর্থের স্থান দখল করে বসেছে। ফিকহী তাফসিরসমূহে এবং মাযহাবসমূহের বিতর্কের ফলে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, ফুল ও চারাগাছ তো চোখে দেখা যায় কিন্তু বাগানবাড়ির কোনো অস্তিত্ব মিলে না।

সুফী তাফসিরসমূহে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক বিষয় এবং আত্মার সংশোধন ও পরিশুদ্ধকরণের আবেগ এমনভাবে উঠে এসেছে যে, জীবন বিধানের ধারণা তার মূল প্রবাহ থেকে ছিন্ন হয়ে গেছে এবং দীনের ব্যাপারে এক ধরনের রোমাঞ্চ জন্মলাভ করতে শুরু করেছে।

কিছু জামে তাফসির গ্রন্থে এসব দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে সব কিছু একীভূত করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে এতো বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার থেকে একজন পাঠকের জন্য জীবনে পথ চলার পাথেয় খুঁজে খুঁজে তুলে আনা অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। বস্তুত তাফসির সাহিত্যসমূহে বিধানের বিষয়ে, হেদায়াতের বিষয়ে মূলত সবকিছুই আছে, তবে এসবকিছু এমনভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে যে, তা থেকে হেদায়াতের রসদ তুলে আনতে একজন মানুষকে পাকা জহুরী হতে হবে। তাফহীমূল কুরআন সাধারণ পাঠক এবং আলেম সমাজ, উভয়ের জন্য এই খেদমতই আঞ্জাম দিয়েছে।

দ্বিতীয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য

তাফহীমুল কুরআনের বুনিয়াদী দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরার দ্বিতীয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য এখন আমরা আলোচনা করবো। এ বৈশিষ্ট্য হলো কুরআন পাক শুধুমাত্র একটি কিতাব, একটি ইলহামী কিতাব, একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ কিংবা স্রেফ একটি মহাগ্রন্থই নয়; বরং এর মৌলিক দাবি হলো, এ কিতাব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত চিরন্তন হেদায়াত বাণী যা একটি লক্ষ্যের দিকে আহ্বানকারী এবং একটি বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনাকারী। এই মহাগ্রন্থ একটি দাওয়াতের দায়ী এবং এক মহান আন্দোলনের ডাক দিয়ে যায় ..... কুরআন একটি বাণীর নিশানবরদার এবং সেই দাওয়াত ও আন্দোলনের বিপ্লবী কণ্ঠস্বর। এই কিতাব একটি আদর্শবাদী জাতি গঠন করে তার কাঁধের উপর একটি মিশন চাপিয়ে দেয়। এই দাওয়াত ও আন্দোলনের জন্য কুরআন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্মপদ্ধতি, আচরণবিধি এবং সর্বোপরি রোডম্যাপ পর্যন্ত বলে দেয়। তা এর জন্য সংগ্রামরত কর্মীদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের রূপরেখা পর্যন্ত প্রণয়ন করে দেয়। এই কাজ করার জন্য যেসব গুণ, যোগ্যতা, জযবা এবং অনুভূতি দরকার হয় সে তা ওইসব মানুষের মাঝে পয়দা করে দেয়। এই মহাগ্রন্থ মানুষের ব্যক্তিজীবনেও, সামষ্টিক জীবনেও এবং সর্বোপরি পুরো পৃথিবীতে একটি সংগ্রামমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে .... এই সংগ্রামে হক ও বাতিলের মধ্যে যেনো জীবনের গতিধারা হকের পথে চলতে পারে এবং বাতিল যেনো শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

এই কিতাব সৃষ্টিজগত, মানব সমাজ, মানবজীবন ইত্যাদি সম্বন্ধে একটি ভিন্নতর ধারণা পেশ করে। যারা এই ধারণা তথা মতাদর্শকে মেনে নেয় তাদের জীবনধারাকে এই কিতাব এক ভিন্ন ধারায় গড়ে তোলে। অন্যদিকে যারা একে বর্জন করে তাদের সাথে অনবরত চেষ্টা-সাধনা, মোকাবিলা, দাওয়াত ও তাবলীগের ক্রমধারা চালাতে থাকে।

কুরআনকে একটি দাওয়াতের কিতাব হিসেবে মেনে নিলে এমন এক মূল চাবিকাঠি হাতে হাতে চলে আসে যা দ্বারা কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে সকল বাধা-বিপত্তি ও সমস্যা দূরীভূত হয়ে যায়।

অত:পর কুরআনের নিজস্ব পদ্ধতি ও স্টাইল, যুক্তি প্রদর্শন পদ্ধতি, নন্দনতত্ত্ব, সাহিত্য, বিষয়বস্তুর অনুপম ধারাবর্ণনা, আলোচ্য বিষয়ের উপস্থাপনা, চরিত্র গঠনের শিক্ষাসমূহ, আইন প্রণয়ন কাঠামো এবং এর ঐতিহাসিক ঘটনা বিশ্লেষণ তথা আল কুরআনের আলোচ্য সবকিছুই বুঝে এসে যায় এবং জীবনপথে চলতে গিয়ে পাঠক কুরআনকে নিজের প্রকৃত সমুজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে অনুভব করতে পারবে। যদি কোনো মানুষ এই বিশ্বাস ও মনোভাব নিয়ে আল কুরআন বুঝবার চেষ্টা করে এবং এই মহাগ্রন্থের হেদায়াত অনুযায়ী নিজের এবং অন্যান্য মানুষের জীবন প্রণালী পরিবর্তনের সংগ্রাম সাধনার পথে অগ্রসর হয় তাহলে কুরআনের লিখিত আয়াতসমূহ তার জীবনে আর পুঁথিগত বিদ্যা হয়ে থাকবে না। আল কুরআনের আয়াত তার বাস্তব জীবনের আয়াত এবং কর্মপদ্ধতিতে রূপান্তরিত হবে। কুরআনের এই পাঠক নিজের অজান্তেই অনুভব করবে যে, জীবন পথের প্রতিটি পদক্ষেপে পবিত্র পথের প্রদর্শক তাকে পথ প্রদর্শন করছেন। মহাকবি আল্লামা ইকবাল কুরআনের এই পাঠক মুমিন ব্যক্তির অবস্থান এবং পরিচয় তুলে ধরে বলেছেন :
'কারী নযর আতা হ্যায়, হাকীকাত মে হ্যায় কুরআন '

অর্থ : 'দৃশ্যত পাঠক, বাস্তবে কুরআন।'

আওলাদে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত হুসাইন রা.-এর বংশধর সাইয়েদ মওদূদী র. তাঁর রচনার এক জায়গায় লিখেছেন, "কুরআনকে এমনভাবে অধ্যয়ন করো যেনো মনে হয় এটা তোমার কলবে সরাসরি নাযিল হচ্ছে। এভাবেই আল কুরআন মা'রেফাতে এলাহীর উৎসে পরিণত হয়, দাওয়াতে ইসলামির মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়, ইসলামি আন্দোলনের সার্বজনীন ইশতেহারে রূপান্তরিত হয় এবং ইসলামি বিপ্লবের চার্টারে পরিণত হয়ে জীবনের ধারাকে শান্তি ও কল্যাণের দিকে ফিরিয়ে দেয়।"

তাফহীমুল কুরআন, কুরআন মজিদের এই বিপ্লবী মিশনের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটা কোনো নতুন বা অভিনব কথা নয় যে, মওলানা মওদূদী রহ. প্রথম বলেছেন এবং পূর্বেকার মুফাস্‌সির ও ইসলামি চিন্তাবিদগণ তাদের তাফসির কিংবা লেখনীতে কথাটি বলেননি। বরং যে কথা তাফহীমূল কুরআনে মোটা দাগে তুলে ধরা হয়েছে তা হলো, পুরো কুরআন মজিদ অধ্যয়নকালে এই দৃষ্টিকোণটি সবচাইতে আলোকিত হয়। কোথাও কোনো সীমিত বা সীমাবদ্ধ ধারণা এসে এই আলোকিত সরল পথ থেকে পাঠককে বিচ্যুত করতে পারে না। এই তাফসির পাঠক ও কুরআনের নাযিল হবার লক্ষ্যপথের মাঝে একের পর এক দেয়াল তুলে দেয় না, বরং একের পর এক দ্বারোদঘাটনের মাধ্যমে কুরআন ও কলবের মধ্যকার অচলায়তনগুলো মুছে ফেলে দিয়ে হৃদয়-মনকে একচ্ছত্রভাবে মূল লক্ষ্যের দিকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিয়ে যায়।

তাফহীমুল কুরআনে শানে নুযূল প্রসঙ্গ

এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাফহীমুল কুরআনের শানে নুযূল অংশ দারুণভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাফহীমুল কুরআনের রচয়িতা কুরআন পাঠকের সামনে সেই দৃশ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন যে প্রেক্ষিতে একটি সূরা বা তার কোনো অংশ নাযিল হয়েছে। যাতে

পাঠক জানতে পারেন যে, ইসলামি দাওয়াত ও আন্দোলন তখন কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করছিল অথবা মুখোমুখি হচ্ছিল। আন্দোলন তখন কি ধরনের সমস্যা সমাধানে নিরত ছিলো। কি ধরনের উপায়-উপকরণ ও সম্পদ তাদের করায়ত্ত ছিলো এবং কি ধরনের বিপদ মসীবত তাদের উপর আপতিত হচ্ছিল। এমন পরিস্থিতিতে আল কুরআন তাদের কি দিকনির্দেশনা দিয়েছিলো এবং এই নির্দেশনা প্রত্যেক যুগে, বিশেষভাবে আমাদের যুগে কি ধরনের গুরুত্ব বহন করে কিংবা সেই ঘটনার সাথে আমাদের যুগের কি সাদৃশ্য রয়েছে?

তাফহীমুল কুরআন কেবলমাত্র কুরআনের জীবনদর্শনেরই মুফাসসির নয়, বরং এতে আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবন ও ইতিহাসও আলোচিত হয়েছে। বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে শেষনবী মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সা.-এর দা'য়ী ইলাল্লাহ হিসেবে জীবন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নেতৃত্বে চলমান ইসলামি আন্দোলনের জীবন্ত ইতিহাস। সীরাতে সরওয়ারে আলম সা. আলোচনার এক মহান বৈশিষ্ট্য তাফহীমুল কুরআনের অন্যতম কীর্তি।

উপরে আমরা তাফহীমুল কুরআনের যে দু'টি বুনিয়াদী বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলাম তা একটির পর একটি তাফহীমে নতুনভাবে এবং নব সাজে বিন্যস্ত। সাথে সাথে এ দু'টি বৈশিষ্ট্যের একই সাথে একটি তাফসিরে সম্মিলন সত্যি অতুলনীয়। এজন্যই আমাদের তাফসির সাহিত্যে তাফহীমুল কুরআন এক অনুপম সংযোজন, ইতিহাসের তাফসিরী বর্ণনাসমূহের ধারাবাহিকতার উজ্জ্বল সংরক্ষক এবং তাফহীম নিজস্ব স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল তথা নিজ শক্তিতেই প্রাণচঞ্চল। যেন :

"সবকে দরমিয়ান সবসে আলাগ" অর্থ: 'সবার মাঝে সবার চেয়ে অভিনব'

তাফহীমুল কুরআনের এ দু'টি বুনিয়াদী বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ। একারণে একটি তাফসির সাহিত্য হিসেবে তাফহীম যে গুরুত্বের দাবি রাখে তা তার স্বীয় মর্যাদার দাবি। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে এর মূল গুরুত্ব কুরআনের উপর গুরুত্ব প্রদান এবং সেই আলোকের সন্ধান করা যে আলোকে কিতাবুল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া উচিত। এ কিতাব তাফসিরের চাইতে বেশি কুরআন বোঝার একটি পথের দর্শন দিয়ে যায়। অসম্ভব নয় যে, এজন্যই রব্বুল কুরআন তাফহীমের রচিয়তার দিলে হয়ত এর নামের ব্যাপারে এ কথাটি উৎপন্ন করে দিয়েছিলেন যে, এ কিতাবের নাম রাখা উচিত তাফহীমুল কুরআন (কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন)। এজন্যই আমরা হৃদয়-মনে এ আশা পোষণ করি যে, তাফহীমুল কুরআন আমাদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম তাফসির সাহিত্যসমূহের প্রতি আমাদের বিরাগভাজন বা নিরুৎসাহিত করে না, বরং ঐ তাফসিরসমূহ পর্যন্ত পৌঁছতে আমাদের প্রস্তুত করে। এর দ্বারা আল কুরআনের একজন তালেবে ইলমের (ছাত্র) এক ধরনের দূরদৃষ্টি তৈরি হয়ে যায়। এরপর সে তাফহীমুল কুরআনের সাথে সাথে সমগ্র তাফসির সাহিত্য থেকে পরিপূর্ণ ফায়দা হাসিল করতে পারে এবং অতীতের জ্ঞানভাণ্ডারের দুয়ার নিজের জন্যে নিজ উঠানে খুলে নিয়ে নিজেকে মেলে ধরতে পারে।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

এখন আমরা তাফহীমুল কুরআনের আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করবো। এসব বৈশিষ্ট্য মূল বৈশিষ্ট্যের সাথে এমন সাদৃশ্যপূর্ণ যেমন মূল থেকে কাণ্ড, শাখা- প্রশাখা, পত্র-পল্লব ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়।

১. সরাসরি সম্পর্কের সূচক: এই তাফসির গ্রন্থে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে চেষ্টা করা হয়েছে যেনো পাঠক সরাসরি পবিত্র কুরআনের সাথে সম্পর্ক জুড়ে নেয়। ভূমিকা, তরজমা এবং টীকাসমূহ এই সম্পর্কের সেতুবন্ধন। প্রতিটি সূরার তাফসীরের সূচনায় ভূমিকার আলোচনায় সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। অনুবাদ দ্বারা কুরআনের বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। টীকাসমূহ সাধারণত আয়াতের বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করেছে, ঐতিহাসিক তথ্য উপাত্ত তুলে ধরা হয়েছে। আবার কুরআনের অন্যান্য স্থানে আলোচ্য বিষয়টির যোগসূত্র এবং কোথাও কোথাও বক্তব্যও তুলে ধরেছে। এই যোগসূত্র তুলে ধরবার মূল কারণ হলো, পাঠক যেনো চলমান বক্তব্য থেকে, দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান, দাওয়াতের দৃষ্টিভঙ্গী জানতে পেরে সন্দেহ-সংশয়মুক্ত হতে পারেন। সার্বিকভাবে এই টীকাসমূহ সুবিন্যস্ত ও সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক। আবার এই টীকাসমূহ প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআনের মূল বক্তব্য এবং কাঙ্ক্ষিত প্রাণশক্তিকে বজায় রেখেছে।

তাফহীমুল কুরআনে প্রথাগত বাহাস নেই বললেই চলে। এই কিতাব পুরোপুরি ইসরাঈলিয়াতমুক্ত। অতীতে আলোচিত বিতর্ক ও কালামী বাহাস থেকেও মুক্ত এই তাফসির। ফিকহি বাহাসও এখানে সীমিত। জাতি-গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে কুরআনের আদেশ এবং নির্দেশসমূহের বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকায় উসুলে তাফসিরের প্রথাগত বাহাস বা পর্যালোচনার কোনো সূত্র পাওয়া যায় না। তাফহীমে কেবলমাত্র শানে নুযূলের বর্ণনা এসেছে একটি ভিন্ন মাত্রায়। এখানে নাসেখ ও মানসূখের বাহাস নেই, মুহকাম ও মুতাশাবেহ আয়াতের বির্তক নেই, না আছে ই'জাযে কুরআনের বাহাস। আমসাল (উপমাসমূহ), আকসাম (প্রকারভেদ) এবং কাসাসুল কুরআন (কুরআনের কিস্‌সাসমূহ) নিয়েও তেমন বাহাস পর্যালোচনা নেই। আবার এমনও নয় যে, তাফহীমুল কুরআনে এসব একেবারেই নেই। সকল জরুরি ও প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ যথাস্থানে যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু তাফসিরুল কুরআনের মৌলিক দৃষ্টিকোণকে হালকা করে দেখা হয়নি। বরং এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে আল কুরআনের বিষয়বস্তু, মূল বক্তব্য, কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় এবং তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরার প্রতি। সাথে সাথে কুরআন কে পাঠকের হৃদয়-মনে এমনভাবে গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যার দ্বারা এক নতুন মানুষ এবং একটি নতুন মানব সভ্যতা বিকশিত হতে পারে, যেমন সভ্যতা ও মানব সমাজ আল কুরআন দেখতে চায়। এজন্য তাফহীমুল কুরআনের রচয়িতা বিভিন্ন বাহাস বা বির্তকে জড়িয়ে পড়ার চেয়ে নিজের শ্রম ও মেহনত কুরআনের মৌলিক বিষয় ও পরিভাষাসমূহ পরিষ্কারভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরার পেছনে ব্যয় করেছেন।

২. নাযমে কুরআন বা কুরআনের নন্দনতত্ত্ব : তাফহীমুল কুরআনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, নাযমে কুরআনের এক নয়া ধারণা। নাযমে কুরআন তাফসির শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হিসেবে স্বীকৃত। বিজ্ঞ মুফাস্‌সেরীনে কেরাম ব্যাপকভাবে সূরাসমূহের পারস্পরিক মিল ও ধারাবাহিক সংযোগের উপর বেশী জোর দিয়েছেন। কুরআনের কিছু মহান খাদেম আবার আয়াতসমূহের ধারাবাহিক মিল ও পারস্পরিক অন্তমিলের বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। মুফাস্‌সিরগণের অন্য একটি দল সমগ্র সূরাকে একটি একক ধরে সূরার ভেতরের সব আয়াতকে একটি মৌলিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এবং সেখান থেকেই সূরার সকল বিষয়বস্তু ও আ'লোচ্য বিষয়কে বের করে এনেছেন।

তাফহীমুল কুরআনে উপরে আলোচিত সব বিষয়েরই ঝলক পাওয়া যায়। তবে এগুলোর মধ্য থেকে নন্দনতত্ত্ব, নান্দনিকতা ও অলংকার শাস্ত্রের সকল সূত্রকে ছাপিয়ে যে বিষয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা হলো: কুরআনের বিষয়বস্তু, এর কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে প্রতিটি সূরা এবং প্রতিটি আয়াতকে সম্পর্কিত ও সংযুক্ত করা হয়েছে। তাফহীমুল কুরআনে দেখানো হয়েছে, "এই কিতাবটি (অর্থাৎ কুরআন) তার সমগ্র পরিসরে কোথাও তার বিষয়বস্তু, কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় এবং মূল লক্ষ্য ও বক্তব্য থেকে এক চুল পরিমাণও সরে যায়নি। প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত তার বিভিন্ন ধরনের বিষয়াবলী তার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত আছে যেমন একটি মোতির মালার বিভিন্ন রংয়ের ছোট-বড়ো মোতি একটি সূতোর বাঁধনে একসাথে একত্রে একটি নিবিড় সম্পর্কে গাঁথা থাকে। কুরআনে আলোচনা করা হয় পৃথিবী ও আকাশের গঠনাকৃতির, মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া এবং বিশ্বজগতের নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণের ও অতীতের বিভিন্ন জাতির ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর। কুরআনে বিভিন্ন জাতির আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করা হয়েছে। অতি প্রাকৃতিক বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই সাথে অন্যান্য আরো বহু জিনিসের উল্লেখও করা হয়। কিন্তু মানুষকে পদার্থ বিদ্যা, জীব বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন বা অন্য কোনো বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার জন্য কুরআনে এগুলো আলোচনা করা হয়নি। বরং প্রকৃত ও জাজ্জ্বল্যমান সত্য সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা দূর করা, যথার্থ সত্যটি মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া, যথার্থ সত্য বিরোধী কর্মনীতির ভ্রান্তি ও অশুভ পরিণতি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা এবং সত্যের অনুরূপ ও শুভ পরিণতির অধিকারী কর্মনীতির দিকে মানুষকে আহ্বান করাই এর উদ্দেশ্য। এ কারণেই এতে প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা কেবলমাত্র ততোটুকুই এবং সেই ভংগিমায় করা হয়েছে যতোটুকু এবং যে ভংগিমায় আলোচনা করা তার মূল লক্ষ্যের জন্য প্রয়োজন। প্রয়োজনমতো এসব বিষয়ের আলোচনা করার পর কুরআন সব সময় অপ্রয়োজনীয় বিস্তারিত আলোচনা বাদ দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের দিকে ফিরে এসেছে। একটি সুগভীর ঐক্য ও একাত্মতা সহকারে তার সমস্ত আলোচনা 'ইসলামি দাওয়াত'-এর কেন্দ্রবিন্দুতে ঘুরছে।

আল-কুরআনের বর্ণনা পদ্ধতির এই নান্দনিক আবিষ্কার তাফহীমুল কুরআনের এক অনন্য কীর্তি। সাইয়েদ মওদূদী রহ. তাঁর আলোচনায় যথাসম্ভব পরিভাষাগত জটিল শব্দ ব্যবহার পরিত্যাগ করেছেন কিন্তু তার রচিত তাফসির এক অনন্য স্বতন্ত্র স্বাচ্ছন্দ্য পরিভাষার জন্ম দিয়েছে। তাফহীমুল কুরআনে প্রতিটি সূরার বিষয়বস্তু, মূল বক্তব্য ও আয়াতসমূহের বক্তব্যকে আল-কুরআনের মূল লক্ষ্য ও দাওয়াত থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যুৎপন্নমতিময় দ্রুততার সাথে বের হতে থাকে।

অত:পর এটা তাফহীমুল কুরআনের এক অনবদ্য কীর্তি যে, এই তাফসির শুধুমাত্র আল কুরআনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, বরং কুরআনের এই নান্দনিক সংযোগকে প্রতিটি সূরায় এবং কুরআনের সূরাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। তাফহীমুল কুরআনের সূরাসমূহের ভূমিকার আলোচনা এক্ষেত্রে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং টীকাসমূহের জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণেও কুরআনের সেই নান্দনিকতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে।

৩. তরজমায়ে কুরআন (তাফহীমুল কুরআনের অনুবাদ রীতি) : তৃতীয় যে বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহলো, তাফহীমুল কুরআনের তরজমায়ে কুরআন অর্থাৎ

তাফহীমুল কুরআনে আল কুরআনের অনুবাদ। এই অনুবাদ বিভিন্ন দিক থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। শাব্দিক তরজমার পথ পরিহার করে (কিন্তু কোনো শব্দের অনুবাদ পরিহার না করে) তাফহীমুল কুরআনে স্বতন্ত্র ও স্বচ্ছন্দ ভাবানুবাদের একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, কোনো একটি ক্ষেত্রেও এই স্বচ্ছন্দ অনুবাদকর্ম অনুবাদের সীমা অতিক্রম করে যায়নি। এই অনুবাদ ছন্দোবদ্ধ কাব্যিক অনুবাদের থেকেও ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কাব্যিক অনুবাদে তো একটি আয়াতকে একক ধরে অুনবাদ করা হয়ে থাকে, এতে ভাব বর্ণনার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখা কঠিন হয়ে যায়। আমার জানামতে তাফহীমুল কুরআনেই সর্বপ্রথম ধারাবাহিক স্বচ্ছন্দ অনুবাদ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। ফলে শুধুমাত্র অনুবাদ অধ্যয়ন করলেই পাঠকের দেহমনে সেই প্রভাব বিস্তৃত হয় যা কুরআন সৃষ্টি করতে চায়। এই স্বচ্ছন্দ অনুবাদে সেই বাণী শোনা যায় যা কুরআন বলতে চায়।

তাফহীমের অনুবাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে বক্তৃতার ভাষা লেখনীর ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে একটি উৎকৃষ্ট অনুবাদ কর্মের সাথে সাথে এটা কুরআনী জ্ঞানচর্চার নতুন এক মাইলফলক হয়েছে। তাফহীমুল কুরআনের তরজমাতে বক্তৃতার ভাষাকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তরে মওলানা মওদূদী র. অর্থের গুরুত্ব বিচারে প্যারাবদ্ধ করেছেন। এই পদ্ধতিতে বয়ানের ধারাবাহিকতায় একটি বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে যাবার সংকেত ও নির্দেশিকাও দেয়া হয়েছে।

তরজমাতে প্যারাগ্রাফ পদ্ধতি একটি বিপ্লবী ও ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ছিল। কুরআন তরজমাতে প্যারাগ্রাফ পদ্ধতি সেসময় একটি বিপ্লবী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে তাফহীমকে। এর ফলে কুরআনের অর্থ বোঝা এবং বাণী হৃদয়ঙ্গম করা আরও সহজতর হয়েছে। বক্তৃতার সময় যে কাজ ক্ষণিক বিরতি দিয়ে, শ্বাস-প্রশ্বাস ও কণ্ঠস্বর উঁচুনীচু করে করা হয়, তাই লেখার সময় বিরাম চিহ্নসমূহ দিয়ে করা হয়েছে। অত:পর ভাব অনুযায়ী তা প্যারাতে আবদ্ধ করা হয়েছে। এই কাজ তাফহীমুল কুরআনে প্রথমবারের মতো করা হয়েছে। সম্ভবত তাফহীমের পূর্বে পৃথিবীর অন্য কোনো তাফসীরে অথবা অন্য কোন ভাষায় কুরআনের জন্য এ খেদমত করা হয়নি। এই বিচারে এটি তাফহীমুল কুরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্য। (তাফহীমুল কুরআনের পরে উর্দু ভাষায় কুরআনের পরবর্তী তরজমাকারীগণ ব্যাপকভাবে তাফহীমের রীতি অনুসরণ করেছেন।

৪. সূরাসমূহের ভূমিকা : তাফহীমুল কুরআনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সূরাসমূহের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি সূরার তাফসির ও তরজমা শুরু করার পূর্বে এর রচয়িতা সংশ্লিষ্ট সূরার ঐতিহাসিক পটভূমি, কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়, বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য তুলে ধরেছেন। সূরাসমূহের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় এবং বিষয়বস্তুর সম্পর্ক ও ধারাবাহিকতাকে কুরআনের সম্মিলিত লক্ষবিন্দু, কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় এবং কুরআনের মূল দাওয়াতের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে বর্ণনা করা হয়েছে। নাযিল হওয়ার সময়কাল ও নাযিল হওয়ার উপলক্ষকে কেন্দ্র করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা করে তা চমকপ্রদভাবে বিবৃত করা হয়েছে। ইতোপূর্বে সূরাসমূহের ভূমিকার দ্বারা কুরআনের অর্থ বোঝানোর জন্য এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতি কেউ অবলম্বন করেছেন কিনা কিংবা সমগ্র কুরআনের ব্যাপারেও এই পদ্ধতি কেউ অবলম্বন করেছেন কিনা তা আমাদের জানা নেই।

৫. কুরআনিক বিধান : তাফহীমুল কুরআনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর মধ্যে বর্ণিত ফিকহী নির্দেশসমূহ। কুরআনের কোনো আয়াত থেকে যে নির্দেশ পাওয়া গেছে তা সেখানেই তথা যথাস্থানেই বলে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া অন্য যে সমস্ত জায়গায় একই বিষয় আলোচিত কিংবা বর্ণিত হয়েছে তাও বলে দেয়া হয়েছে। এভাবে তাফহীমুল কুরআনে কুরআনের তাফসির করার চেষ্টা করা হয়েছে খোদ কুরআনের সাহায্যেই। আরও যে বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা হয়েছে তা হলো, প্রতিটি বিষয়ে কুরআনের মূল শিক্ষা এবং কুরআন প্রদর্শিত চরিত্রনীতি ও সংস্কৃতির মৌলিক অবকাঠামোর আলোকে বিষয় বিবরণী ও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর অবস্থান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

নবী করীম সা. ও সাহাবায়ে কেরাম রা. কোনো আয়াত কিংবা নির্দেশের যে ব্যাখ্যা করেছেন তাফহীমুল কুরআনে তাও বিবৃত করবার চেষ্টা করা হয়েছে। যেখানে সাহাবাদের মধ্যে অথবা আলেমদরে মাঝে মতভেদ দেখা দিয়েছে তাও বিবৃত করা হয়েছে। সাথে সাথে মতভেদের ভিত্তিও বলে দেবার চেষ্টা করেছেন তাফসিরকার। সাধারণভাবে কোথাও হানাফী চিন্তাধারার আলোকে মূল ব্যাখ্যা করা হলেও অন্যদের দৃষ্টিকোণও তুলে ধরা হয়েছে। এ দিক থেকে তাফহীমুল কুরআনে ফিকহী মাযহাবসমূহের মতামতের যে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে তা আগামী দিনের গবেষকদের জন্য অত্যন্ত সাহায্যকারী উপাদান ও ফলপ্রসূ অবদান হতে পারে। সাথে সাথে এ কিতাব সম্মিলিতভাবে উম্মতের ঐক্য ও সম্প্রীতি স্থাপনেও নতুন পথের সূচনা করবে।

৬. মাযহাবসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা : তাফহীমুল কুরআনে ইহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ এবং কুরআনের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই পর্যালোচনায় বাদানুবাদের রীতিকে পরিহার করা হয়েছে। এখানে চেষ্টা করা হয়েছে খৃষ্টান ধর্মবেত্তা, যাজক শ্রেণী এবং পাশ্চাত্যের প্রাচবিদগণ কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি ও প্রশ্নসমূহের সাধ্যমত ন্যায়সংগত এবং সমাধানমূলক উত্তর দেবার। অত:পর অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে আল কুরআনের বর্ণনাভঙ্গী এবং বর্তমান বাইবেলের লিখিত রূপের পরিষ্কার পার্থক্য, যাতে বেমিল ওহী এবং অকাট্য অবিকল ওহীর মধ্যকার পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। মানুষ যেনো খাঁটি বস্তুটি চিনতে পারে।

মওলানা মওদূদী রহ. আল কুরআনকে নিজস্ব দলিল প্রদানের ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করিয়ে, অত:পর অন্যান্য ধর্মমত আলোচ্য বিষয়কে যেভাবে পেশ করে তার তদ্রুপ সমালোচনা করে দুটোর পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। নিজের অবস্থানকে তুলে ধরার জন্য তিনি ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণ, আধুনিক বাইবেলের সমালোচনা ও অন্যান্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সাম্প্রাতিক গবেষণা প্রতিবেদনসমূহকে উপস্থাপন করেছেন।

একইভাবে তিনি আধুনিক মতবাদসমূহ এবং সেই যুগে উত্থিত আন্দোলনসমূহের যাচাই, পর্যালোচনা ও সমালোচনা করেছেন এবং সেই মতবাদ ও আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত লোকেরা আল কুরআনের যে মনগড়া অপব্যাখ্যা করার অপচেষ্টা করেছিল তিনি তার বিপরীতে সুচিন্তিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। তার তাফসীরে পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, শারীরবিদ্যা এবং ভূগোল থেকে শুরু করে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা, ইতিহাস ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের বেশুমার আলোচনা ও পর্যালোচনা ছড়িয়ে রয়েছে।

তিনি জ্ঞানরাজ্যের ঐসকল শাখা থেকে কম-বেশী অনেক কিছু নিয়েছেন কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি কুরআনকে ফয়সালাকারীর মসনদে আসীন রেখেছেন। এই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান অথবা শাস্ত্র কোত্থাও তাঁকে ভুলপথে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাফহীমুল কুরআনে মানব রচিত মতবাদ ও জীবনদর্শনসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে সমালোচনামূলক রেনেসাঁর বীজ রোপিত হয়েছে। এই বিষয়বস্তু তাঁর তাফসিরকে একটি যুগোপযোগী আধুনিক তাফসীরে উন্নীত করেছে। তিনি যুগের এবং সাময়িক প্রেক্ষাপটের বিষয়বস্তু ও জ্ঞানের যথাযথ সমালোচনা করেছেন ঠিকই, কিন্তু কোথাও কোনো আধুনিক শ্লোগান কিংবা আধুনিকতার ছোয়া, ধ্যানধারণা বা আদর্শ তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

৭. রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণের ধারণা : উপরে আমরা যা আলোচনা করে এসেছি তাদ্বারা তাফহীমুল কুরআনের সপ্তম বৈশিষ্ট্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় অর্থাৎ সনাতন ও নতুনের মাঝে রেনেসাঁর বোধ তথা জীবন ধারণ ও যাপনের জন্য নতুন দিনের জীবনবিধান। মওলানা মওদূদী রহ. এর কলম সবসময় চরম পন্থার পথ পরিহার করে চলেছে। যারা আল্লাহ্‌র দীনকে মসজিদ-মিম্বার, ব্যক্তিগত জীবন ও খানকাহের চার দেয়ালের মধ্যে সীমিত করেছিলো মওলানার কলম তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। যারা ইসলামের নাম নিয়ে ধর্মের লেবাস পরে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার কথা বলে কুরআনের আদেশ-নিষেধবাণীকে ছেলেখেলার বস্তুতে পরিণত করেছে তিনি কঠোর ভাষায় তাদের সমালোচনা করেছেন।

তাফহীমুল কুরআনের রচয়িতা তাঁর নিজ যুগের সকল সমস্যা এবং দাবিসমূহ খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন কিন্তু তিনি এমন ভুল ধারণায় নিপতিত হননি যে, পৃথিবী, আকাশ ও নভোমণ্ডলের স্রষ্টা হয়তো কুরআন নাযিলের সময় ভুলবশত (নাউযুবিল্লাহ) এই কথাগুলো উল্লেখ করেছেন যেসবের অর্থ বর্তমান যমানায় এভাবে সংশোধন করে নিতে হবে। যেসকল সংস্কারক উপরোক্ত ধরনের কাজ করার দু:সাহস করেছেন মওলানা মওদূদী রহ. তাদের কড়া সমালোচনা করেছেন। সাথে সাথে মওলানা চেষ্টা করেছেন কুরআনকে ঠিক সেই রূপে পেশ করতে কুরআনের প্রকৃত রূপ যেমন। তাঁর এর বক্তব্যের মূল লক্ষ্য ছিলো এমন ধারণা ও প্রেরণা জন্মাতে হবে যাতে মানুষ আল কুরআন মোতাবেক নিজেকে বদলে ফেলতে উদ্যোগী হয়। এটাই ইসলামি রেনেসাঁ আন্দোলনসমূহের সংগ্রামী দাওয়াত ও কর্মনীতি। তাফহীমুল কুরআন নবুয়তের যুগ থেকে আজতক উম্মতের সত্যনিষ্ঠ জনমণ্ডলীর অনুসৃত এই কর্মনীতিকেই তুলে ধরেছে এবং হেদায়াতের এই রাজপথকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর আলোতে উদ্ভাসিত করবার প্রয়াস পেয়েছে।

৮. নয়া ইলমুল কালাম : তাফহীমুল কুরআনের আরও একটি বিশেষত্ব হলো, এই কিতাব একটি নয়া ইলমে কালামের ভিত্তি গড়েছে। প্রতিটি যুগের মাসয়ালা-মাসায়েল এবং যুক্তিতর্ক ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। প্রতিটি যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিজস্ব একটা স্তর আছে। সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। কালস্রোতে যেগুলোর প্রচলন ও প্রভাব চলে আসে। খৃষ্টান ধর্মযাজকরা যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, এমনকি স্যার সাইয়েদ আহমদ খান চিন্তাধারার পক্ষ থেকে যেসব উক্তি করা হয় সেসব প্রশ্নের জবাব দেয়ার ব্যবস্থা আমাদের যুগে অবশ্যই করা হয়েছিলো। কিন্তু একথাও একটি বাস্তব সত্য যে, পাশ্চাত্য নিশানা লক্ষ্য টার্গেট জ্ঞান ও শিল্পকলার টার্গেট করা হয়নি,

যার ছত্রছায়ায় তারা এই সব উক্তি করছিলো কিংবা প্রশ্নবাণ ছুড়ে দিচ্ছিল কিংবা আপত্তি উত্থাপন করছিলো।

যদি গ্রীক চিন্তাধারা ও দর্শনের হামলার মোকবিলায় তখনকার দার্শনিক চ্যালেঞ্জের জবাবে এক নতুন ইলমুল কালাম সৃজন লাভ করে থাকে তাহলে আজও পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও শিল্পকলা এবং পশ্চিমা সংস্কৃতি ও দর্শনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নতুন ধারার একটি ইলমে কালামের প্রয়োজন ছিলো। আল্লামা শিবলী নো'মানী ও মওলানা আবুল কালাম আযাদ মরহুম এ বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। কিন্তু তাঁরা প্রাথমিক পর্যায়ই অতিক্রম করতে পারেননি। মহাকবি আল্লামা ইকবালও এক্ষেত্রে যথেষ্ট ফলপ্রসূ অবদান রেখেছেন এবং আধুনিক চিন্তাধারার সক্রিয় মোকাবিলার পথ চিহ্নিত করে গেছেন।

অবশ্য এই নতুন ইলমে কালামের বেশি বিস্তারিত, বেশি গভীর, বেশি যুক্তিপূর্ণ উপমা ও উদাহরণ মওলানা মওদূদী রহ.র রচনাবলীতে পাওয়া যায়। তাঁর রচিত ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব, পর্দা ও ইসলাম, সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ, নির্বাচিত রচনাবলীত (মূল উর্দু নাম তাফহীমাত), তা'লীমাত, সুন্নতে রসূলের আইনগত মর্যাদা প্রভৃতি অত্যন্ত উচ্চাংগের ইলমুল কালামের গ্রন্থ। তবে এই নয়া ইলমুল কালামের সবচাইতে বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক কিতাব হচ্ছে তাফহীমুল কুরআন। এটা এই নয়া ইলমে কালামের উত্তম উপমাই নয়, বরং তা ভবিষ্যতে এই ইলমে কালামের উৎস গ্রন্থ হিসেবেও কাজ করবে ইনশাআল্লাহ।

আজ পর্যন্ত এই নয়া তথা আধুনিক ইলমে কালামের মূলনীতিসমূহ কেউ আলাদাভাবে লিখেননি, যদিও একাজটি পরবর্তী যুগের চিন্তাবিদ দার্শনিকদের কাজ যে, তারা এই জ্ঞানভাণ্ডার থেকে মূলনীতিসমূহ বের করে আনবেন। তথাপি এই বিষয়ে যদি কোনো ধরনের প্রাথমিক প্রচেষ্টা পরিচালিত হয় তাহলে তাফহীমুল কুরআনের ইলমুল কালামের মৌলিক কথাগুলো আশা করি নিম্নরূপ হবে।

নয়া ইলমুল কালামের মৌলিক কথা

ক. এই ইলমে কালামে দলিল- প্রমাণ আল কুরআনের মৌলিক ও সামগ্রিক শিক্ষার আলোকে পেশ করতে হবে। এক একটি আয়াতকে তার মূল বিষয়বস্তু থেকে কেটেছেটে আলাদা করে বোঝা যায় না। কুরআন মজিদের একটি আয়াতকে বুঝতে হলে অন্যান্য স্থানে অনুরূপ যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তার সাহায্যে বুঝতে হবে। অত:পর এক একটি বিষয় ও বাহাসকে তখনই বোঝা যাবে যখন জীবনের সামগ্রিক পরিমণ্ডলের ভিতর সেই বিষয়ের যথাযথ মর্যাদা ও স্থান নিরূপিত হয়।

[এভাবে এই ইলমুল কালামে কুরআনের সামগ্রিক শিক্ষা ও নির্দেশনাকে মৌল ভিত্তি ধরে প্রমাণ করা হয়েছে যে, ধর্মের নামে যে ভুল ধারণা ও কুসংস্কার হাল জমানায় প্রচলিত হয়েছে এসবের একটি মৌলিক কারণ হলো, কুরআনের সামগ্রিক শিক্ষাকে এবং কুরআনের বাস্তব জীবন দর্শনকে সুন্নাতে রাসূল সা. এর আলোকে না দেখে খণ্ডিত রূপে দেখা হয়েছে।]

খ. এই ইলমে কালামের রূপদানের সময় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখা হয়েছিলো যুগের সেই প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের প্রকৃত দুর্বলতাসমূহ, যেমন অজ্ঞতা, সমসাময়িক মতবাদসমূহের আনুগত্য, মুনাফেকী এবং একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মাঝে

বেপরোয়া বুদ্ধি বিকৃতির অসৎ বাণিজ্যের প্রতি। তাই এর প্রতিকার এমনভাবে করা হোক যে, ইসলামের শিক্ষাকে ব্যাপক প্রচার প্রসার ঘটিয়ে দীনের শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে অজ্ঞতার অন্ধকার মুছে ফেলতে হবে। পাশ্চাত্য চিন্ত াধারার ভিত্তিসমূহ, পাশ্চাত্যের জীবনদর্শনসমূহ ও তাদের উত্থিত আন্দোলনসমূহের উপর সর্বাত্মক হামলা চালানো হোক এবং সমালোচনা করে পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেয়া হোক যে, ওসবের কি ভালো ও কল্যাণকর এবং কোনটি ভ্রান্ত এবং বিভ্রান্তির উদ্যোক্তা।

এই আক্রমণ চলবে পাশ্চাত্যের ধর্মহীন সমাজ ব্যবস্থার উপর। তাদের চারিত্রিক হীন উদ্দেশ্য, উপনিবেশবাদ, তাদের সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন এবং অধ:পতিত সমাজ চরিত্রেরও সমালোচনা করতে হবে। এভাবে যাতে পরাধীনতার তমশাচ্ছন্ন রাতের নিদ টুটে যায়, পরাভব কমে যায় এবং নিজের তাহযীব-তমদ্দুনের উপর আস্থা ও বিশ্বাস বাড়ে। মুনাফিকী ও দ্বৈত নীতির উপর সমালোচনার লক্ষভেদী তীর বর্ষণ করতে হবে। কেউ মুসলমান হয়ে থাকতে চাইলে সে যেন একজন পরিপূর্ণ মুসলিম হয়। অন্যদিকে যে অন্য জীবন বিধানসমূহের সাহায্যকারী হতে চায় সে যেন পর্দার আড়ালে নিজেকে ঢেকে রেখে অন্যদের ধোঁকা দিতে না পারে।

এভাবে যেসব লোক দীনের ব্যাপারে প্রকাশ্যে আমানতের খেয়ানত করেছে তাদের জ্ঞানগত হীনতা ও চারিত্রিক দুর্বলতাকে তুলে ধরা হোক, যাতে তাদের স্বরূপ মানুষের সামনে উন্মোচিত হয়।

গ. এই ইলমে কালামে প্রকৃতিগতভাবেই জ্ঞানের উৎসের সাথে সংলাপকে একটি বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। ইউরোপের আসল দাবিই হলো, অহি হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় বস্তু। মানুষের বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিত গঠনের জন্য যথেষ্ট।' পক্ষান্তরে ইসলামের দাবি হলো, 'বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা তখনই লাভজনক হবে যখন ওহীর আলোকে তা কাজে লাগানো হবে। অন্যথায় আলো যতোই থাকুক না কেনো বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা বাস্তবতার কোনো কিছুই দেখতে পায় না। যেমন মানব চক্ষু অন্ধকারে কিছুই দেখে না। ওহীর রোশনাই হলো পবিত্র কুরআনুল করিম।'

[এই আধুনিক ইলমে কালামে ওহী, বুদ্ধি-বিবেক এবং অভিজ্ঞতার যথাযথ অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অত:পর আধুনিকতা ও উত্তর-আধুনিকতার জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপারে এটা পরিষ্কারভাবে বলে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ওসবের ক্ষেত্র সীমা-পরিসীমা কতোটুকু।]

ঘ. এই ইলমে কালামে যুক্তি উপস্থাপনায়ও যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তা মানব অন্তরের সুমতির নিকট কেন্দ্রীয় গুরুত্বের দাবি রাখে। তাফহীমুল কুরআনে পদে পদে মানব অন্তরের এই সুমতির কাছে নিবেদন করা হয়েছে। এটাই হলো আল-কুরআনের দলিল-প্রমাণাদি উপস্থাপনের এক অনুপম পদ্ধতি। আধুনিক ইলমে কালামে এই যুক্তি প্রদান পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়েছে।

ঙ. আল কুরআনের অনুসৃত যুক্তি উপস্থাপনের একটি অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে, তা বিরুদ্ধবাদীদের গৃহীত মূলনীতি ও স্বীকৃত জ্ঞান দ্বারাই তাদের নিরুত্তর করে দেয়।

[উদারহরণস্বরূপ হযরত ইবরাহিম আ. এর জাতিকে উদ্দেশ্য করে জাতির সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, তোমরা যে বিরাটাকার মূর্তিটিকে তোমাদের মাবুদ

এবং সকল কাজের কারিগর হিসেবে জানো ও মানো তার ব্যাপারে এটা মানতে রাজী নও কেনো যে, সেটি অন্য ছোট ছোট মূর্তিকে ভেংগে ফেলেছে?]

আধুনিক ইলমে কালামে পাশ্চাত্যের সমালোচনা করার সময় সামগ্রিকভাবে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। তাফহীমুল কুরআনে এর নেহায়েত উচ্চাংগের সুনির্বাচিত উপমা দেখা যায়।

চ. তাফহীমুল কুরআন যে নয়া ইলমে কালামের প্রবর্তন করেছে সেখানে ইসলামি আইন প্রণয়নের কৌশল, যুগের সমাস্যাদির সমাধান ও অন্যান্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রসারকে তুলনামূলক পর্যালোচনার আকারে নিয়ে আসা হয়েছে। এই বস্তু একদিকে কুরআনের প্রদর্শিত শিক্ষাসমূহের উপর আস্থা ও বিশ্বাসকে বাড়িয়ে তোলে, অন্যদিকে আল্লাহ্‌র কালাম হিসেবে কুরআনের পক্ষে দলিল যা একথা প্রমাণ করে যে, কুরআনী শিক্ষার মানদণ্ডের উপর যুগের উত্থান-পতন কিংবা অতি বিপ্লবী চিন্তার কোনো প্রভাবই পড়ে না। কুরআন বিংশ শতাব্দীতেও অতোটাই তরতাজা ও অত্যাধুনিক যতোটা ছিলো সপ্তম শতকে।

ছ. আল কুরআনের বর্ণনা পদ্ধতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তাতে অন্তর ও দৃষ্টির প্রশান্তির সাথে সাথে প্রতিটি পদক্ষেপে নফসের পরিশুদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে যেনো ব্যক্তিত্ব সুগঠিত হয় এবং ব্যক্তির কাঙ্ক্ষিত মানোন্নয়ন হয়।

তাফহীমুল কুরআনে খোদ এই পদ্ধতিরই অনুসরণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতেই তাফহীম (মর্মবাণী অনুধাবন) ও তাযকিয়ায়ে নফস (আত্মার পরিশুদ্ধি) প্রতিটি পদে যুগপৎ এগিয়ে গেছে। অর্থাৎ এই ইলমে কালামের মূল লক্ষ্য ঈমান ও নেক আমল। এই দুটো বস্তুকে পরস্পরের সাথে প্রতি পদক্ষেপে জুড়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে; যাতে চেতনার যে ধাবমান ধারা ধমনীতে ধ্বনি তোলে তাই যেনো শানিত বহমান অশ্রুবিন্দু হয়ে গণ্ড বেয়ে টপকে পড়ে।

আধুনিক তথা নয়া ইলমে কালাম শিরোনামায় উপরে যা আলোচিত হলো তা তাফহীমুল কুরআনে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।

৯. নির্ঘণ্ট বা বিষয় নির্দেশিকা (INDEX): তাফহীমুল কুরআনের আরও একটি অসামান্য বৈশিষ্ট্য এর বিষয় নির্দেশিকা অভিধান। ইংরেজি ভাষায় একে ইনডেক্স বলে। আমরা বাংলাতে সূচী, নির্ঘণ্ট, নির্দেশিকা ইত্যাদি বলে থাকি। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের অনেক বিচিত্র, মূল্যবান ও অতুলনীয় বিষয় নির্দেশিকা কিংবা কোষগ্রন্থ পাওয়া যায় পৃথিবীর নানা ভাষায়। কিন্তু তাফহীমুল কুরআনের স্বতন্ত্র বিষয় নির্দেশিকা নিজ তুলনায় স্বয়ং তুলনাহীন। এটা কুরআন ও তাফহীমুল কুরআনের তামাম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সূচির এক স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি। আল কুরআনের যেখানে যেখানে কোনো নীতি নির্ধারণী বিষয় কিংবা কোথাও কোনো ছোটখাট বিষয়ের আলোচনা রয়েছে সেসব কিছু অত্যন্ত যত্ন সহকারে এই নির্ঘণ্টে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেসব গবেষক মহাগ্রন্থ আল কুরআন নিয়ে গবেষণা করেন তাদের জন্য কুরআনের বিষয়াবলীর বিশালতা ও প্রসারতার সামনে এই নির্দেশিকা একটি অন্যতম নেয়ামত মনে হবে। তাফহীমুল কুরআনকে যদি জ্ঞানের একটি বিশ্বকোষ ধরা হয় তাহলে এই নির্ঘণ্ট সেই বিশ্বকোষে আরোহণের সিঁড়ির সাথে তুলনীয়। আমি এই বিষয় নির্দেশিকাকে তাফহীমুল কুরআনের বিশেষ কীর্তির মধ্যে

শুমার করি। কারণ তাফসিরুল কুরআনের সাথে কুরআনের বিষয়াবলীর উপর এমন অনন্য সাধারণ নির্ঘণ্ট ইতোপূর্বে কখনো লিপিবদ্ধ হয়নি।

তাফহীমুল কুরআন ও বর্তমান যুগের চ্যালেঞ্জ

আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জকে বিভিন্নভাবে জানা যায় এবং ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করা যায়। আল কুরআনের একজন অনুসারী এবং তাফহীমুল কুরআনের একজন ছাত্র হিসেবে আমি যখন বিষয়টি নিয়ে ভাবলাম তখন এ ক্ষেত্রে আমার নিকট মোটা দাগে পৃথিবীর জাতিসমূহকে তিন তিনটি প্লাটফর্মে বিভক্ত মনে হলো :

ক. বর্তমান এই আধুনিক যুগে বৈশ্বিকভাবে অহিলব্ধ জ্ঞানকে অস্বীকার করে কিংবা বাদ দিয়ে জীবনের পুরোটা কাঠামো ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীগত দৃষ্টিকোণ থেকে কিংবা ধর্মহীন জাগতিকতার ভিত্তিতে গঠন করা হয়েছে। সমগ্র সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব এবং ভোগবাদী আধুনিক পশ্চিমা জাতিসমূহের ধর্মবিশ্বাস এই ধর্মহীনতার পোশাকেই দৃশ্যমান। হিন্দুবাদ, বৌদ্ধমত এবং অন্যান্য ইসলামি জ্ঞানশূন্য ধর্মমতসমূহের অনুসারীরাও কমবেশী উপরোক্ত দলেরই অন্তর্ভুক্ত।

খ. অন্যদিকে যারা নিজেদের কাছে ওহীর জ্ঞান আছে বলে দাবি করেন, তারাও সেই জ্ঞানের ধারাবাহিকতাকে সর্বশেষ নবী নবীয়ে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত মেনে নেন না। বরং তাদের স্ব স্ব নবীর প্রতি নাযিলকৃত ঐশী জ্ঞানপ্রাপ্ত ধর্ম হিসেবে মেনে নিতে নারাজ। ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদের অনুসারীরা এই দলভুক্ত।

গ. রইলো মুসলমানরা, যারা রসূলে আকরাম সা.-কে সত্য ও বরহক নবী হিসেবে মানে। এদের একটি বিশাল অংশ দীন ও দুনিয়াকে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক বিষয় হিসেবে বিশ্বাস করে তদনুসারে জীবনের কার্যকলাপ পরিচালনা করেন। দীন ও দুনিয়াকে আলাদা করার ফলে মুসলমানদের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছে যারা মনে করেন ধর্ম হচ্ছে কয়েকটি ব্যক্তিগত ইবাদত-বন্দেগীর সমষ্টি এবং সামাজিক কিছু অনুষ্ঠানের সমাহার। কিছু লোকের জন্য ধর্মীয় এইসব দায়িত্ব পালন পার্থিব কর্মসূচীর সামাজিক ও ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তারা ধর্মকে বাদ দেয়নি ঠিকই কিন্তু শিক্ষার আসল প্রাণসত্তাকে নিজেদের দেহ-মন থেকে সরিয়ে দিয়েছে বা দিচ্ছে। এই দলটি ইসলামের বিধানকে অন্যান্য মতবাদের সাথে সংযুক্ত করে এমন এক সুবিধাবাদী মতাদর্শের ধারক হতে চায়, যাদের মুসলিম পরিচয়ের কোনো খাঁটি ঈমানী ভিত্তি পাওয়া দুষ্কর।

যাকে আমরা আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ বলি তা মূলত এই তিনটি, বরং চারটি চ্যালেঞ্জের সমষ্টি। অন্যভাবে বলা যায়, এই চ্যালেঞ্জসমূহের চারটি দিক রয়েছে। তাফহীমুল কুরআন এই চ্যালেঞ্জসমূহের জবাব তার নিজস্ব স্টাইলে দিয়েছে।

প্রথমত: প্রথম কথার মোকাবিলায় তাফহীমুল কুরআন ওহীর বাস্তবতা ও অপরিহার্যতা প্রমাণ করার জন্য দলীল উপস্থাপন করে দেখিয়েছে যে, মানুষ স্রষ্টার দিকনির্দেশনার মুখাপেক্ষী এবং এই নির্দেশনা মানা ও তদনুযায়ী কাজকর্ম পরিচালনা করার উপরই তার নাজাত, কল্যাণ ও সাফল্য নির্ভর করে।

দ্বিতীয়ত: দ্বিতীয় কথার মোকাবিলায় তাফহীমুল কুরআন দেখিয়েছে যে, ওহীর জ্ঞানের স্বঘোষিত ইজারাদারগণ হক কথাকে অস্বীকার করার অপরাধে অপরাধী। বাইবেল তার অবিকৃত মূল রূপে সেই দাওয়াতই পেশ করেছে যা কুরআন আজ আমাদের বলছে। কিন্তু বাইবেলের অনুসারীরা এর মূল রূপকে এমনভাবে বিকৃত করেছে, যার ফলে খোদ

বাইবেলের মধ্যে বর্তমান সংস্করণে একে একটি পরিপূর্ণ অবিকৃত আসমানী কিতাব বলে মনে হয় না। আজ যদি কোথাও ওহীর জ্ঞান অবিকল অবিকৃত রূপে পাওয়া যায় তাহলে শুধুমাত্র এবং কেবলমাত্র আল- কুরআনেই পাওয়া যাবে।

সবশেষে: উক্ত দুই সম্প্রদায়কে (খৃষ্টান ও ইহুদী) উদ্দেশ্য করে তাফহীমুল কুরআন তাদের ভ্রান্তিসমূহকে কুরআন ও বুদ্ধিবৃত্তির আলোকে তুলে ধরেছে, অত:পর কুরআনের শিক্ষাকে মোটা দাগে আলাদা করে পরিষ্কারভাবে পেশ করেছে। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার সীমাবদ্ধ চিন্তাধারার আকরকে শিকড়সহ উপড়ে ফেলে এই মহাগ্রন্থ আলকুরআনের বিপ্লবী বাণীর সত্যতার প্রমাণ পেশ করেছে। সাথে সাথে এই তাফসির এটাও বলে দেয় যে, কুরআন কিভাবে জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ নতুন আঙ্গিকে পুনর্গঠন করে। কুরআন আমাদের এটাও বলে যে, জীবন যাপনের সঠিক পদ্ধতি হলো, পুরোটা জীবন এক আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করেই কাটাতে হবে। আর আল্লাহর যমীনে একমাত্র আল্লাহর আইনই চলবে। নামায ও অন্যান্য ইবাদতের হক তখনই আদায় হবে যখন এর সাথে সাথে জীবন এবং জীবন যাপন প্রণালীকে গুনাহ ও তাগূতের পথ থেকে হকের পথে ফিরিয়ে আনবার সংগ্রাম চলবে। তাফহীমুল কুরআন সংস্কারকগণের ভুল ধারণাসমূহ অপনোদন করে, বিশেষ করে তারা যেসব ভুল ধারণায় অন্যদের ফেলে। তাফহীম পরিষ্কারভাবে বলে দেয় যে, আনুগত্য ও বিদ্রোহের দু'টি রাস্তা পরস্পর পৃথক, স্পষ্ট ও বোধগম্য। কিন্তু 'মানিয়া না মানিবার' এই পন্থা বুদ্ধিবৃত্তি, কুরআন এবং চরিত্রের মৌলিক উপাদানসহ সব কিছুরই বিরোধী।

এভাবেই তাফহীমুল কুরআন আধুনিক যুগের প্রতিটি চ্যালেঞ্জের জবাব দিয়েছে। জবাবদানের ক্ষেত্রে তাফহীম প্রমাণ উপস্থাপন করেছে। সাথে সাথে নতুন এক ইলমে কালামের সাহায্যে দীনের কুরআনী ধারণা এবং জীবন সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে পেশ করেছে। আর এভাবেই এই তাফসির গ্রন্থ সেই সব কাজ করে গিয়েছে যা করতে কয়েকটি গ্রন্থাগার প্রয়োজন।

তাফহীমুল কুরআন এই যুগের এক অভূতপূর্ব সাহিত্যকর্ম। শুধু সাহিত্যকর্মই নয়, বরং এক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক, সাথে সাথে মানুষ গড়ার কারিগরও বটে। এর দ্বারা সেইসব মানুষ তৈরি হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তৈরি হবে যারা আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করবে এবং এ সকলের যুক্তিপূর্ণ জবাব দিবে। তাফহীমুল কুরআনের জ্ঞানের দীঘি হতে তারা যে নালা বের করে নিবে তা হবে স্রোতস্বীনির মতো বহমান বেগবান। তাদের এই জ্ঞানধারা এই দীঘি থেকে উৎপন্ন হয়ে বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তা-চেতনা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি নতুন নতুন চেতনার উপত্যকাকে প্লাবিত করবে কুরআনী জ্ঞান দ্বারা।

***

(১১)

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. ও তাফহীমুল কুরআন

অধ্যক্ষ মাওলানা আ ন ম আবদুশ শাকুর

১. পেশ কালাম: আমাদের পূর্বেকার মুফাস্‌সিরগণ তাঁদের তাফসিরসমূহ বিভিন্ন আঙ্গিকে রচনা করেছেন। যেহেতু কুরআনুল করীম একটি বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার, তাই এর প্রতিটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে তাফসির করা একজন মাত্র মানুষের পক্ষে দুরুহ কাজ। যেমন ইমাম আবু বকর আল জাস্‌সাস রহ. (মৃ. হি. ৩৮০) তাঁর 'আহকামুল কুরআন' নামীয় তাফসিরে কুরআনের আহকাম বা আদেশ-নিষেধ বিষয়ক আয়াতগুলির হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিতে তাফসির করেছেন। ইমাম আবু বকর ইবনুল আরবি রহ. (মৃ. হি. ৫৪১) তাঁর 'আহকামুল কুরআন' নামক তাফসিরে কুরআন পাকের আহকামকে মালিকী মাযহাবের দৃষ্টিতে ব্যক্ত করেছেন।

২. মাওলানা মওদূদীর শিক্ষাজীবন: হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রহ. ১৯০৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন। খাজায়ে খাজেগান কুতুবুদ্দীন মওদূদ চিশ্‌তী র.-এর 'মওদূদ' লকবের মাধ্যমে তাঁর খান্দান 'মওদূদী খান্দান' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

তাঁর বাল্যকালীন পড়াশোনা উচ্চ শিক্ষিত মা-বাবার পারিবারিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারে সম্পন্ন করার পর হায়দারাবাদের মাদ্‌রাসা শিক্ষার মান অনুযায়ী 'মৌলভী' মানে পাশ করেন। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য 'দারুল উলুম' হায়দারাবাদে 'মৌলভী আলেম' (ইন্টারমিডিয়েট) ভর্তি হন। কিন্তু তাঁর পিতা এডভোকেট সাইয়েদ আহমদ হাসান মওদূদীর অসুস্থতার কারণে তিনি দীর্ঘ দিন পিতার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর পিতা খৃ. ১৯২০ সালে ইনতেকাল করার পর তিনি পড়াশোনার সাথে সাথে পারিবারিক রোজগারের জন্য পত্রিকায় লেখালেখি ও পত্রিকা সম্পাদনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি মাত্র ১১ বছর বয়সে খৃ. ১৯১৪ সালে 'সীরাতে রাসূলিল্লাহ্' শীর্ষক সংক্ষিপ্ত একটি নবী জীবনী লিখেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে খৃ. ১৯১৫ সালে মিসরীয় লেখক কাশেম আমীন এর আরবি কিতাব 'আল মারাআতুল জাদীদা' নামক গ্রন্থটির উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন।

৩. কর্মধারা: ১৯১৮ সালে মাওলানা মওদূদী তাঁর বড়ো ভাই সাইয়েদ আবুল খায়ের মওদূদীর সাথে বিজনৌর এর 'মদিনা' পত্রিকায় সম্পাদনার কাজ করেন। এ সময় তিনি 'খিলাফত আন্দোলন ও আন্‌জুমানে ইয়ানতে নযরবন্দানে ইসলাম' নামক সংগঠনের সাথে আন্দোলনে যুক্ত হন। আজমগড়ের 'মা'আরিফ' পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ 'বারাক ইয়া কাহারবা (উর্দূ)' প্রথম প্রকাশিত হয়। খৃ. ১৯১৯ সালে তিনি জব্বলপুরে 'তাজ' পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 'দৈনিক জমিনদার' নামক পত্রিকায় ২২ জুন, খৃ. ১৯১৯ সনে মাত্র ১৬ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় 'সামরাজ কি লুগাত মেঁ দোস্তী কা মাফহূম (উর্দূ)' নামক প্রবন্ধটি। এই সময় তিনি আরও কয়েকটি উর্দূ-ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। 'হালাতে জিন্দেগী: পণ্ডিত মদন মোহন মালভিয়া অব ইলাহাবাদ (উর্দূ, খৃ. ১৯১৯)', 'সামারনা মেঁ য়ুনানী মাজালেম (খৃ. ১৯১৯)', 'সামারনা কে মুতাআল্লাক ইত্তেহাদী কমিশন কি রিপোর্ট (খৃ. ১৯২২ ইংরেজি থেকে

উর্দূ ভাষায় অনূদিত)', 'তুর্কী মেঁ ঈসায়ীয়ুঁকে হালাত (ইংরেজি থেকে উর্দূ ভাষায় অনূদিত, খৃ. ১৯২২)', 'আল-মাসআলাতুস শারকিয়া (আরবি থেকে উর্দূতে অনূদিত, খৃ. ১৯২৪)', 'আখলাকিয়াতে ইজতেমায়ীয়া আওর উস্কা ফালসাফাহ্ (উর্দূ, খৃ. ১৯২৪)', 'হিন্দুস্তান কা সানআতী জাওয়াল আওর উস্কে আসবাব (খৃ. ১৬০০-১৯২৪)' (উর্দূ, খৃ. ১৯২৪ সনে প্রকাশিত)', সহ আরও কয়েকটি অনুবাদ ও নিজস্ব রচনা প্রকাশিত হয়।

৪. ইসলামি বিপ্লবী ধারার উন্মেষঃ মাত্র ১৮ বছর বয়সে মাওলানা র. মওদূদী তৎকালীন বিখ্যাত ভারতীয় সংগঠন 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ' এর মুখপত্র 'মুসলিম' পত্রিকায় খৃ. ১৯২১ সনে যোগদান করে খৃ. ১৯২৩ সন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। খৃ. ১৯২৫ সনে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ-এর বিখ্যাত অর্ধ সাপ্তাহিক ইসলামি পত্রিকা 'আল-জমিয়ত'-এর চীফ এডিটর হিসেবে সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই পত্রিকায় তিনি খৃ. ১৯২৫ সাল থেকে খৃ. ১৯২৮ সালের মে মাস পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য লেখা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে 'ইসলাম কা ছার চশমায়ে কুওয়াত (উর্দূ, খৃ. ১৯২৫)' এবং 'আল-জিহাদু ফীল ইসলাম (উর্দু, খৃ. ১৯২৭-১৯২৮)' নামক গবেষণামূলক কিতাবটি রচনাকালীন উক্ত বিষয়ের প্রয়োজনে তিনি ব্যাপক পড়াশোনা ও গবেষণায় নিয়োজিত হন। এজন্য তাঁকে এতো বেশি পড়াশোনা করতে হয় যে, তিনি বলতেন, 'আল-জিহাদ ফিল ইসলাম' নামক কিতাবটি আমাকে গবেষক আলেম বানিয়ে দিয়েছে। আল-জমিয়ত পত্রিকায় খৃ. ১৯২৫ সালে প্রকাশিত ২৪৪টি প্রবন্ধ নিয়ে 'সাদায়ে রুস্তাখীজ', খৃ. ১৯২৬ সালে প্রকাশিত ১৩২ টি প্রবন্ধ নিয়ে 'বাংগে সাহার' খৃ. ১৯২৭ সালে প্রকাশিত ১৫৭টি প্রবন্ধ নিয়ে 'আফতাবে তাজাহ', খৃ. ১৯২৮ সালে প্রকাশিত ১০৯টি প্রবন্ধ নিয়ে 'জলওয়ায়ে নূর' শীর্ষক উক্ত ৪টি প্রবন্ধ সংকলন পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে খৃ. ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয়। খৃ. ১৯২৮ সালের মে মাসে আল-জমিয়ত কর্তৃপক্ষ তাঁকে 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ'-এ যোগদানের আহ্বান জানালে তিনি তাতে যোগ না করে 'আল-জমিয়ত' থেকে পদত্যাগ করেন।

৫. জ্ঞান সাধনা ও চিন্তা গবেষণায় আত্মনিয়োগঃ ১৯২৮–১৯৩২ পর্যন্ত সময়টুকু মাওলানা মওদূদী র. নিজেকে পড়াশুনায় ও লেখালেখিতে, ধ্যানে-জ্ঞানে-সাধনায় ব্যস্ত রাখেন। কুরআন, তাফসির, হাদিস, ফিক্হ সম্পর্কিত বিভিন্ন কিতাবাদি পড়ে তিনি এতদ্‌বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। দারুল উলুম ফতেহ্পুরী মাদ্‌রাসার উস্তাদ মাওলানা মুহাম্মদ শরীফ উল্লাহ সুয়াতী-এর নিকট 'হেদায়া, মানতিক, মুসাল্লামুছ ছুবুত, শামসে বাজেগাহ্সহ বিভিন্ন কিতাবাদি পড়ে নিয়ম মোতাবেক খৃ. ১৯২৬ সালে সনদ অর্জন করেন। তৎকালীন বিখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা আশফাকুর রহমান কান্ধলভীর নিকট থেকে এই সময় হাদিস, ফিক্হ ও আরবি সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থাদিসহ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও মুওয়াত্তা ইমাম মালেক র.-সহ অন্যান্য হাদিস গ্রন্থের শিক্ষা লাভ করে খৃ. ১৯২৭ সালে 'সনদ' অর্জন করেন।

ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী লিখেছেন, 'বর্তমান শতাব্দীর আধুনিক ইসলামি চিন্তানায়ক, উপমহাদেশের বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী উরদূ ভাষার একজন সুসাহিত্যিক, পণ্ডিত, নিরলস পরিশ্রমী এবং বিভিন্ন গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। মাধ্যমিক জ্ঞানার্জনের পর সাংবাদিকতার পেশা নিয়ে

জীবন শুরু হলেও তৎকালীন ভারতের হায়দারাবাদের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, ফকীহ ও মুফাস্‌সিরগণের নিকট থেকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।'[১] রাজনীতি বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, আইন বিজ্ঞান, ইতিহাস বিজ্ঞান, সীরাত বিজ্ঞান, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, অর্থনীতি ও অন্যান্য বিদ্যা অর্জনে ব্যাপক পড়াশোনা করেন এবং ভাষা বিজ্ঞানে তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। আরবি, উরদূ, হিন্দি, ইংরেজি, তামিল, তেলেগু ও হিব্রু ভাষাসহ আট-দশটি ভাষায় পড়াশোনা করে নিজেকে একজন বিশেষজ্ঞরূপে গড়ে তোলেন।

খৃ. ১৯২৭ সালে 'আল-জমিয়ত' পত্রিকায় হাবীব সংখ্যায় তাঁর লিখিত 'কুরআন আপনে লানেওয়ালে কো কিস রঙ মেঁ পেশ করতা হ্যায়' (খৃ. ১৯২৭) শীর্ষক লেখাটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে তা গ্রন্থাকারে ছাপা হয়। খৃ. ১৯২৮–১৯৩২ সালের মধ্যে তিনি অব্যাহত পড়াশুনা ছাড়াও 'দাওলাতে আশফিয়া আওর হুকুমতে বরতানিয়া, সিয়াসী তায়াল্লুকাত কি তারীখ এক নযর (উর্দূ, খৃ. ১৯২৮)', 'সালাজেকাহ্ (উর্দূ, খৃ. ১৯২৯), ইবনে খল্লিকানের ইতিহাসের অংশ 'মিসরে ফাতেমীয় খলিফাগণ' এবং 'নিজামুল মুলক প্রথম আসফজাহের জীবনী এবং দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস' রচনা করেন।

খৃ. ১৯৩২ সালে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Department of Translation বিভাগের পক্ষ থেকে আল্লামা সদরউদ্দিন সিরাজীর লিখিত 'আস্‌ফারুল আরবায়া (২য় খণ্ড)' নামক এক কঠিন আরবি গ্রন্থের সাবলীল উর্দূতে তরজমা করেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে বিশাল অংকের অর্থ প্রাপ্ত হন। তা দিয়ে নিজের পারিবারিক লাইব্রেরির জন্য অনেক প্রয়োজনীয় ও দুর্লভ কিতাব সংগ্রহ করেন।

খৃ. ১৯৩০ সালে 'দীনিয়াত' (ইসলাম পরিচিতি) নামক কিতাবটি রচনা করেন। এ কিতাবটি অন্তত একশ'রও অধিক ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্বব্যাপী প্রচার-প্রকাশ পেয়েছে। খৃ. ১৯৩২ সালে মাসিক 'তরজমানুল কুরআন' নামক পত্রিকায় তিনি যোগ দেন। খৃ. ১৯৩৩ সালের মে মাসে উক্ত পত্রিকার মালিকানাস্বত্ব খরিদ করে তিনি নিজে সম্পাদনা করে প্রকাশ শুরু করেন। এই পত্রিকাটি পরবর্তীতে 'দীনের নকীব' বা ইসলামি আন্দোলনের 'মুখপত্র' হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

খৃ. ১৯৩৬ সালে ড. আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল মাওলানা মওদূদীকে হায়দারাবাদ ছেড়ে পাঞ্জাবে চলে আসার দাওয়াত দেন। খৃ. ১৯৩৭ সালে 'দারুল ইসলামে' হিজরত করার এক বছর পূর্বে মাওলানা মওদূদী র. দিল্লীতে আসেন। একই সনের ১৫ মার্চে এক সম্ভ্রান্ত সাইয়েদ বংশের কন্যা সাইয়েদা মাহমুদা বিন্‌তে সাইয়েদ নাসির উদ্দিন শামসীকে বিয়ে করেন। খৃ. ১৯৩৭ সালে আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল মাওলানা সাইয়েদ মওদূদীকে 'বাদশাহী জামে মসজিদ লাহোরে' ইমাম ও খতীব হিসেবে যোগদানের অনুরোধ করেন। কিন্তু মাওলানা মওদূদী চাকুরি করতে রাজি হননি। আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল মরহুম, মাওলানা সাইয়েদ মওদূদী ও নওমুসলিম আল্লামা মুহাম্মদ আসাদকে 'দারুল ইসলাম'-এর জন্য একটি 'প্রসপেক্টাস' তৈরি করার কথা বলেন। চৌধুরী নিয়াজ আলী খানের প্রদত্ত বিশাল একটি এলাকায় 'দারুল ইসলাম ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়।

খৃ. ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে তরজুমানুল কুরআনের অফিস দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ থেকে জামালপুর পাঠানকোটে স্থানান্তরিত করা হয়। খৃ. ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে 'দারুল ইসলাম ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠা করা হয়। মহকবি ইকবালের আহ্বানে মাওলানা মওদূদী ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে সপরিবারে দাক্ষিণ্যাত্যের হায়দারাবাদ

থেকে হিজরত করে পূর্ব পাঞ্জাবের অজপাড়া গা পাঠান কোটের জামালপুরে চলে আসেন। কালস্রোতে এ অজপাড়া গা হয়ে উঠে উপমহাদেশের ইসলামি আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র দারুল ইসলাম পাঠান কোট। এসময় দুঃখজনকভাবে ১৯৩৮ সালের ২১ এপ্রিল মহাকবি আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল (রহ.) ইন্তিকাল করেন। এতে মাওলানা মওদূদী খুবই মর্মাহত হন।

এ সময় হায়দারাবাদের 'ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিয়াত বিভাগে 'অধ্যাপক পদে' যোগদানের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলে তিনি এই লোভনীয় পদ ও প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে ইসলামি আন্দোলন গড়ে তোলার দিকে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এখানে তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ইসলামের একটি আদর্শ নগরী গড়ে তোলেন। এখানে মসজিদ, মাদ্‌রাসা, সমৃদ্ধ লাইব্রেরি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মসজিদে জুমুআর খুতবায় ধারাবাহিকভাবে তিনি 'ঈমানের হাকীকত', 'ইসলামের হাকীকত', 'নামায-রোযার হাকীকত', 'যাকাতের হাকীকত', 'হজ্জের হাকীকত' ও 'জিহাদের হাকীকত (উর্দু)' প্রসঙ্গে সহজ-সরল ভাষায় ইসলামের ইবাদতের মূল স্পীরিট তুলে ধরে খুৎবা দেন, যা পরবর্তীতে বই আকারে প্রকাশিত হয়।

এ বছর সেপ্টেম্বর মাসে 'নামায মেঁ আলায়ে মুক্কাবেরে সাওত (লাউড স্পিকার) কা ইস্তেমাল' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। খৃ. ১৯৩৯ সালের ২৬শে জানুয়ারী দারুল ইসলাম ট্রাস্ট ও মাসিক তরজুমানুল কোরআনের অফিস এবং স্বয়ং মাওলানা মওদূদী লাহোরে স্থানান্তরিত হন। এই বছর লাহোরের ইসলামিয়া কলেজে তিনি 'ভিজিটিং প্রফেসর' নিযুক্ত হন। ইন্টার কলেজিয়েট মুসলিম ব্রাদারহুড, লাহোর এর আয়োজিত এক সভায় 'ইসলাম কা নযরিয়ায়ে সিয়াসী (উর্দূ, খৃ. ১৯৩৯)' বা 'ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ' বিষয়ে এক ভাষণ দেন।

খৃ. ১৯৪০ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারি এম. এ. ইউ. কলেজের বার্ষিক সনদ বিতরণী সভায় 'খুতবায়ে তাকসীমে ইসনাদ (উর্দূ)' শীর্ষক ভাষণ দান করেন। পরবর্তীতে তা কিতাবাকারে প্রকাশিত হয়। মুসলমানদের জন্য পৃথক একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা, চাহিদা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণা প্রকাশ করে তিনি ধারাবাহিকভাবে লিখেন 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ (খৃ. ১৯৩৭-১৯৩৯)' যা বাংলায় 'উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)' নামে প্রকাশিত হয়। তিনি ধারাবাহিকভাবে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনকল্পে মুসলিম জনতাকে লেখনী ও ভাষণের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। এ সময় তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'মাসয়ালায়ে কাওমীয়াত (উর্দূ, ১৯৩৯)' বাংলায় 'ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ' প্রকাশিত হয়। তিনি তৎকালীন বিখ্যাত আলেমে দীন হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর লিখিত যুক্ত জাতীয়তাবাদের পক্ষে প্রভাবশালী কিতাব 'মুত্তাহিদা কওমীয়াত আওর ইসলাম (উর্দূ)' নামক কিতাবের সমালোচনায় উক্ত কিতাবটি লিখে যুক্ত জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে মুসলিম জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। আল্লামা ইকবাল মাওলানা মওদূদীর এসব লেখায় অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। তিনি মাওলানা মওদূদীকে লাহোরে স্থায়ীভাবে চলে আসার জন্য আহ্বান জানান। সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি লাহোর চলে এসেছিলেন।

৬. ইসলামি বিপ্লবের ভাষণ: ১৯৪০ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর মাওলানা মওদূদী র. আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রাচী হলে 'আন্‌জুমানে ইসলামি তারীখ ওয়া

তামাদ্দুন'-এর উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় 'ইসলামি হুকুমাত কিস্ তরাহ্ কায়েম হুতি হ্যায়' যা বাংলায় 'ইসলামি বিপ্লবের পথ' শীর্ষক ভাষণ দান করেন। উক্ত সনের সেপ্টেম্বর মাসে ইউ.পি. মুসলিম লীগ 'মজলিশে নেজামে ইসলামি' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। উক্ত সংগঠনের সদস্য হিসেবে আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী, আল্লামা আজাদ সোবহানী ও মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীর সাথে মাওলানা মওদূদীও উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সনে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর ক্লাসের বক্তৃতায় ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করায় লাহোর ইসলামিয়া কলেজের ভিজিটিং প্রফেসরের পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

৭. ইসলামি বিপ্লবের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাঃ ১৯৩২-১৯৪৩ সাল মাওলানা মওদূদীর ইসলামি গবেষণার ২য় পর্ব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এই সময়ে তিনি 'ইসলামি তাহযীব আওর উসকে উসুলে মুবাদী (উর্দূ, খৃ. ১৯৩৩)' যা বাংলায় 'ইসলামি সংস্কৃতির মর্মকথা', 'মাসয়ালায়ে জাবর ওয়া কাদর' (উর্দূ), খৃ. ১৯৩৩), যা বাংলায় 'তাকদীরের হাকীকত', 'তানকীহাত (উর্দূ, খৃ. ১৯৩৯)' যা বাংলায় 'ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব', 'তাফহীমাত (১ম খণ্ড, খৃ. ১৯৩৩-১৯৩৯)' যা বাংলায় 'নির্বাচিত রচনাবলী (১ম খণ্ড)', 'হাদিস আওর কুরআন (উর্দূ, খৃ. ১৯৩৪)', 'হুকুকুয যওজাইন (উর্দূ, খৃ. ১৯৩৫)' যা বাংলায় 'স্বামী-স্ত্রীর অধিকার', 'ইসলাম আওর যাবতে বেলাদাত (উর্দূ, খৃ. ১৯৩৫)' যা বাংলায় 'ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ', 'নয়া নিজামে তা'লীম (উর্দূ, খৃ. ১৯৩৬)' যা বাংলায় 'শিক্ষা ব্যবস্থার ইসলামি দৃষ্টিকোণ', 'ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার খসড়া প্রণয়ন (বাংলা)' নামক গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়। 'রিসালায়ে দীনিয়াত (উর্দূ, খৃ. ১৯৩৭)', যা বাংলায় 'ইসলাম পরিচিতি' নামে খ্যাত এই বইটি দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদের শিক্ষামন্ত্রীর ফরমান অনুসারে মেট্রিক শ্রেণীর জন্য পাঠ্যবই আকারে লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। 'সুদ-১ ও সুদ-২ (উর্দূ, খৃ. ১৯৩৬-১৯৩৭)' যা বাংলায় 'ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ' এবং 'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং' নামে প্রকাশিত, 'পর্দা (উর্দূ, খৃ. ১৯৩৬)' যা বাংলায় 'পর্দা ও ইসলাম' নামে প্রকাশিত, 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ (১-৩ খণ্ড, উর্দূ, খৃ.. ১৯৩৭-১৯৩৯)' নামে প্রকাশিত, 'মাসয়ালায়ে কওমীয়াত (উর্দূ, খৃ. ১৯৩৮)' এবং 'ইসলামি ইবাদত পার এক তাহকীকী নযর (উর্দূ, খৃ. ১৯৩৯-১৯৪০)' যা বাংলায় 'ইসলামি ইবাদতের মর্মকথা', 'তাজদীদ ওয়া ইহ্‌য়ায়ে দীন (উর্দূ, খৃ. ১৯৩৯)' যা বাংলায় 'ইসলামি রেনেসাঁ আন্দোলন', 'এক আহম ইস্তেফ্‌তা (উর্দূ, খৃ. ১৯৪০)' 'নয়া নিজামে তালীম (উর্দূ, খৃ. ১৯৪১)', 'কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইস্‌তেলাহেঁ (উর্দূ, খৃ. ১৯৪১)' যা বাংলায় 'কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা', 'ইনসান কা মা'আশী মাস্‌য়ালা আওর উস্‌কা হাল (উদূ, খৃ. ১৯৪১)' যা বাংলায় 'অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামি সমাধান' এবং 'এক সালেহ্ জামায়াত কী জরুরত (উর্দূ, খৃ. ১৯৪১)' যা বাংলায় 'একটি সত্যনিষ্ঠ দলের প্রয়োজন' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

উপরে পেশকৃত সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় দেখা যায়, মাওলানা মওদূদী ১৩ বছর বয়স থেকে শুরু করে ৩৮ বছর বয়স পর্যন্ত ২৫ বছরে বিভিন্ন জীবনঘনিষ্ঠ ইসলামি গবেষণা বা কুরআন-হাদিসের ভিত্তিতে ৬০টিরও বেশি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তিনি মদিনা, তাজ, মুসলিম, আল-জমিয়ত এবং ১৯৩২ সাল থেকে তরজুমানুল কুরআন পত্রিকায় নিয়মিত রচনা–গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখেছেন ও প্রকাশ

করেছেন। এ সময় এতো সব মৌলিক বিষয়ে পাক ভারত উপমহাদেশ তথা অন্যান্য মুসলিম দেশে কোনো আলেমে দীনের লেখা দেখা যায়নি। কুরআনের আয়াত ও হাদিসে রসূলের সা. ভিত্তিতে মৌলিক রচনা ও গবেষণা করতে করতে তিনি কুরআনে পাকের তাফসির করার বিষয়ে ব্যাপক ইলম অর্জন করেন, যা তাঁকে একজন অসাধারণ মুফাস্‌সির হিসেবে গড়ে তুলেছে।

৮. তাফহীমুল কুরআন লেখার সূচনা: ১৯৪২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে মাওলানা মওদূদী দারুল ইসলাম ট্রাস্টে অবস্থানকালে তাঁর অনবদ্য তাফসির তাফহীমুল কুরআন (কুরআনকে হৃদয়ঙ্গম) নামক তাফসির গ্রন্থটি লেখা শুরু করেন এবং তাঁর সম্পাদিত ও প্রকাশিত বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা তরজমানুল কুরআনে তা প্রকাশ করতে থাকেন।

৯. তাফসির রচনায় ইসলামি নিজাম বাস্তবায়নের ধারা সংযোজন: কুরআন মজীদ তার বাহক হযরত মুহাম্মদ সা.-এর নিকট তৎকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে বাস্ত বায়নযোগ্য করে আয়াত আয়াত করে নাযিল হয়েছে এবং তিনি সা. তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেছেন। কারণ কুরআন সারা বিশ্বের মানবসমাজের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তাই কুরআন সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের জন্যেই নাযিল হয়েছে, শুধু সাওয়াবের আশায় তিলাওয়াতের জন্য নয়। কুরআন নাযিলের মাধ্যমে নবুওয়াতি যুগ, খেলাফতে রাশেদার যুগ ও পরবর্তী তাবেয়ী-তাবে তাবেয়ী যুগের পর হাজার বছর ধরে কুরআন পাকের প্রচুর সংখ্যক তাফসির রচিত হয়েছে।

১০. তিরিশ বছর সাধনাশেষে: তবে দাওয়াতী দৃষ্টিভংগির তাফসির খুব কমই রচিত হয়েছে। তাফহীমুল কুরআন একটি দাওয়াতী দৃষ্টিভংগী সজ্জাত তাফসির। দীর্ঘ তিরিশ বছরের সাধনায় তিনি ১৯৭২ সনের ৭ জুন যুহর নামাযের পূর্বে তাফহীমুল কুরআন লেখার কাজ পরিপূর্ণ করেন এবং ৩০ জুন লাহোরের একটি ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে তাফহীমুল কুরআন সমাপনী সভায় আলোচনা, দুআ ও মুনাজাত করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন।

১১. তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা রচনা: কুরআন পাকের কোনো ভূমিকা নেই। মাওলানা মওদূদী যেহেতু তাঁর তাফহীমুল কুরআন সাধারণ পাঠকের জন্য রচনা করেছেন তাই কুরআনকে বোঝার জন্য উস্‌লুত তাফসিরের ভিত্তিতে কুরআনকে কিভাবে পড়তে হবে, বুঝতে হবে ও অনুধাবন করতে হবে এ বিষয়ে একটি ভূমিকা রচনা করেছেন।

১২. প্রতিটি সূরার পটভূমি বর্ণনা: এই তাফসিরের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, প্রতিটি সূরার শুরুতে সূরার মধ্যে কি কি বিষয় নিহিত আছে তার সংক্ষিপ্তসার, পটভূমি, পূর্বাপর ঘটনা ও তা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় ইত্যাদি উল্লেখ করে একটি 'পটভূমি' পেশ করা হয়েছে। ঐ পটভূমি পড়লে সূরা সম্পর্কে পাঠকের অগ্রিম অনেক বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার কারণে আয়াতগুলি বুঝতে, আয়াতগুলির মাধ্যমে আল্লাহর বক্তব্য, আদেশ-উপদেশ সব বিষয়ে জানতে সহযোগিতা হয়। এ ধরনের পটভূমি অন্য কোনো তাফসিরে নেই। তাফসিরের ক্ষেত্রে এটি একটি স্বতন্ত্র ধারা।

১৩. তাফহীমুল কুরআনের রচনারীতি ও উৎস: কুরআন তাফসির করার যে ছয়টি মূলনীতি রয়েছে। সেই মূলনীতিতে মাওলানা মওদূদী তাঁর এই তাফসির রচনা

করেছেন। কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে কুরআনের তাফসির পেশ করার রীতি তিনি যথাযথভাবে পেশ করেছেন। যেখানেই একটি আয়াতের বিষয়ে আরও বিভিন্ন আয়াত রয়েছে সে আয়াতগুলোকে তিনি সংশ্লিষ্ট টীকায় এক জায়গায় উপস্থাপন করে সমস্ত আয়াতগুলির উদ্দেশ্য আলোচনা করে সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন।

অতঃপর তিনি দ্বিতীয় উৎস হিসেবে হাদিসে রসূল সা.-কে উপস্থাপন করেছেন। তবে তিনি বাক্যের প্রয়োজনে হাদিসের যতোটুকু অংশ দরকার ঠিক ততোটুকুই এনেছেন।

তাফসির করার তৃতীয় উৎস সাহাবাগণের রা. বর্ণনা ও ব্যাখ্যা। যেহেতু কুরআন যাঁর ওপর নাযিল হয়েছে তিনি কুরআনকে যাঁদের কাছে পেশ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন এই কুরআনের ব্যাখ্যার প্রথম ও প্রধান শ্রোতা। ফলে হাদিসে রসূলের সা. পরে সাহাবাগণের রা. ব্যাখ্যা ও বর্ণনা কুরআন তাফসিরের ক্ষেত্রে তৃতীয় উৎস হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। মাওলানা মওদূদী তাঁর তাফসিরে এই উৎসকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছেন।

তাফসির করার চতুর্থ রীতি হিসেবে তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন ও প্রাথমিক যুগের মুজতাহিদ–মুহাদ্দিসগণের ব্যাখ্যার অনুসরণ করা অনেকে মূল উৎসের অনুকরণ করা বলে মনে করেন। মাওলানা মওদূদী এই তাফসিরের ক্ষেত্রে উক্ত রীতিও অনুসরণ করেছেন। তবে যেক্ষত্রে একটি বিষয়ে তাঁদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতের দেখা পেয়েছেন সেখানে যাচাই ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে অধিকতর যুক্তিসংগত ও উপযোগী মতটিকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে ইমামুদ্দীন ইসমাঈল ইবনে কাসীর র. অনুরূপ কথা বলেছেন।

এছাড়াও প্রাচীন আমলের তাফসিরগুলো থেকে ইমাম–মুফাস্‌সিরগণের অনেক ব্যাখ্যাকে তিনি তাঁর তাফসিরে উপস্থাপন করেছেন। এ ছাড়াও বিষয়ের প্রয়োজনে কুরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে ওলামায়ে সালফ ও ওলামায়ে খালাফের (বর্তমান কালের) অনেক ব্যাখ্যাকে তিনি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছেন।

অতএব, মাওলানা মওদূদী তাফসির করার স্বীকৃত রীতিসমূহকে অনুসরণ করেই তাঁর বিখ্যাত তাফসির তাফহীমুল কুরআন রচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

“সর্ব প্রথম এটা অবশ্যই প্রয়োজন যে, আপনাকে কুরআন মজীদের তাবীল ও তা’বীর অর্থাৎ তাফসির করার সঠিক পদ্ধতি ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। আপনি যে আয়াতের অর্থ অনুধাবন করতে চান, প্রথমে আরবি ভাষার রীতি অনুযায়ী সে আয়াতের গঠনপ্রণালী এবং শব্দসমূহের উৎপত্তি ও অর্থ (Construction) সম্পর্কে চিন্তা করুন। অতঃপর পূর্বাপর আলোচনার (Context) সাথে মিলিয়ে দেখুন। তারপর কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা একই বিষয় সংক্রান্ত অন্যান্য আয়াতসমূহ একত্র করে দেখুন কোন অর্থটি গ্রহণ করলে এ আয়াতগুলোর সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে আর কোন অর্থ গ্রহণ করলে হবে বিপরীত অর্থ। (এ কথা মনে রাখতে হবে যে, একই বক্তার কোনো কথা যদি দুই বা ততোধিক অর্থবোধক হয়, তবে তার ওই অর্থই গ্রহণ করতে হবে, এ বিষয়ে তার অন্যান্য বাণী ও বর্ণনা যে অর্থ প্রকাশ করে) এতোদূর পর্যন্ত আপনি কুরআনের অর্থ স্বয়ং কুরআনের আলোকে বুঝতে ও জানতে চেষ্টা করার পর আপনাকে দেখতে হবে, যে মহান নবী মুহাম্মদ সা. প্রকৃতপক্ষে এই কুরআনের বাহক ছিলেন, তাঁর আমল ও বাণী দ্বারা এ আয়াতের কি অর্থ বোঝা যায়। অতঃপর দেখতে হবে, যে

লোকগুলো তাঁর সঙ্গী-সাথী ও নিকটতম অনুসারী ছিলেন তাঁরা আয়াতটির অর্থ কি বুঝেছিলেন।" এ হচ্ছে কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি।

উপরে বর্ণিত পাঁচটি মূলনীতি ছাড়াও ষষ্ঠ মূলনীতি হচ্ছে– সুস্থ নিষ্কলুষ বিচার-বুদ্ধি, দীনের যথার্থ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা (تفقه في الدين)। 'সুস্থ বিচার-বুদ্ধি জগতের সব কাজেই প্রয়োজন। সুস্থ জ্ঞান ছাড়া তো তাফসির-এর প্রথম চারটি উৎসও প্রয়োগ বা ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কিন্তু সুস্থ বিবেক বা বিচার-বুদ্ধিকে কুরআন তাফসির-এর একটি স্বতন্ত্র উৎস হিসেবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, কুরআন মাজীদে এমন অনেক রহস্য ও সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে, যেগুলোর ওপর কিয়ামত পর্যন্ত মেধা ও বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। তাফসির-এর প্রথম পাঁচটি উৎস দ্বারা এ ধরনের বিষয়গুলো সম্পর্কে একটি মোটামুটি এবং প্রয়োজনীয় ধারণা তো লাভ করা যায় বটে, কিন্তু এগুলোর অন্তর্নিহিত সমস্ত রহস্য কোনো যুগেই উদ্ঘাটন করে শেষ করা সম্ভব নয়। এ এক স্বতসিদ্ধ কথা যে, কুরআনুল কারীমের এ ধরনের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণার দুয়ার কিয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে। যাদেরকে আল্লাহ পাক বিচার-বুদ্ধি, দীনের নির্ভেজাল বুঝ এবং আল্লাহর প্রতি ভয় ও আনুগত্যের অমূল্য সম্পদ দান করেন, তারাই গভীর চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে এসব বিষয়ের গভীরে পৌঁছতে সক্ষম হন। সকল যুগের মুফাস্‌সির ও কুরআন গবেষকগণই নিজ নিজ উপলব্ধি অনুযায়ী এসব বিষয়ে নতুন নতুন তথ্য উপস্থাপন করেছেন। এটা হচ্ছে মূলত দীনের সেই বুঝ ও যথার্থ জ্ঞান, যেটা রসূলুল্লাহ সা. মহান আল্লাহর কাছে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর জন্যে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন: اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ وَفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ "হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে (ইবনে আব্বাসকে) কুরআনের ব্যাখ্যা করার জ্ঞান এবং দীনের সঠিক বুঝ দান করো।"

এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, মেধা, বিবেক ও বিচার-বুদ্ধি দ্বারা উদ্ঘাটিত কোনো মত ও তথ্য যদি দীনের ও শরীয়াহর মূলনীতির সাথে এবং তাফসিরের প্রথম পাঁচটি ভিত্তি ও উৎসের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। দীন ও শরীয়াহর মূলনীতির তোয়াক্কা না করে নিজের কোনো মত বা উদ্ভাবনকে অকাট্য মনে করাটা 'মনগড়া তাফসির'। এ ধরনের মনগড়া মত বা ব্যাখ্যাদানকারীদের জন্য রসূলুল্লাহ সা. জাহান্নামের আবাসের সংবাদ দিয়েছেন। এ ধরনের ব্যাখ্যা বা মতামতের কোনো মূল্য ইসলামে নেই।

মাওলানা মওদূদী র. উপরোক্ত ব্যাখ্যা-সূত্র সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন এবং সে অনুযায়ী তিনি তাফহীমুল কুরআনের তাফসিরে উপরোক্ত সূত্রসমূহের যথাযথ প্রয়োগ করেছেন।

১৪. তাফহীমুল কুরআনের তাফসির রীতির আরও অন্যান্য উৎস: তাফসির করার ক্ষেত্রে আল্লামা সাইয়েদ মওদূদী রহ. যদিও অধিক ক্ষেত্রে তাফসিরের মূল উৎসের ব্যবহার করেছেন, তদুপরি তিনি পূর্ববর্তী মুফাসসেরীনে কেরামের তাফসিরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। একান্ত মূল উৎসের সাথে সামঞ্জস্যহীন না হলে তিনি তাদের রায়কেই পেশ করেছেন। এ ক্ষেত্রে ইসলামের প্রাথমিক যুগের সীরাতুর রসূল, সীরাতুন্নবী, কিতাবুল মাগাযী, তাবাকাতসহ অন্যান্য ঐতিহাসিক সূত্রগুলি ব্যবহার করেছেন। সমকালীন মুফাস্‌সিরগণের বিখ্যাত তাফসির সমূহের সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি অন্ধ অনুসারীর ভূমিকা না নিয়ে যাচাই-বাছাইয়ের নীতি অবলম্বন করেছেন।

১৫. তাফহীমুল কুরআনের তরজমা বাক্যানুগ: তরজমা বা অনুবাদ কোনো সহজ কাজ নয়। যে ভাষায় অনুবাদ করা হয় সেই ভাষা ও যে ভাষা থেকে অনুবাদ করা হবে, সেই ভাষা অর্থাৎ উভয় ভাষায় সমান দক্ষতা না থাকলে তরজমা বা অনুবাদ করা যায় না। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. তাঁর তাফসির 'বায়ানুল কুরআন'-এ কুরআনের আয়াতের তরজমা মাদরাসা পড়ুয়া ছাত্রদের জানা-বুঝার সুবিধার্থে শব্দানুসারী তরজমা করেছিলেন। সাধারণ পাঠক যারা আরবি ভাষায় পড়াশোনা করেননি তাদের জন্য এ ধরনের তরজমা পড়ে বাক্যের অর্থ বোঝা কিছুটা কঠিন। কিন্তু মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা মওদূদী, মুফতি শফী, আমীন আহসান ইসলাহী, ইদরীস কান্দহলবী (র.) প্রমুখ তরজমা করেছেন ভাবার্থক, শব্দার্থক নয়। ফলে যারা মাদ্‌রাসা পড়ুয়া ছাত্র নয়, সাধারণ বিষয়ে শিক্ষিত পাঠক, তারা আরবি পড়তে না পারলেও তরজমার বাক্যটি পড়ে নিজ ভাষায় আল্লাহর কালামকে বুঝতে পারে।

১৬. ইসলামি আন্দোলনের সফল উপস্থাপন: তাফহীমুল কুরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'তাহরীকে ইসলামি'। এখানে উল্লেখ থাকে যে, কুরআনে পাক হযরত মুহাম্মদ সা.-এর মক্কী জীবন ও মাদানী জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার নিরিখে আয়াত-আয়াত ও সূরা-সূরা করে নাযিল হয়েছিল। ঐ সময় ইসলাম কায়েমের জন্য বা আল্লাহর জমিনে আল্লাহ্ রাজ কায়েমের জন্য স্বয়ং মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সা. তাঁর নেতৃত্বে সাহাবিগণকে নিয়ে 'তাহরীকে ইসলামি' (ইসলামি আন্দোলন) গড়ে তুলেছিলেন। আমাদের পূর্বসূরীদের লিখিত বিভিন্ন তাফসিরে এর কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ইসলামি আন্দোলন কি, কেনো, কিভাবে আন্দোলন হিসেবে উল্লেখ নেই।

'তাফহীমুল কুরআনের' পাঠক যারা ইসলাম কায়েমের আন্দোলনে জড়িত, তারা উপরোক্ত তাফসির থেকে রসূলের জমানায় ইসলামি আন্দোলন করতে গিয়ে আমাদের নবী সা. ও তাঁর সাহাবাগণ কি কি ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা কিভাবে মোকাবিলা করেছিলেন, এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর নির্দেশনা কি ছিলো বা রসূলের সা. প্রদর্শিত পন্থা কি ছিলো তা যে সকল আয়াতে উল্লেখ আছে, তাঁর তাফসিরে তিনি সে সব আন্দোলনের বিষয়গুলি ও বর্তমান বাস্তবতায় কি শিক্ষণীয় বিষয় উল্লেখ করায় তাঁরা তাঁদের অনুসরণের দিশা পেয়েছেন। তিনি তাফহীমুল কুরআনে ইসলামি আন্দোলনকে নবী জীবনের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী ব্যাপকভাবে উপস্থাপন করেন। হাদিস, ফিকহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।'

১৭. আধুনিক কুরআনিক ব্যাখ্যা পরিবেশন: মাওলানা মওদূদীর তাঁর তাফসিরে তাফহীমুল কুরআনে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের কুরআনের ভিত্তিতে আধুনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী বলেন, 'তিনি কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের এমন কিছু আধুনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা অন্যান্য তাফসির গ্রন্থে সত্যিই বিরল। যেমন {13:الشورى} [أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ] আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ইকামাতে দীন (إقامة دين)-এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। إله শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ তাআলা যিনি সব রকম ইবাদত ও আনুগত্য লাভের এবং ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর বাইরে অন্য আর কোনো শক্তি বা ব্যক্তি বা সমাজ বা রাষ্ট্র যে এই ক্ষমতা ও আনুগত্যের অধিকারী নয়, তাকেই ইলাহ বলা হয়।

رب শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, রব অর্থ প্রতিপালক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রক, ক্ষমতাশালী, মালিক ও মনিব, সার্বিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী যা কোনো ব্যাপারেই ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও কোনো শক্তির নেই। একমাত্র আল্লাহই রব, অন্য কেউ কোনোভাবেই রব নয়, তা তিনি রবের ব্যাখ্যায় পেশ করেছেন।

عبادت-এর অর্থ মানব ও জিন জাতি عبد হিসেবে মহান আল্লাহর عبوديت অর্থাৎ গোলামী, বন্দেগী, আপন মনিবের আনুগত্য, আদেশানুবর্তিতা, তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার, তাঁর নেয়ামতের স্বীকৃতি, তাঁর বন্দেগীর আনুষ্ঠানিকতা শুধু গোলাম কর্তৃক মনিবের সামনে মাথা নত করাই নয়, বরং হৃদয়-মনও অবনত থাকা, এসকল অর্থেই ইবাদত শব্দটি পেশ করা হয়েছে।

তারপর دين শব্দের ব্যাখ্যায় জীবন-ব্যবস্থা, অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-ব্যবস্থাকে নিজেদের জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে ও সর্বক্ষেত্রে কুরআনে প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসারে কায়েম করা -এটাকে তিনি দীন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

উপরে বর্ণিত কুরআনের শব্দ বা আয়াতাংশ এক বা একাধিক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মাওলানা মওদূদী এসব আয়াতের বা শব্দের সেই অর্থই গ্রহণ করেছেন যা দ্বারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে মানব-সমাজ রাসূলে পাক সা. প্রদর্শিত নবুওয়াতি পদ্ধতি এবং তাঁর পরবর্তী 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত'-এর পদ্ধতিতে খিলাফত রাষ্ট্র ও সমাজ তথা আল্লাহর আইনের রাজ কায়েম হয়।

১৮. আহকামুল কুরআন: কুরআন তাফসির করার আরেকটি রীতি হলো কুরআনে পাকে বর্ণিত আইন ও বিধান সম্পর্কিত যে সকল আয়াত রয়েছে তার আলাদা তাফসির করা। এ ধরনের তাফসিরকে 'তাফসিরুল আহকাম' বলা হয়।

মাওলানা মওদূদী র. তাফহীমুল কুরআনে ইসলামি আন্দোলনকে তুলে ধরার সাথে সাথে ইসলামি আইন-কানুনকে সমাজে কায়েমের লক্ষ্যে আয়াতে আহকামগুলিকে বিশেষভাবে দীর্ঘ ব্যাখ্যা সহকারে উপস্থাপন করেছেন।

১৯. ইসলামি দাওয়াত ঘরে ঘরে: ইসলামকে জানা ও মানার প্রয়োজনে, ইসলামকে নিজেদের জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে বাস্তবায়নের প্রয়োজনে কুরআনের যে জ্ঞান দরকার তাফহীমুল কুরআন সে জ্ঞান পরিবেশন করে। এ কারণে লক্ষ লক্ষ নেতা ও কর্মীদের ঘরে ঘরে ইসলামি আন্দোলনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার মূল বাহন তাফহীমুল কুরআন।

একজন পাঠক এই কিতাব পাঠ করে মক্কী ও মাদানী যুগের আন্দোলনের ধারা ও শিক্ষা লাভ করে থাকেন। তাতে তারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নে জীবন বাজি রেখে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হন। কুরআন মজীদকে তার স্বরূপে জীবন্ত করে উপস্থাপন করতে পারাটাই মাওলানা মওদূদীর একক কৃতিত্ব।

মক্কী জীবনে হযরত মুহাম্মদ সা. যেভাবে কিছু গোপনে কিছু প্রকাশ্যে ইসলামের প্রসার ও প্রচারে দাওয়াতী কাজ করে গেছেন, সেই সুন্নাতের অনুসরণে মাওলানা মওদূদী ইসলামি আন্দোলনের 'দাওয়াত ও কর্মসূচি' কার্যকর করার জন্যে এই তাফসিরের মাধ্যমে রূপরেখা পেশ করেছেন।

২০. কুরআনে সচিত্র ইতিহাস বর্ণনা: কুরআনে মজীদে মহান আল্লাহ তাআলা প্রাচীন যুগের নবীগণের এবং প্রাচীন জাতিগুলোর অনেক ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। সাধারণত

পাঠকগণ ইতিহাস বলতে প্রাচীন কিছু সত্য-মিথ্যা সংবলিত কল্পকাহিনী বা বীরত্বের কাহিনী বুঝে থাকেন। কুরআন পাক যেহেতু আল্লাহর কালাম, কাজেই এই কিতাবে অসত্য কোনো কল্পকাহিনী বর্ণনার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু কুরআন মজীদে বর্ণিত কাহিনীগুলো যেহেতু কয়েক হাজার বছর আগের, সেগুলোকে কল্পকাহিনী নয়, বাস্তবে সংঘটিত কাহিনী এ হিসেবে উপস্থাপন করতে গিয়ে মাওলানা মওদূদী তাঁর তাফসিরে প্রাচীন জাতিগুলোর বর্ণনায় সমকালীন সমাজিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। তার সাথে সাথে ইতিহাস স্বীকৃত তৎকালীন ও বর্তমান মানচিত্রগুলি তুলনামূলকভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং সংঘটিত ঐসব কাহিনীর বাস্তব নমুনাগুলো যা বর্তমানে জরাজীর্ণ আকারে বিভিন্ন দেশে পাওয়া যায় সে সকল স্মৃতিচিহ্ন ও চিত্রগুলো তাফহীমুল কুরআনে উপস্থাপন করেছেন। তিনি তাফসির রচনাকালে কুরআনে উক্ত জায়গাগুলো সফর করেছেন, দেখেছেন এবং প্রাচীন অবস্থার বর্ণনা ছাড়াও বর্তমান অবস্থাও উপস্থাপন করেছেন। তাফসিরে সর্বপ্রথম মানচিত্র ও ধ্বংসাবশেষের ছবি সংযোজন করেন।

২১. ইহুদিদের কুরআনিক ইতিহাস পেশ: মাওলানা মওদূদী কুরআন মজীদের বর্ণিত ইহুদীদের ব্যাপারে নাযিলকৃত আয়াতসমূহের তাফসিরে বিভিন্ন সূরার প্রায় ১৭০টি আয়াতের টীকায় ইহুদীদের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

তিনি পূর্ববর্তী নবীগণের জীবনী আলোচনায় তাঁদের নিকট প্রেরিত 'তাওরাত, ইনজীল, যাবুর ও অন্যান্য সহীফাগুলোর শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাদের নবীদেরর জীবন ও সংগ্রাম যা কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে তা তুলে ধরেন কুরআনের বর্ণনার ভিত্তিতে। কুরআনকে সর্বশেষ প্রেরিত (Latest Version) কিতাব ধরে তার আলোকে তিনি উপরোক্ত ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর 'তাহরীফ'কৃত অংশসমূহ চিহ্নিত করেছেন। তিনি উক্ত ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর আয়াত চেনার পদ্ধতি সঠিকভাবে যাচাই-বাচাই করার যে পন্থা উদ্ভাবন করেছেন সূরা আলে ইমরানের দ্বিতীয় নং টীকা পড়লে তা বোঝা যায়।

মাওলানা মওদূদী র. তিনি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতও। তাঁর পূর্বে এই তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে অধিকতর অবহিত হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন ইবনে তাইমিয়া র. (খৃ. ১২৬৩-১৩২৮)। তাঁর পরে রহমাতুল্লাহ কিরানবী, তার পরে মাওলানা মওদূদী এই ব্যাপারে পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। তিনি প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থগুলো সম্পর্কে তাঁর 'আল-জিহাদ' নামক কিতাবেও ব্যাপক আলোচনা করেছেন। ইহুদীদের অতীত ও বর্তমান অবস্থা, তাদের কর্মকাণ্ড, তাদের উদ্দেশ্য, তাদের ষড়যন্ত্রসহ তাবৎ বিষয়ে তিনি তাফহীমুল কুরআনে তুলে ধরেছেন।

২২. খ্রিস্টবাদের কুরআনিক ইতিহাস পেশ: কুরআন পাকে ইসরাঈলী বা ইহুদী নবীগণের আ. এবং তাঁদের তৎকালীন উম্মতগণের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি হযরত ঈসা আ.-এর অনুসারী বলে দাবিদার খ্রিস্টানদের বিষয়েও আলোচনা রয়েছে। এ বিষয়ে কুরআনের প্রায় ৮৫টি আয়াতে তাঁদের ঘটনাসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে এবং হযরত ঈসা আ.-এর কওমের বিভিন্ন ভ্রান্তি ও ভুল চিন্তাধারাকে এবং তাদের হঠকারিতাকে তুলে ধরা হয়েছে। হযরত ঈসা আ.-এর ওপর নাযিলকৃত কিতাব ইনজীল যা New Testament নামে খ্যাত তার মধ্যে তাদের হাওয়ারীগণের যে 'তাহরীফ' তাকে তিনি ইনজীলের আয়াতগুলির সাথে আলোচনা করে তাফহীমুল কুরআনে তুলে ধরেছেন। সূরা আলে ইমরানের দ্বিতীয় নং টীকা পড়লে তা বোঝা যায়।

২৩. আল-কুরআনের রাজনৈতিক শিক্ষা: ইসলামি আন্দোলনকারীদের জ্ঞানের মূল উৎস হচ্ছে আল-কুরআন। অন্যান্য শিক্ষার সাথে রাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাও মুসলমানদেরকে আল-কুরআন থেকেই অর্জন করতে হয়। মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে মুসলমানদের শাসন থাকলেও শরীয়তী শাসন কোথাও খণ্ডিতভাবে, কোথাও ঐচ্ছিকভাবে চালু ছিলো। কিন্তু জনসাধারণে রাজনীতি করার, রাজনৈতিক দল গঠন করার, আন্দোলন করার কোনো অনুমতি ছিলো না। বরং কেউ সমকালীন মুসলিম রাজা-বাদশাহ বা আমীরদের সমালোচনা করলে তাকে বিদ্রোহ বলে গণ্য করা হতো। সমালোচনাকারীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো। ফলে জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতি চর্চা ছিলনা।

আল কুরআনে 'রাজনৈতিক শিক্ষা' বিষয়ক প্রায় ১৮৭টি আয়াত রয়েছে। এ তাফসিরে তার ব্যাখ্যায় ইসলামি রাজনীতির বৈশিষ্ট্য, ইসলামি রাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য, অনৈসলামিক রাজনীতির বৈশিষ্ট্য তুলনামূলক পার্থক্য, ইসলামি রাজনীতি প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য যেসব শিক্ষণীয়, অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় বিষয় রয়েছে তা তিনি স্থানে স্থানে যেখানে এ সম্পর্কীয় আয়াত রয়েছে তাতে তাঁর তাফসিরে অত্যন্ত সুন্দররূপে আলোচনা করেছেন। আগের তাফসিরগুলিতে এ বিষয়টি রাজনীতির নিরিখে উপস্থাপন করা হয়নি। এক্ষেত্রে তিনি সফলতা লাভ করেছেন। এটা এই তাফসিরের অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

২৪. আল-কুরআনের অর্থনৈতিক শিক্ষা: মানব জীবনে অর্থনীতি একটি জরুরী বিষয়। কুরআন পাকে প্রায় ১৫০টি আয়াতে মহান আল্লাহ অর্থনীতির একটি সম্পূর্ণ ধারণাসহ নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান পেশ করেছেন। যাকাত ব্যবস্থা ছাড়াও সুদবিহীন অর্থব্যবস্থা, সম্পদের মালিকানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, মোহরানা, লেনদেন ইত্যাদি বিষয় তাতে নিহিত। 'তাফহীমুল কুরআনে' আল্লাহ্ পাকের নির্দেশিত 'অর্থনৈতিক শিক্ষাকে' তিনি ব্যাপকভাবে আধুনিক অর্থনীতির সাথে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করেছেন এবং ইসলামি অর্থনীতির মৌলিক কাঠামো তিনি ব্যাপকভাবে উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বিকল্প, স্বতন্ত্র ও কার্যকর একটি অর্থব্যবস্থা পেশ করেছেন। এবিষয়ে তাফহীমুল কুরআনের কৃতিত্ব ও অবদান অনন্য।

২৫. আল-কুরআনে সাংস্কৃতিক শিক্ষা: ইসলামি তাহযীব-তমদ্দুন প্রসঙ্গে আমাদের প্রচলিত যে ধারণা, তাকে অতিক্রম করে মাওলানা মওদূদী 'তাফহীমুল কুরআনে' ইসলামি সংস্কৃতির মূল কাঠামো তুলে ধরেছেন। সাধারণত সংস্কৃতি বলতে আমরা নাচ-গান, কবিতা, সাহিত্য, উপন্যাস, নাটক, সিনেমা, খেলাধুলা, সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, বিভিন্ন কলা ইত্যাদিকে বুঝে থাকি। কিন্তু মাওলানা মওদূদী র. সম্ভবত এই প্রথম উপস্থাপন করলেন যে, সংস্কৃতি বলতে নাচ-গান, বিভিন্ন কলা, নাটক, নভেল, গল্প, সাহিত্য, সিনেমা, মুভি ইত্যাদিকে বুঝাতো তবে সকল মানুষই তাতে জড়িত থাকতো। সমাজের ক্ষুদ্র একটি অংশ বর্তমানে এসব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। কাজেই বর্তমান প্রচলিত সংস্কৃতির অপর নাম যে জীবন বলা হচ্ছে তা সঠিক নয়। ইসলাম সংস্কৃতি বলতে বুঝায়, মানব জাতিকে আল্লাহ্পাক যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, সেগুলি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী বাস্তবায়িত করা। ইসলামি সংস্কৃতি হচ্ছে আল্লাহর উপর ঈমান, ফেরেশ্তাদের উপর ঈমান, আল্লাহ্ প্রেরিত কিতাবের উপর ঈমান, রসূলের সা. উপর ঈমান, আখেরাত বা পরকালের উপর ঈমান, কল্যাণ-অকল্যাণ আল্লাহ্র পক্ষ

থেকেই হয় তার উপর ঈমান রেখে সেই অনুসারে জীবন যাপন করাই হলো প্রকৃতপক্ষে একজন মুমিনের বা মুসলিমের জীবন ঘনিষ্ঠ সংস্কৃতি। এই বিষয়টি তিনি কুরআনের তাফসিরে এ সংক্রান্ত প্রায় ৪৩১টি আয়াতের ব্যাখ্যায় তুলে ধরেছেন।

২৬. আল-কুরআনের নৈতিক শিক্ষা: আইন ও শাসন মানুষকে ন্যায়-নীতির ওপর চলতে বাধ্য করে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, বিভিন্নভাবে অন্যায়কারীরা অন্যায় কাজ করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করে থাকে। এখানে প্রচলিত আইন-কানুন তাকে বাধা দিতে পারছে না। কিন্তু আল্লাহর প্রেরিত কালামে তাঁর বান্দার চলার প্রয়োজনে যে নীতি-নৈতিকতা পেশ করেছেন মানুষ যদি তাকে অনুসরণ করে তাহলে আইন-কানুনের কড়াকড়ির প্রয়োজনীয়তাই থাকে না। তার মধ্যে মিথ্যা না বলা, চুরি না করা, ঘুষ না খাওয়া, সুদ না নেয়া, ঝগড়া-ফাসাদ না করা, গীবত না করা, অন্যকে অপবাদ না দেওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে কুরআন পাকে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। হাদিসে রাসূলে এগুলির ব্যাখ্যায় অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

মাওলানা মওদূদী তাফহীমুল কুরআনে কুরআনের আয়াত, হাদিসে রসূল ও সাহাবাগণের বাণীসমূহের ভিত্তিতে এসব বিষয় যথাস্থানে উপস্থাপন করেছেন। ফলে ইসলামি আন্দোলনের মূল কর্মী প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ যাদেরকে সাহাবা বলা হয় তাঁদের ওপর কুরআনী চরিত্রের যে প্রভাব পড়েছিল তাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাফহীমুল কুরআনে পেশ করা হয়েছে। যাতে করে বর্তমান যুগের মুসলিমগণও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদেরকে নিষ্ঠাবান মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন।

২৭. আল-কুরআন ও বিজ্ঞান: বিজ্ঞান এখন অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। আগে অনেক কিছুই বিজ্ঞান আবিষ্কার করলেও ধর্মবিশ্বাসীরা তার ওপর আস্থা রাখতো না। এটা কুরআন ও বিজ্ঞানের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে না জানার কারণেই হতো। মুফাস্‌সিরগণ অনেক কিছু কুরআনের সাথে তুলনা করে দেখাতে পারেননি। বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির এবং বহু কিছু আবিষ্কারের ফলে কালামে পাকের আয়াতের সাথে তা তুলনা করে দেখার সুবিধা হয়েছে। কুরআনের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক আছে। এ বিষয়টি অনেকে লেখালেখি করলেও কুরআনের কোন্ কোন্ আয়াতে বিজ্ঞানের কোন্ কোন্ সূত্রের সাথে সম্পর্ক আছে, ইঙ্গিত আছে, সাধারণত সে বিষয়ক কোনো আলাদা তাফসির লেখা হয়নি।

যেসব আয়াতে বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্যের উল্লেখ আছে, সেগুলো আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করে 'তাফহীমুল কুরআনে' দেখানো হয়েছে যে, বিজ্ঞানের সাথে তার কোনো বৈপরীত্য নেই। অতএব কুরআন যে বিজ্ঞানময় সে কথাটি তিনি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

২৮. আল কুরআনে সমাজ বিজ্ঞান: মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ না হয়ে সে চলতে পারে না। কুরআনুল করীমকে আল্লাহ্ পাক মানবের জন্যেই প্রেরণ করেছেন। কুরআনে পাকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ। অতএব মানুষের জীবনাচার সম্পর্কে কুরআন পাকে বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ বিদ্যমান রয়েছে। সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সে সকল আদেশ-নিষেধ যেখানে যেখানে এসেছে তাফহীমুল কুরআনে সে সকল আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা মওদূদী কুরআন ভিত্তিক সমাজের পরিচয়, রীতিনীতি ইত্যাদি

বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেছেন। অতএব ইসলামের সমাজ জীবন কি রকম হবে এখানে তার একটি পরিচয় আছে।

২৯. ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পেশ: মানুষের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন তা সর্বশেষ এই আসমানী কিতাবে মহান আল্লাহ পাক তাঁর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর ওপর নাযিল করেছেন। তাঁর ওপর সময়, ঘটনাবলী ও চাহিদার প্রয়োজনে আয়াতে কুরআন পথনির্দেশনা নিয়ে নাযিল হয়েছে। তাই এখানে মানব জীবনের সকল প্রকার সমস্যার সমাধান পেশ করা হয়েছে। কুরআন পাক যে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা পেশ করেছে মাওলানা মওদূদী র. সে হিসেবেই তাঁর তাফসিরে তুলে ধরেছেন। তাফহীমুল কুরআনের পাঠক এই তাফসির পাঠে দীন ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পেয়ে থাকেন। ফলে বাস্তব জীবনে কুরআনের অনুসরণ যে অসম্ভব নয় এবং অনুসরণের জন্যেই যে কুরআন নাযিল হয়েছে একথা এ তাফসিরে অত্যন্ত সহজভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩০. তাফহীমুল কুরআন নিয়ে গবেষণা: তাফহীমুল কুরআন নিয়ে যেমন সমালোচনা রয়েছে, ঠিক তেমনি তাফহীমুল কুরআনের বিষয়ে দেশে দেশে বিভিন্ন আলোচনা ও গবেষণাও চলছে। এ ক্ষেত্রে পাকিস্তান ছাড়াও সৌদি আরব ও মিসর অগ্রগণ্য। সৌদি আরবের দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দেখা গেছে, ১৯৮১ থেকে ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দ এই সাত বছরে আল-জামিয়া ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সাউদ আল-ইসলামিয়া এবং আল-জামিয়া উম্মুল কুরা নামক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাওলানা মওদূদী র. ও তাঁর অবদানের ওপর আটটি পিএইচডি ও স্নাতকোত্তর গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে।

৩১. তাফহীমুল কুরআনের পাঠক: মাওলানা মওদূদী র. তাঁর তাফহীমুল কুরআনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে কুরআন পাঠের এবং তা বোঝার স্পৃহা জাগাতে সক্ষম হয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ব্রিটিশ সরকার বাংলাদেশে তথা উপমহাদেশে কুরআন পাঠকের সংখ্যা জানার জন্য একটি জরিপ চালায়। ওই জরিপে দেখা যায় ৪৫% মানুষ কুরআন পড়তে জানে। ১৯৯৬ সালে আরেকটি জরিপে জানা যায়, বাংলাদেশের মানুষ কুরআন পড়তে জানে ৫%। কুরআন বুঝা, কুরআনের অর্থ জানা, তাফসির জানা লোকের সংখ্যা এ দেশে এক ভাগও হবে কিনা সন্দেহ।

সেক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষিত সমাজে তাফহীমুল কুরআনের বাংলা তরজমা পাঠকারীর সংখ্যা এখন কোটির উপরে। কারণ কুরআনকে সহজে বোঝার জন্য আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের মাঝে তাফহীমুল কুরআন বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। এর পরে আসে মাআরিফুল কুরআন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ও বিনা মূল্যে প্রচারিত ও সরকারিভাবে বণ্টিত হওয়ার কারণে প্রায় জায়গায় মাআরিফুল কুরআনও দেখা যায়। তাফহীমের পাঠকগণ এই শেষোক্ত তাফসিরেরও পাঠক। তাফহীমুল কুরআনের পাঠক সমাজ তাফহীমুল কুরআন থেকে নিজেদের জীবনে, পরিবারে ও সমাজে এবং রাষ্ট্রে ইসলামি জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করার একটি তাকিদ অনুভব করে থাকেন। এখানেই এ তাফসিরের সাফল্য।

৩২. তাফহীমুল কুরআনের প্রভাব: তাফহীমুল কুরআন শুধু বাংলাদেশে নয়, পাক-ভারত উপমহাদেশে এবং সমগ্র আরব দেশগুলোতে, তার্কি, রাশিয়া, চীন, সোভিয়েত

ইউনিয়ন খণ্ডিত হয়ে যে সকল মুসলিম দেশ বের হয়েছে, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, জাপান, আফ্রিকা ও আমেরিকা ছাড়াও ইউরোপের সকল দেশে যেখানেই ইসলামি আন্দোলন, ইসলামি পুনর্জারণ শুরু হয়েছে সেখানেই স্কুল, কলেজ, মাদরাসায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের প্রধান পাঠ্য হচ্ছে তাফহীমুল কুরআন।

আধুনিক শিক্ষিত সমাজে তাফহীমুল কুরআনের প্রভাব সারা বিশ্বে ব্যাপক দেখা যায়।

তথ্য নির্দেশিকা

০১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : তাফহীমুল কুরআন
০২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : খিলাফত ও মুলূকিয়াত(উর্দু)
০৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : খিলাফত ও রাজতন্ত্র (বাংলা)
০৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং
০৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : ইসলামি তাহযীব আওর উস্‌কে উসূলে মুবাদী (উর্দু)
০৬. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : ইসলাম কা আখলাকী নোক্‌তায়ে নযর (উর্দু)
০৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : পর্দা ও ইসলাম
০৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী :স্বামী-স্ত্রীর অধিকার
০৯. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : আল-আসমাউল হুসনা
১০. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : সুন্নাত কি আইনি হাইসিয়্যাত
১১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : রাসায়েল ও মাসায়েল ৫ম খণ্ড
১২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : সীরাতে সারওয়ারে আলম সা. (উর্দু), খণ্ড ১
১৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : সীরাতে সারওয়ারে আলম (উর্দু) খণ্ড ২
১৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : সীরাতে সারওয়ারে আলম (বাংলা), খণ্ড ৩-৪
১৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা
১৬. শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া : মুকাদ্দামাতুন ফী উসূলিত তাফসির
১৭. ইবনে কাসীর : তাফসিরুল কুরআনিল আযীমের ভূমিকা
১৮. রফিউদ্দীন হাশেমী, সেলিম মনসূর খালেদ : সাইয়েদ মওদূদী র.: হায়াত ও আসার (উরদূ)
১৯. রফিউদ্দীন হাশেমী, সেলিম মনসূর খালেদ : সাইয়েদ মওদূদী: ফিকরী ও কলমী আসার (উরদূ),
২০. রফিউদ্দীন হাশেমী, সেলিম মনসূর খালেদ : আবুল আলা মওদূদী: ইলমি ও ফিকরি মুতালিআ (উর্দু)
২১. আল্লামা তকী উসমানী : উলূমুল কুরআন
২২. অধ্যাপক গোলাম আযম : তাফহীমুল কুরআনের তরজমা
২৩. মাওলানা মুহাম্মদ আসেম : কুরআনের দেশে মাওলানা মওদূদী
২৪. নঈম সিদ্দীকী : ইহুদিয়াত(উর্দু)
২৫. নঈম সিদ্দিকী : নাসরানিয়াত (উর্দু)
২৬. প্রফেসর খুরশিদ আহমদ : তাফহীমুল কুরআনের ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকা
২৭. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী : তাফসিরুল কুরআন
২৮. Prof. Masudul Hasan : Sayyed Abul Ala Moududi & His thoaught.
২৯. আবদুস শহীদ নাসিম : আল কুরআন আত তাফসির
৩০. আ.ন.ম. আবদুশ শাকুর : তাফসির করার মূলনীতি: তাফহীমুল কুরআনের বৈশিষ্ট্য

আল্লামা সাইয়েদ কুতুব শহীদ ও ফী যিলালিল কুরআন

অধ্যক্ষ মাওলানা আ. ন. ম. আবদুশ শাকুর

১. পেশ কালাম: উনবিংশ শতকের শেষ এবং বিংশ শতকের শুরুর দিকে বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামি আন্দোলনের একটি প্রবাহ শুরু হয়। এই আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা মিসরের আল-ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ র. (খ্রি. ১৯০৬–১৯৪৯) পরিচালিত 'আল-ইখওয়ানুল মুসলিমূন' এবং ভারতীয় উপমহাদেশের মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী র. (খ্রি. ১৯০৩-১৯৭৯) পরিচালিত 'জামায়াতে ইসলামি'। এ সময় এই আন্দোলনকে গুরুত্ব দিয়ে ইসলামি আন্দোলনের নিরিখে তিনজন তাফসিরকার তাঁদের তাফসিরুল কুরআন রচনা করেন। এদের মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী লিখিত 'তাফহীমুল কুরআন', মিসরের প্রখ্যাত গবেষক, ইসলামি চিন্তাবিদ আল্লামা সাইয়েদ কুতুব শহীদের 'ফী যিলালিল কুরআন' এবং মিসরের আল্লামা শায়খ রশীদ রেযা লিখিত 'তাফসিরুল মানার' বিখ্যাত। এসব তাফসিরে সাবেক মুফাস্‌সিরগণের লিখিত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলীসহ নতুন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন পূর্ণাঙ্গভাবে কায়েম করার চিন্তা-চেতনা এবং এজন্য পরিচালিত আন্দোলনের গতিপথ, পন্থা ও পদ্ধতি পেশ করে ইসলামি আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার তাগিদ দেয়া। في ظلال القرآن একটি বৃহদাকার তাফসির। আমরা এখানে এই তাফসির সম্পর্কে আলোচনা পেশ করছি।

২. তাফসিরকারের বাল্য ও শিক্ষা-জীবন: সাইয়েদ কুতুব রহ. মিসরের আসইয়ুত প্রদেশের মোশা নামক গ্রামে ১৯০৬ খ্রি. এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী কুতুব ইবরাহীম, মাতার নাম ফাতেমা হুসাইন ওসমান। বাল্যকালেই তিনি মক্তবে পবিত্র কুরআন হিফয করেন। এখানেই কুরআনের সাথে আরবিভাষী সাইয়েদ কুতুবের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কায়রো শহরের উপকণ্ঠে হালওয়ান নামক অঞ্চলে পিতার সান্নিধ্যে এসে তিনি তাজহিযিয়াত দারুল উলুম মাদরাসায় ভর্তি হন। ১৯২৯ সালে সেখানকার লেখাপড়া সমাপ্ত করে মাদরাসা দারুল উলুম কায়রো বা কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি ১৯৩৩ সালে বিএ ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষাজীবন শেষ করেই স্বীয় যোগ্যতাবলে সেখানেই অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি মিসর সরকারের শিক্ষা দপ্তরের অধীনে ইন্সপেক্টর অব স্কুলস পদে চাকুরি গ্রহণ করেন। অতঃপর শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষানবিসদের ট্রেনিং দান বিষয়ে গবেষণার উদ্দেশে মিসর সরকারের শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক ১৯৪৯ সালে আমেরিকার ওয়াশিংটনে প্রেরিত হন। দুই বছর সেখানে গবেষণাকাজ শেষে ১৯৫১ সালে দেশে ফিরে আসেন। পথে ইতালি এবং সুইজারল্যান্ডেও কিছুকাল অবস্থান করেন। পাশ্চাত্যের এসব শহরে অবস্থান করে তাদের সভ্যতার পচনশীল দিক গভীরভাবে অনুধাবন করেন।

মাতার ইচ্ছানুযায়ী বাল্যকালে সাইয়েদ কুতুব কালামে মজীদ হিফজ করেন। সারা জীবন কুরআন মজীদের শিক্ষাই তাঁর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। মাতার এ অবদানের

স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি কুরআন মজীদ সংক্রান্ত তাঁর গ্রন্থ التصوير الفني في القرآن (আল-কুরআনে শিল্প সৌকর্য) নামে বাংলায় অনূদিত গ্রন্থটি তাঁর মায়ের নামে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেন, "প্রিয় আম্মা! আপনার সবচেয়ে প্রিয় আকাঙ্ক্ষা ছিলো, আল্লাহ যেন আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেন, যাতে আমি কুরআন মজীদ হিফজ করতে পারি। আল্লাহ আমাকে সুললিত কণ্ঠের নিয়ামতেও ভূষিত করেছেন। আপনার ইচ্ছা ছিলো, আমি আপনার সামনে বসে বসে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করি। আপনার এ আকাঙ্ক্ষা যখন পূর্ণ হয়েছে। আমি যখন কুরআন মজীদ হিফজ করে নেই, তখন আপনি আমাকে নতুন পথে চালিত করেছেন, সে পথে আমি এখনও অটল আছি।"[১]

৩. সাহিত্যিক জীবন: প্রগাঢ় মেধা ও ধীশক্তিসম্পন্ন সাইয়েদ কুতুব ছাত্র জীবন থেকেই কাব্য ও সাহিত্য চর্চার দিকে ঝুঁকে পড়েন। তারপর ইখওয়ান আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার পচন ও জাহিলিয়াতের দিক পর্যবেক্ষণ করে তাঁর লেখার গতি আরও বেড়ে যায়। তাই তিনি ইসলামি চিন্তাধারা ও জীবন-পদ্ধতি পুনর্গঠন বিষয়ে গড়ে তুলেন এক বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার, যা ইসলামি আন্দোলনের অনন্য পাথেয় হয়ে ওঠে। সাইয়েদ কুতুবের মহান অবদান হলো বিশাল আকারে লিখিত বিপ্লবী তাফসির ১. في ظلال القرآن (ফী যিলালিল কুরআন) শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহামূল্যবান এই তাফসির রচনা করে তিনি ইতিহাসের পাতায় হামেশা স্মরণীয় হয়ে থাকলেন। তাঁর বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে একাধিক উপন্যাস, বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় শিশু-সাহিত্য। ২. طفل من القرية (গ্রামের ছেলে), ৩. المدينة المسحورة (যাদু নগরী), ৪. مشاهد القيامة في القرآن যা আল-কুরআনে কিয়ামতের দৃশ্য নামে বাংলায় অনূদিত, ৫. التصوير الفني في القرآن বা আল-কুরআনে শিল্প সৌকর্য নামে বাংলায় অনূদিত, ৬. العدالة الإجتماعية في الإسلام (ইসলামে সামাজিক সুবিচার), এ মূল্যবান গ্রন্থটি ইংরেজি, ফরাসি, তুর্কি, উরদূ ও বাংলাসহ বিশ্বের বেশক'টি জীবন্ত ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ৭. معركة الإسلام والرأسمالية যা ইসলাম ও পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব নামে বাংলায় অনূদিত, ৮. السلام العالمي والإسلام যা বিশ্বশান্তি ও ইসলাম নামে বাংলায় অনূদিত, ৯. دراسات إسلامية (ইসলামি রচনাবলী), ১০. النقد الأدبي: أصوله ومنهاجه (সাহিত্য সমালোচনার মূলনীতি ও পদ্ধতি), ১১. نقد لكتاب المستقبل الثقافة যা ভবিষ্যতের সংস্কৃতি শীর্ষক একটি পুস্তকের সমালোচনা, ১২. كتب وشخصيات (গ্রন্থ ও ব্যক্তিত্ব), ১৩. نحو مجتمع الإسلامي (ইসলামি সমাজের দৃশ্য), ১৪. أمريكا التي راعيت যা আমার দেখা আমেরিকা নামে বাংলায় অনূদিত, ১৫. الأطياف الأربعة (চারজনের চিন্তাধারা), ১৬. خصائص التصويرالإسلامي ومقوماته, ১৭. الإسلام ومشكلات الحضارة, ১৮. في التاريخ فكرة, ১৯. تفسير سورة الشورى, ২০. تفسير آية الربا, ২১. معركتنا مع اليهود, ২২. مهمة الشاعر في الحياة, ২৩. الأشواك, ২৪. معالم الفجر, ২৫. الشاطئ المجهول, ২৬. ومنهاج قافلة الرفيق, ২৭. المستقبل لهذا الدين ইসলামের ভবিষ্যৎ নামে বাংলায় অনূদিত, ২৮. هذا الدين এবং সর্বশেষ সেই মহাবিপ্লবের গ্রন্থ ২৯. معالم في الطريق ইসলামি সমাজ বিপ্লবের ধারা নামে বাংলায় অনূদিত ইত্যাদি।[২]

---

১. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, আত-তাসবীরুল ফন্নি ফীল কুরআন, উৎসর্গপত্র দ্রষ্টব্য
২. (ক) সাইয়েদ কুতুব শহীদ, আল-কুরআনে কিয়ামতের দৃশ্য, ভূমিকা দেখুন
(খ) সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ফী যিলালিল কুরআন, খ. ১, ভূমিকা দেখুন

৪. কারা নির্যাতন ও শাহাদাত: ইখওয়ানুল মুসলিমূনের প্রথম সারির নেতা ছিলেন আল্লামা সাইয়েদ কুতুব শহীদ রহ. (খ্রি. ১৯০৬–১৯৬৬)।[৩] ১৯৫৪ সালে সাইয়েদ কুতুবকে গ্রেফতার করা হয়। জেলে তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়।

একই বছরের ১৩ জুলাই তারিখে যখন তাঁকে ১৫ বছর কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়, তখন তিনি এতোটাই অসুস্থ ছিলেন যে, সেই আদেশটি শোনার জন্য আদালতের কাঠগড়ায় পৌছতে পারেননি। ১০ বছরের ক্রমাগত শারীরিক ও মানসিক জুলুম-নির্যাতনের পর ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে তিনি জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন। তদানীন্তন ইরাকী প্রেসিডেন্ট আবদুস সালাম আরিফের ব্যক্তিগত অনুরোধে জামাল আবদুন নাসের তাঁকে সাময়িক মুক্তি দিলেও তাঁকে আবার গ্রেফতারের অজুহাত খুঁজতে থাকে।

তাঁর মুক্তির পর সমগ্র আরবদেশের ইসলামি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন দিকনির্দেশনা পাওয়ার জন্য তাঁর কাছে আসতে শুরু করলে জালেম সরকারের আর সহ্য হলো না। তারা ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে তাঁকে পুনরায় কারারুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সাইয়েদ কুতুবের গ্রেফতারের সাথে সাথেই শুরু হলো দলীয় নেতা-কর্মীদের ব্যাপক গ্রেফতার। লন্ডন থেকে প্রকাশিত ১৯৬৫ সালের ১১ অক্টোবর দৈনিক টেলিগ্রাফের রিপোর্ট মতে গ্রেফতারকৃতদের সংখ্যা ছিলো ৪০ হাজারেরও বেশি। এদের মধ্যে ৭০০ জন মহিলা সদস্যও ছিলেন। তাঁদের সকলের ওপর নাসেরকে হত্যা ও তার হুকুমতকে উৎখাতের অভিযোগ আনা হয় এবং তাঁর দুইজন সঙ্গীসহ তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

এ ব্যাপারে তাঁকে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা ভিক্ষার জন্য মিসরের জামাল আবদুন নাসের সরকার প্রস্তাব দিয়েছিল। তিনি তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে জবাবে বলেছিলেন, 'যারা বলে জালিমের কাছে ক্ষমা চাইতে, তাদের জন্য আমাকে অবাক হতে হয়। আল্লাহর কসম করে বলছি, আমার ক'টি শব্দ যদি আমাকে ফাঁসির দণ্ড থেকেও মুক্তি দেয়, তাহলেও আমি জালেমের কাছে ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত নই। আমি পরওয়ারদিগারের দরবারে এমন অবস্থায় হাজির হতে চাই যাতে তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন, আমি থাকি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।'[৪]

১৯৬৬ সালের ২৯ আগস্ট সকাল বেলায় মিসরের জালেম শাসক জামাল আবদুন নাসের সরকার সাইয়েদ কুতুব এবং তাঁর দু'জন সাথী মুহাম্মদ ইউসুফ ও মুহাম্মদ আবদুল ফাত্তাহ ইসমাঈলকে নির্মমভাবে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেয়। তিন মর্দে মুজাহিদ শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। (ইন্না ... রাজিঊন।) এভাবেই সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ফেরআউনের উত্তরসুরি জামাল আবদুন নাসের সরকার একদল মর্দে মুজাহিদকে হত্যা করে।[৫]

---

৩. (ক) সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, ইসলামী রেঁনেসা আন্দোলন, ঢাকা,
(খ) এ কে এম নাজির আহমদ, যুগে যুগে ইসলামী জাগরণ, ঢাকা
(গ) সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ফী যিলালিল কুরআন, খ. ১, ভূমিকা দেখুন
(ঘ) সাইয়েদ কুতুব শহীদ, আল-কুরআনে কিয়ামতের দৃশ্য, ভূমিকা দেখুন

৪. আশ-শাহীদ সাইয়েদ কুতুব, পৃ. ৫০; আল-কুরআনে কিয়ামতের দৃশ্য, পৃ. ২১

৫. (ক) সাইয়েদ কুতুব শহীদ, আল-কুরআনে কিয়ামতের দৃশ্য, ভূমিকা দেখুন

৫. ফী যিলালিল কুরআনের সূচনা: সাইয়েদ কুতুব শহীদ যতোদিন জীবিত ছিলেন কারাগারের বাইরে অথবা ভেতরে নিজেকে তিনি গবেষণায় মগ্ন রাখেন। ১৯৫১ সালের শেষদিকে মাসিক আল-মুসলিমূন পত্রিকায় তিনি তাফসির 'ফী যিলালিল কুরআন' লেখা শুরু করেন এবং সূরা আল বাকারার ১০৩ আয়াত পর্যন্ত তা ধারাবাহিকভাবে এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি উপলব্ধি করলেন যে, যদিও ধারাবাহিকভাবে মাসিক পত্রিকায় তাফসির প্রকাশ কুরআনের বাণীকে সীমিত সংখ্যক পাঠকের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটি কার্যকরী মাধ্যম, কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপ এবং তাঁর উদ্দেশ্য অনুযায়ী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে তা পৌঁছাতে অক্ষম। এ কারণে তিনি তাঁর তাফসিরকে পৃথকভাবে বই আকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে এই তাফসিরের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো এবং অক্টোবর ১৯৫২ থেকে জানুয়ারি ১৯৫৪-এর মধ্যে কুরআনের ১৪ পারাই খণ্ড আকারে প্রকাশিত হলো। তিনি কারাগারে থাকা অবস্থায় ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তাঁর তাফসিরের অধিকাংশ লিখেছেন এবং সংস্কার সাধন করেছেন। ১–৩২ সূরার ব্যাখ্যা লেখকের ১৯৫৪ সালে প্রথম জেলে যাওয়ার আগে লেখা। কারাগারে থাকা অবস্থায় (১৯৫৪–১৯৬৪) লেখক আরও ব্যাপক, গভীর ও মর্মস্পর্শী ভাষায় লেখনীর মাধ্যমে আবেদন করতে পেরেছেন। যা তাঁর তাফসিরের ৩৩–১১৪ সূরার ব্যাখ্যায় ফুঠে উঠেছে। তিনি ১–৩২ সূরার ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্তভাবেই প্রথমে লিখেছিলেন। পরবর্তীতে ১–১৫ সূরা পর্যন্ত পুনঃ লিখনে সক্ষম হন। বাকি ১৬–৩২ সূরাসমূহ আগের মতো সংক্ষিপ্তই রেখে দেন।[৬]

৬. নামকরণ এভাবে কেনো?: সাইয়েদ কুতুব শহীদ তাঁর বিশ্ববিখ্যাত তাফসিরের নাম রেখেছিলেন ফী যিলালিল কুরআন (কুরআনের ছায়াতলে)। তিনি তাঁর চাকুরিকালীন স্বদেশে এবং বিদেশে মুসলিমদের অবনতিশীল অবস্থা ও অমুসলিদের সমাজে পচন অবস্থা দেখে মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন, মুসলিমগণের অধঃপতনের কারণ কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। নামমাত্র মুসলিম হিসেবে কুরআনকে না জেনে, না বুঝে কুরআন থেকে দূরে সরে গিয়ে, কুরআন অনুযায়ী জীবন যাপন না করার কারণেই ব্যক্তিগত জীবনে, পরিবারে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে কুরআনকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারার কারণেই মুসলমানদের এ অধঃপতন দশা। এই অধঃপতন দেখেই সাইয়েদ কুতুব শহীদ বুঝতে পেরেছিলেন যে, কুরআনের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া আর উপায় নেই। তাই তিনি তাঁর তাফসিরের নাম রেখেছিলেন ফী যিলালিল কুরআন।[৭]

৭. এই তাফসিরের লক্ষ্য আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম সমাজ: সাইয়েদ কুতুব শহীদ সমাজের অধঃপতিত অবস্থা দেখে নির্ণয় করেছিলেন এই সমাজকে পরিবর্তন করতে হলে আধুনিক ভোগবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবসমাজকেই দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি

(খ) সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ফী যিলালিল কুরআন, খ. ১, ভূমিকা দেখুন
৬. (ক) সাইয়েদ কুতুব শহীদ, আল-কুরআনে কিয়ামতের দৃশ্য, ভূমিকা দেখুন
(খ) সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ফী যিলালিল কুরআন, খ. ১, ভূমিকা দেখুন
৭. (ক) সাইয়েদ কুতুব শহীদ, আল-কুরআনে কিয়ামতের দৃশ্য, ভূমিকা দেখুন
(খ) সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ফী যিলালিল কুরআন, খ. ১, ভূমিকা দেখুন

আধুনিক শিক্ষিত যুব সমাজের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তনের লক্ষ্যে ইসলামি আন্দোলনের সাথে যোগসূত্র গড়ে তোলার অবলম্বন হিসেবে এই তাফসির রচনা করেছিলেন। নবুওয়তী যুগের মক্কী জিন্দেগী ও মাদানী জিন্দেগীর আলোকে ইসলামি আন্দোলনকে সুসংগঠিত করার জন্য তিনি তাঁর এই তাফসিরে ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন এবং ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের দিশা প্রদর্শন করেছেন এবং এতে তিনি সফলকামও হয়েছেন। ফলে দেখা যায় ফী যিলালিল কুরআনের পাঠক ও ইসলামি আন্দোলনের কর্মী বাহিনী গঠনে এই তাফসির খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আরব বিশ্ব এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে ফী যিলালিল কুরআনের প্রভাব ব্যাপক।[৮]

৮. ফী যিলালিল কুরআনের উৎস: সাইয়েদ কুতুব শহীদ কুরআনের বিখ্যাত মুফাস্‌সির, ইসলামের দায়ী, আরবি ভাষা ও ইসলামি সাহিত্যের দিকপাল, ইসলামি আন্দোলনের নির্ভিক আপোষহীন নেতা ছিলেন। তিনি আল্লাহর পথের একজন বিপ্লবী মুজাহিদ। তাঁর ফী যিলালিল কুরআন অধ্যয়ন করে লাখো অন্ধ অন্তরদৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। বিশ্বের আনাচে কানাচে তাঁর এই তাফসিরের অসাধারণ সমাদর। তেজস্বী এই বাগ্মী পুরুষ আজকের যুগে কুরআনের পয়গামকে যথার্থভাবে বোঝার জন্য সম্পূর্ণ আধুনিক ও যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিকোণ থেকে তাফসির ফী যিলালিল কুরআন রচনা করে গেছেন। আধুনিক বিশ্বের জটিল পরিস্থিতি, আর্থিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক সমস্যাবলীর পরিষ্কার ইসলামি সমাধান পেশ করেন তিনি তাঁর এই অমর গ্রন্থে। এই তাফসির রচনা করতে গিয়ে কুরআন তাফসির করার মূল উৎস, যথা কুরআনের আয়াত দিয়ে কুরআনের তাফসির করা, তিনি যথাস্থানে যথাযথভাবে তা করতে পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। কুরআন তাফসির করার দ্বিতীয় উৎস হাদিসে রসূল সা.-কে উপস্থাপন যথাযথ স্থানে পরিপূর্ণ উদ্ধৃতিসহকারে ব্যাপকভাবে উপস্থাপন করেছেন। এতে তিনি সফলকাম হয়েছেন। কুরআন তাফসিরের তৃতীয় উৎস আসহাবে রসূলের সা. ব্যাখ্যা ও বর্ণনাকে যথাস্থানে উপস্থাপন করেছেন। কুরআন তাফসিরের চতুর্থ উৎস তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীগণের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা তিনি যথাস্থানে পেশ করেন। তাফসির করার পঞ্চম রীতি আরবি ভাষার বাকরীতি অবলম্বনে তাফসির করা। তিনি এ ব্যাপারেও সফলকাম হয়েছেন। তাফসির করার ৬ষ্ট উৎস হিসেবে স্বীকৃত تفقة في الدين অর্থাৎ সুস্থ, নিষ্কলুষ বিচার-বুদ্ধি ও দীনের যথার্থ বুঝ-বুদ্ধি দিয়ে অর্থাৎ কুরআন-হাদিসের আলোকে ইজতিহাদের ভিত্তিতে তাফসির করা। এতেও তিনি সফলতা দেখিয়েছেন।[৯] এ প্রসঙ্গে উপরে উল্লিখিত সূত্রগুলি সম্পর্কে আমাদের পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ যা বলেন, তা সংক্ষেপে নিম্নে পেশ করা হলো:

৯. ফী যিলালিল কুরআন রচনা ইসলামি নেযাম বাস্তবায়নে উৎসাহ প্রদান: সাইয়েদ কুতুব শহীদ শুধু মক্কী ও মাদানী যুগের পরিচালিত ইসলামি আন্দোলনকে জানতেন, বুঝতেন তাই নয়, তিনি উক্ত ইসলামি আন্দোলনকে উক্ত যুগের আলোকে উপস্থাপনেও সচেষ্ট ছিলেন। নবী সা. জীবনের মক্কী যুগের নিরব

---

৮. (ক) সাইয়েদ কুতুব শহীদ, আল-কুরআনে কিয়ামতের দৃশ্য, ভূমিকা দেখুন
(খ) সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ফী যিলালিল কুরআন, খ. ১, ভূমিকা দেখুন
৯. (ক) আল্লামা তকী উসমানী, উলূমুল কুরআন, খ. ২, অ. ১
(খ) আবদুস শহীদ নাসিম, আল-কুরআন আত-তাফসীর, পৃ. ১৪৪

আন্দোলন এবং মাদানী জীবনের ইসলামের সফল বাস্তবায়ন এই উভয় যুগেরই ব্যাপক জ্ঞান তাঁর বিখ্যাত তাফসির ফী যিলালিল কুরআনে প্রস্ফুটিত দেখা যায়। যেহেতু তিনি ফী যিলালিল কুরআনের অধিকাংশ খণ্ড কারাজীবনেই লিখেছিলেন, তাই তাঁর লেখায় আন্দোলনের আবেগ এত ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, পাঠক সেই প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে পারেন না। ফলে তাঁর তাফসিরের পাঠক সহজেই ইসলামি আন্দোলনের কর্মী হিসেবে অজান্তেই গড়ে উঠেন। এর প্রভাব সমগ্র আরব বিশ্বে দেখা যায়।

১০. ফী যিলালিল কুরআনের ভূমিকা: তাফসির করার ক্ষেত্রে গত শতকে কয়েকজন মুফাস্সির কুরআনকে বোঝার জন্য এবং কুরআন জানার পদ্ধতি হিসেবে নিজ নিজ তাফসিরুল কুরআনের ভূমিকা রচনা করেছেন। ফী যিলালিল কুরআনে সাইয়েদ কুতুব শহীদ একটি ভূমিকা পেশ করেছেন। এই ভূমিকায় তিনি কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি সহকারে কুরআন জানা, কুরআন বুঝা, কুরআন অধ্যয়ন করা এবং কুরআন পাঠকের ওপর কুরআনের প্রভাব, ইসলামি জীবন যাপনের প্রয়োজনীয়তা, ইসলামি সমাজের উন্নতি, ইসলামি সমাজে আধুনিক সভ্যতার কুপ্রভাব থেকে নাজাত পাওয়ার উপায়, শরীয়তে এলাহীর পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্যে তাকওয়া-পরহেজগারীর প্রয়োজনীয়তা, মানবীয় গুণাবলীর সাথে ইসলামি মূল্যবোধের সামঞ্জস্য বিধান করা এবং মানুষ যেহেতু নিজেও বিশ্বজগতের একটি অংশ তাই তার সৃষ্টি ও অস্তিত্ব, তার কাজ ও ইচ্ছা, তার নেকী ও ঈমান, তার ইবাদত এবং ইবাদতে নিষ্ঠা উপস্থাপন করেছেন।[১০]

১১. প্রতিটি সূরার পটভূমি রচনা: সাইয়েদ কুতুব শহীদ তাঁর বিশ্ববিখ্যাত তাফসিরে কুরআনের প্রতিটি সূরার একটি পটভূমি রচনা করেছেন। সেখানে তিনি আলোচ্য সূরাটি নিয়ে সূরার বক্তব্য, সূরার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, শানে নুযূল এবং উক্ত সূরা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা পেশ করেছেন।

১২. ইসলামি নিযাম বাস্তবায়নে উৎসাহ প্রদান: সাইয়েদ কুতুব শহীদ তাঁর তাফসিরে যে মৌলিক বক্তব্যটি উপস্থাপন করেছেন তাহলো, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর রাজ কায়েম করা, যাকে সাহিত্যিক পরিভাষায় ইসলামি নিযাম বলা হয়। ইসলামি নিযাম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সা. মক্কী জীবনে ও মাদানী জীবনে যে নিয়মতান্ত্রিক ইসলামি আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন সে আন্দোলনের অনুসরণে ইসলামি নিযাম কায়েমের আন্দোলন করার নেতৃত্বে তিনি আসীন ছিলেন। তিনি চাইতেন, আল্লাহর নবীর সা. অনুসরণে ও অনুকরণে মুসলিম উম্মাহ সমাজে ও রাষ্ট্রে ইসলামি নিযাম (ইসলামি জীবন ব্যবস্থা) কায়েম করুক। তাই ফী যিলালিল কুরআনের পরতে পরতে যেখানেই নবী জীবনের আন্দোলনের দিকগুলি আয়াত আকারে উপস্থাপিত হয়েছে সেখানে তিনি ইসলামি আন্দোলনের প্রাথমিক ইতিহাস ও তার প্রেক্ষিতে বর্তমান কর্মসাধনা কি হতে পারে তার রূপরেখা পেশ করেছেন।

১৩. বিষয়বস্তু ভিত্তিক অধ্যায়ে বিভক্তিকরণ: সাইয়েদ কুতুব শহীদ কুরআন পাককে ভালোভাবে বোঝার জন্য তাঁর বক্তব্যকে বিষয়ভিত্তিক এবং শিক্ষামূলক শিরোনামে ভাগ করেন এবং সূরার শুরু ও শেষ-এর সাথে যোগসূত্র কি তা নির্ণয় করেছেন। তাতে

---

১০. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ফী যিলালিল কুরআন, খ. ১, ভূমিকা দেখুন

পাঠকের জন্যে বিন্যস্ত আকারে কুরআনকে বোঝার, কুরআনের বিষয় জানার এবং কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করার সুবিধা হয়েছে।

১৪. যোগসূত্র নির্ণয়: সাইয়েদ কুতুব শহীদ তাঁর তাফসিরে সূরা সমূহের ও বাণী সমূহের পরস্পর যোগসূত্র কী তা নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন।

১৫. সূরার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা: ফী যিলালিল কুরআনে প্রতিটি সূরার শুরুতে ভূমিকা রচনা ছাড়াও প্রত্যেক সূরার যোগসূত্র, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ণয় করেছেন। কুরআন পাকের আয়াত থেকে কিছু শিখতে হলে ওই আয়াতের লক্ষ্য কি, উদ্দেশ্য কি, শিক্ষা কি এসব জেনে নেওয়া প্রয়োজন। তাই এই তাফসিরে এ বিষয়টি সুন্দরভাবে পেশ করা হয়েছে।

১৬. সংক্ষেপে শব্দগত ব্যাখ্যা: সাইয়েদ কুতুব শহীদ তাঁর তাফসিরে শব্দগত ব্যাখ্যা দীর্ঘায়িত করেন নি। যেহেতু শব্দ নিয়ে ব্যাখ্যা অন্যান্য অনেক তাফসিরে ব্যাপকভাবে দেওয়া হয়েছে। আয়াতের প্রয়োজনে শব্দের ব্যাখ্যা সংক্ষেপে যতটুকু দরকার শুধু তাই পেশ করেছেন।

১৭. ইসরাঈলিয়াত ত্যাগ: আমাদের পূর্ববর্তী নবী হযরত মূসা আ.-এর ওপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে এবং তৎকালীন অন্যান্য নবীগণের ওপর যে সহীফা নাযিল হয়েছে সবগুলো মিলিয়ে তাওরাত বা ওল্ডটেস্টামেন্ট নামে একটি ধর্মীয় কিতাব এখনও প্রচলিত রয়েছে। যেহেতু কুরআন পাকে প্রাচীন ২৪জন নবীর উল্লেখ আছে, সে কারণে আমাদের পূর্ববর্তী মুফাস্‌সিরগণ অনেক কাহিনীর বিষয়ে ইসরাঈলি বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। অনেকে আবার ইসরাঈলি বর্ণনাকে কুরআনের আয়াতের মানদণ্ডে যাচাই-বাছাই করে পেশ করেছেন এবং শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয় করেছেন।[১১] তাফসির ফী যিলালিল কুরআনে ইসরাঈলি বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয়েছে।

১৮. বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহের উদ্ধৃতি: সাইয়েদ কুতুব শহীদ কোনো কোনো আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহ উদ্ধৃত করে তাঁর ব্যাখ্যাকে যথাযথ ও সমৃদ্ধ করেছেন। আয়াতের বিষয়ের প্রয়োজনে যেখানে যেখানে হাদিসের বিশুদ্ধ বর্ণনার প্রয়োজন অনুভব করেছেন সেখানে তিনি পূর্ণ উদ্ধৃতি সহকারে তা পেশ করেছেন। কোনো কোনো আয়াতের ব্যাখ্যায় দেখা যায়, তিনি কুরআনের ভাষায় কুরআনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আলোচিত আয়াতের প্রাসঙ্গিক অন্য আয়াতগুলিও টীকায় জমা করে তাফসির করেছেন এবং কোনো কোনো আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে আয়াত সংশ্লিষ্ট হাদিসও ধারাবাহিকভাবে একের পর এক পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃতি সহকারে উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে একটি বিষয় খুবই আশ্চর্যজনক যে, তিনি দীর্ঘ ১০ বছর (খ্রি. ১৯৫৪–১৯৬৪) কারাগারে থাকাকালীন তাঁর তাফসিরের দুই তৃতীয়াংশ ব্যাখ্যা লিখেছিলেন। সেখানে উদ্ধৃত করার মতো এতো হাদিস তিনি কীভাবে সংগ্রহ করলেন

---

১১. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, ইহূদীয়াত ওয়া নাসরানিয়াত (উরদূ) দেখুন

এবং কীভাবে পেশ করলেন তাতে আশ্চর্য হতে হয়। তাতে মনে হয় তিনি শুধু হাফেযে কুরআনই ছিলেন না, হাফেযুল হাদিসও ছিলেন।[১২]

১৯. যুগ চাহিদার পূরণ: প্রত্যেক যুগে যতোই জ্ঞান ও বিজ্ঞানে মানুষ উন্নতি লাভ করতে থাকে, ততই তাদের যুগজিজ্ঞাসা নতুনভাবে প্রসারিত হতে থাকে। যুগের চাহিদা অনুসারে কুরআনের বক্তব্য কী একথা সকলে জানতে চায়। ফী যিলালিল কুরআনে তার তাফসিরকার চাহিদা অনুযায়ী যুগের প্রশ্নের কুরআনিক জবাব উপস্থাপন করেছেন। তাতে পাঠকের চাহিদা পূরণে তিনি সক্ষম হয়েছেন এবং এ তাফসিরের পাঠকগণও তাদের চাহিদা অনুযায়ী যুগ সমস্যার সমাধান পেয়ে তৃপ্ত হয়েছেন।

২০. পরিশেষে: 'ফী যিলালিল কুরআন' মহান মুফাস্সিরে কুরআন সাইয়েদ কুতুব শহীদের সুদীর্ঘ সাধনা ও গবেষণার এক অমর কীর্তি। আধুনিক জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত আরব ও আজমের প্রতিটি মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে কুরআনের অমর বাণী পৌঁছে দেয়ার তাগিদ রয়েছে এর পাতায় পাতায়। অতীতের সবকটি সেরা তাফসির গ্রন্থের পাশাপাশি এটি নিঃসন্দেহে আমাদের সাহিত্যে এক মহামূল্যবান সংযোজন, বরং এমন জীবনমুখী একটি গ্রন্থ এর পূর্বে কেউ রচনা করেননি।'[১৩]

তথ্য নির্দেশিকা

০১ শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া : *মুকাদ্দামাতুন ফী উসূলিত তাফসির*
০২ ইবনে কাসীর : *তাফসিরুল কুরআনিল আযীমের ভূমিকা*
০৩ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী : *ইসলামি রেনেসা আন্দোলন*
০৪ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী : *ইহুদীয়াত ওয়া নাসরানিয়াত* (উর্দু)
০৫ সাইয়েদ কুতুব শহীদ : *আত-তাসবীরুল ফন্নি ফীল কুরআন*
০৬ সাইয়েদ কুতুব শহীদ : *আল-কুরআনে কিয়ামতের দৃশ্য*
০৭ সাইয়েদ কুতুব শহীদ : *ফী যিলালিল কুরআন*
০৮ আল্লামা তকী উসমানী : *উলূমুল কুরআন*, খণ্ড ২
০৯ ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী : *তাফসিরুল কুরআন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*
১০ এ কে এম নাজির আহমদ : *যুগে যুগে ইসলামি জাগরণ*
১১ রফিউদ্দীন হাশেমী, সেলিম মনসূর খালিদ : *সাইয়েদ মওদূদী: হায়াত ওয়া আসার* (উরদূ)
১২ আবদুস শহীদ নাসিম : *আল কুরআন আত তাফসির*

১২. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০-৩৬১
১৩. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, প্রা' ক্ত, পৃ. ৩৬০

(১৩)

কুরআন ব্যাখ্যার পদ্ধতি

মুহাম্মদ মুখতার আহমদ

১. ভূমিকা

'তাফসির' (تفسير) শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, স্পষ্টকরণ, সহজিকরণ ইত্যাদি। কুরআনের তাফসির হলো কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। কুরআন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মূলনীতিসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে বলা হয় 'ইলমুত্ তাফসির'। যিনি কুরআনের ব্যাখ্যা করেন তাকে বলা হয় মুফাস্সির।

তা'বীল (تأويل) শব্দটিও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অর্থে ব্যবহৃত। ইমাম তাবারীসহ প্রাচীন মুফাস্সিরগণের অনেকেই 'তাফসির' ও 'তা'বীল' শব্দ দু'টিকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তবে কেউ কেউ বলেন: 'তাফসির' হলো কুরআনের বাহ্যিক অর্থের নাম আর 'তা'বীল' হলো গূঢ় বা অভ্যন্তরীণ অর্থের নাম। আবার কারো মতে, 'তাফসির' হলো শাব্দিক বিশ্লেষণ আর 'তা'বিল' হলো অর্থের বিশ্লেষণ।

২. কুরআন ব্যাখ্যার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে তাফসিরের ভূমিকা অপরিসীম। কুরআন 'স্বতস্পষ্ট', 'সাবলীল ও প্রাঞ্জল আরবি ভাষায় নাযিলকৃত' 'সকল বিষয়ের স্পষ্ট নির্দেশনা সম্বলিত :

كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم/ قرآنا عربيا غير ذي عوج/ ما فرطنا في الكتاب من شيءٍ/ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم

ইত্যাদিসহ অন্যান্য দলিল-প্রমাণের আলোকে কিছু লোক তাফসিরকে খাটো করে দেখার এবং এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকর করার চেষ্টা করেন। তিনটি কারণে কুরআন ব্যাখ্যার গুরুত্ব অপরিসীম :

ক. কুরআনের বক্তব্য স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হওয়া সত্ত্বেও এর ভাষাগত মান অত্যন্ত উঁচু এবং স্বল্প শব্দের ব্যবহারে ব্যাপক অর্থবোধক। ফলে যারা আরবি ভাষায় দক্ষ তারা ছাড়া অন্য কেউ এটি সহজে অনুধাবন করতে পারেন না।

খ. কুরআন স্বভাবতই সর্বত্র ও সবসময় প্রতিটি আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট ও সংশ্লিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করেনি। এজন্য একজন সুদক্ষ ব্যক্তিকেই সেটি খুঁজে বের করে নিয়ে আসতে হবে।

গ. কুরআনের কোনো কোনো শব্দের বহুবিধ অর্থ থাকতে পারে, যা একজন দক্ষ ব্যক্তিই নির্ধারণ বা নির্বাচন করে দেবেন যে, বর্তমান আয়াতে এটি এ অর্থে ব্যবহৃত।

অতএব সাধারণ মানুষের কাছে কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরাই একজন ব্যাখ্যাকারের দায়িত্ব। আর এটিই কুরআনের ব্যাখ্যার মূল উদ্দেশ্য হওয়ায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। আল কুরআনে এ কথারই ইঙ্গিত এভাবে রয়েছে :

هو الذي أنزل عليك الكتابَ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكّر إلا أولوا الألباب • (آل عمران: ٧)

৩. তাফসির শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

কুরআন ব্যাখ্যার সূচনা রসূলুল্লাহ সা.-এর যুগেই শুরু হয়েছে যখন তিনি সাহাবিদের সাথে বসে কুরআনের আলোচনা করতেন এবং ইসলামের বিবিধ বিষয়াবলী বর্ণনা করতেন। যদিও রসূলুল্লাহ সা. সব আয়াতেরই ব্যাখ্যা জানতেন, তবুও তিনি মাত্র কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা করেন এবং বাকি আয়াতসমূহ ব্যাখ্যাহীন রেখে যান।

তাঁর ব্যাখ্যাকৃত আয়াতসমূহের মধ্যে রয়েছে গায়েব (অদৃশ্য) বিষয়ক ও প্রশ্নোত্তর বিষয়ক আয়াতসমূহ। ফলে রসূলুল্লাহ সা. এরপর সাহাবাগণের যুগে ও তৎপরবর্তী যুগসমূহে তাফসির শাস্ত্র ব্যাপকতা লাভ করে। সাহাবাগণও কোনো কোনো আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেন, অথচ তাদের উপস্থিতিতেই কুরআন নাযিল হয়।

আর যেহেতু ব্যাখ্যার দাবি রাখে এমন সব আয়াতেরই ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ সা. ও সাহাবিদের থেকে পাওয়া যায়নি, তাই তাবেঈগণ ও তৎপরবর্তী জেনারেশন রসূলুল্লাহ সা. ও সাহাবায়ে কেরামের অন্যান্য বক্তব্য, তাওরাত ও ইঞ্জিলের তথ্য (ইসরাঈলিয়্যাত) ও ব্যক্তিগত যুক্তি-কিয়াসের উপর ভিত্তি করে কুরআনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

এই ধারা আজও একই গতিতে অব্যাহত রয়েছে। আজও তাফসিরের ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবি, তাবিঈ ও তাবে-তাবে'ঈদের বক্তব্যের পাশাপাশি ব্যক্তিগত যুক্তি-কিয়াসের উপর নির্ভর করা হয়।

তবে রসূলুল্লাহ সা.-এর পরবর্তী যুগসমূহে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ও মুসলিমদের বিভিন্ন দেশ জয়ের সাথে সাথে কুরআনের ব্যাখ্যার রীতি-পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গিরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। তারও পরে বিভিন্ন মাযহাব ও চিন্তাধারার উদ্ভব এক্ষেত্রে আরও নতুন মাত্রা যোগ করে। ফলে তাফসিরের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা এবং কখনো কখনো পরস্পর বিরোধী ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়।

৪. তাফসিরের প্রকারভেদ ও কুরআন ব্যাখ্যার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

তাফসিরকে তিনভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে :

ক. 'তাফসির বিল রিওয়ায়াহ্' যা 'তাফসির বিল মা'ছুর' নামে পরিচিত।

অর্থাৎ কুরআন, রসূলুল্লাহ সা.-এর হাদিস অথবা সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্যের আলোকে কুরআনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করা। কুরআনের কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে কুরআনের এতদসংক্রান্ত অন্য আয়াতসমূহের সহযোগিতা নেয়া। আর এটিই কুরআন ব্যাখ্যার সর্বোত্তম পদ্ধতি। অত:পর হাদিসের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে কুরআন ব্যাখ্যার দ্বিতীয় সর্বোত্তম পদ্ধতি। রসূলুল্লাহ সা. কে প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্যও তাই। নিম্নের আয়াতসমূহও সেদিকেই ইঙ্গিত করে:

١. إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله (النساء : 105)

٢. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة • (الجمعة : ٢٠)

٣. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزّل إليهم ولعلهم يتفكرون. (النحل :44)

٤. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون • (النحل : 64)

তাছাড়া রসূলুল্লাহ সা. নিজেও বলেছেন: ألا إني أوتيتُ القرآن ومثله معه (أحمد)

আল্লামা সুয়ূতী রহ. তাঁর গ্রন্থে রসূলুল্লাহ সা. প্রদত্ত কুরআনের ব্যাখ্যাসমূহ সূরা ভিত্তিক সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ কুরআনের সূরা আল বাকারার ১৮৭তম আয়াত وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر নাযিল হবার পর আদী বিন হাতিম রা. তাঁর বালিশের নীচে সাদা ও কালো সূতা রেখে ঘুমাতেন এবং আয়াতের বাহ্যিক অর্থ অনুসারে রাতের আঁধারে সাদা ও কালো সূতা আলাদা করতে না পারা পর্যন্ত সাহরী খেতেন। রসূলুল্লাহ সা. বিষয়টি জানতে পেরে মন্তব্য করলেন, তুমি তো মোটা বুদ্ধির লোক। যদি তুমি সূতা দু'টো এভাবে দেখে থাকো। আসলে এটি হচ্ছে রাতের অন্ধকার ও দিনের আলো।

R. Maston তার The Function of Hadith as Commentary on the Qur'an নামক বিখ্যাত গ্রন্থে কুরআন ব্যাখ্যায় হাদিসের নিম্নোক্ত ভূমিকার কথা উল্লেখ করেনঃ শানে নুযূল (নাযিলের প্রেক্ষাপট) ব্যাখ্যা, অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য শব্দের বিশ্লেষণ, রসূলুল্লাহ সা. ও সাহাবাদের জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কুরআনের বিধি-বিধানের প্রয়োগ, প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা, কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের উপর পর্যালোচনা-অনুসন্ধান, ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান ও কুরআনের সাধারণ বিধানের ব্যতিক্রমসমূহ উল্লেখ করা ইত্যাদি।

তৃতীয়ত: সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্যের আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যা করা। কারণ তাঁরা রসূলুল্লাহ সা. এর সময়ে উপস্থিত থেকে কুরআন নাযিল, নাযিলের প্রেক্ষাপট, রসূলের সা. বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ লক্ষ্য করেছেন বিধায় তাঁরা এতদ্বিষয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও অভিজ্ঞ। চার খলীফাসহ ইবনে মাসউদ রা., ইবনে আব্বাস রা., যায়েদ বিন সাবেত রা., উবাই ইবনে কা'ব রা., আবু মূসা রা. প্রমুখ সকলেই কুরআনের অসংখ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। ইবনে আব্বাসকে রা. তো তরজমানুল কুরআন (কুরআনের ভাষ্যকার) বলা হয়ে থাকে। হযরত ওমর রা. কুরআনের কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে কনিষ্ঠ ও অনুজ ইবনে আব্বাসের শরণাপন্ন হতেন।

তা ছাড়া তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের পর্যালোচনা এবং মতামতের ভিত্তিতে কুরআন ব্যাখ্যাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

খ. 'তাফসির বির রায়' বা তাফসির বিদ্ দিরায়াহ নামেও পরিচিত।

যদিও ধারণা করা হয় যে, এটি কুরআন, হাদিস ও সাহাবায়ে কিরামের বক্তেব্যের বিপরীতে শুধুমাত্র অনুমান ও ধারণা ভিত্তিক তাফসিরের নাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ইজতিহাদ ভিত্তিক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুরআন-সুন্নাহর স্পিরিট ভিত্তিক। তবে এ সুযোগের অপব্যবহার করে কেউ কেউ কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একান্তই মনগড়া পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন এবং মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মু'তাযিলা, দার্শনিক, আধ্যাত্মিক সূফী ইত্যাদি মতবাদের তাফসিরগুলো অধিকাংশই এরূপ। তাই 'তাফসির বির্ রায়' কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

- 'মামদূহ' বা প্রশংসনীয়, যা কুরআন-হাদিস ও এতদুভয়ের উপর ভিত্তিশীল।

- 'মাযমূম' বা নিন্দনীয়, যা শুধুমাত্র আন্দাজ-অনুমান নির্ভর। আর এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ সা. বলেন: من قال في القرآن بغير علم فقد تبوّأ مقعده من النار

অতএব যে 'তাফসির বির্ রায়' সুষ্ঠু ইজতিহাদ ভিত্তিক ও কুরআন-হাদিস এর স্পিরিটের আলোকে প্রদত্ত এবং ইসলামি শরিয়তের উদ্দেশ্য অনুযায়ী সেটি প্রশংসনীয় ও গ্রহণযোগ্য (মামদুহ) হিসেবে গণ্য হবে।

'তাফসির বির রায়'-এ সাধারণত নিম্নোক্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতাসমূহ লক্ষণীয়। এতে কুরআনের শব্দতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, আইনী মূলনীতিসমূহ, নাযিলের প্রেক্ষাপট ও আয়াতের সামষ্টিক পাঠ, কুরআনের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদিকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য, দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি ও সুবিধার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করা হয়ে থাকে এবং স্পষ্ট আয়াতসমূহকে বাদ দিয়ে অস্পষ্ট আয়াতসমূহ অপব্যাখ্যা করে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির সপক্ষে পরিচালিত করার প্রবণতা লক্ষণীয়।

গ. তাফসির বিল ইশারাহ

এটি হচ্ছে কুরআনের বাহ্যিক অর্থের (ظاهر القرآن) বাইরে আভ্যন্তরীণ অর্থের (باطن القرآن) আলোকে কোনো আয়াতকে ব্যাখ্যা করা। এ জাতীয় ব্যাখ্যা শুধু তাদের মাধ্যমে দেয়া সম্ভব যাদের অন্তর আল্লাহ তাআলা খুলে দিয়েছেন এবং তারা গভীর জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি নিয়ে কুরআন বুঝতে পারেন। ইবনে আব্বাস রা. কর্তৃক সূরা আল নাস্রকে রসূলুল্লাহ সা.এর ইনতিকালের ইঙ্গিত ও ভবিষ্যতবাণী হিসেবে উল্লেখ করা এরই অন্তর্ভুক্ত। অনেকেই এ জাতীয় তাফসির অস্বীকার করলেও হাফিজ ইবনুল কাইয়্যেম কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে এটিকে গ্রহণযোগ্য ও বৈধ বলে মত দেন।

- আয়াতের সরল অর্থের বিপরীত না হওয়া।
- অর্থটি শক্তিশালী ও সুস্থ হওয়া।
- আয়াতে এ অর্থের কিছুটা ইঙ্গিত থাকা এবং
- এই অর্থের সাথে আয়াতের সরল অর্থের কাছাকাছি মিল থাকা।

৫. তাফসির শাস্ত্রের মূলনীতিসমূহ

যুগে যুগে কুরআনের তাফসিরের বেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বিত হয়ে এসেছিলো:

ক. তাফসির সাধারণত কুরআন ভিত্তিক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রসূলের সা. হাদিস, সাহাবা ও তাবেঈদের বক্তব্য নির্ভর ছিলো। তবে এটি ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিলো আরবি ভাষাজ্ঞান, আরবদের বাকরীতি-পদ্ধতি, রসূলের সা. যুগের ঐতিহাসিক পটভূমি ও কুরআন নাযিলের প্রেক্ষাপট কেন্দ্রিক ব্যক্তিগত বিচার-বিশ্লেষণের উপর। এক্ষেত্রে ইসরাঈলিয়াতের ভূমিকা ছিলো বিশাল। যা ইহুদী ও খৃষ্টানদের অধিক হারে ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে আরো ব্যাপকতা লাভ করে।

খ. দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আগেকারকালে কুরআনকে অতীত জাতিসমূহের ইতিহাসের উৎস, গায়েব ও আখেরাতের জ্ঞানের আঁকর হিসেবে অধিকতর ব্যবহার করা হতো। তাই সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতিসহ অন্যান্য দিকগুলো বিশ্লেষণে কুরআনকে তেমন ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়নি, যার ফলে আজকের মুসলিমদের এ সব ক্ষেত্রে বহুবিধ প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

গ. ক্লাসিক্যাল তাফসির শাস্ত্রে আরব ও আরবদের তৎকালীন সীমিত সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন বেশি ঘটায় সেখানে কুরআনের চিরন্তন ও সার্বজনীন সভ্যতাগত বৈশিষ্ট্যের ব্যাপক পরিস্ফুটন ঘটেনি। ফলে তৎকালীন বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ক্ষেত্রসমূহ, যেমন অলঙ্কার শাস্ত্র ও ভাষাতত্ত্ব (Rhetorical & linguistic) কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ব্যাপকতর স্থান দখল করে নেয়, যা অন্যান্য ফলিত ও সমাজ বিজ্ঞানের শাখাসমূহকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

ঘ. প্রাচীন তাফসির গ্রন্থসমূহ ইতিহাস-বর্ণনা নির্ভর। যেমন-কুরআন কেনো, কোথায়, কিভাবে ও কোন অবস্থায় নাযিল হয়েছে ইত্যাদি। ফলে সেখানে কুরআনের শাশ্বত প্রায়োগিক দিকনির্দেশনা তেমন গুরুত্ব পায়নি। এজন্যেই প্রাচীন তাফসির গ্রন্থসমূহ ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। ইবনে কাসীর ও ইবনে জারীর আত্ তাবারীর তাফসির গ্রন্থদ্বয় এ জাতীয় তাফসির।

ঙ. 'কুরআন ও বিশ্ব'-এর সমন্বিত পাঠ দরকার। কারণ বিশ্বচরাচর পরিচালনায় প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতি (Natural Law) নামে আমরা যে শৃংখলা দেখতে পাই কুরআনের দর্শনও তার অনুরূপ। অর্থাৎ কুরআন ব্যাখ্যায় ঐশী জ্ঞান ও যুক্তিনির্ভর জ্ঞানের সমন্বয় ঘটাতে হবে। কুরআনের প্রথম নাযিলকৃত পাঁচটি আয়াতে 'পাঠ করো' সংক্রান্ত যে দু'টি আদেশ এসেছে তার একটি 'ঐশী বাণী', পাঠ সংক্রান্ত এবং অন্যটি 'বিশ্বচরাচর ও এর সম্পর্ক এবং বহুবিধ উপাদান' পাঠ সংক্রান্ত। সম্ভবত এ কারণেই কুরআন নাযিলের ধারাবাহিকতায় কুরআনকে না সাজিয়ে অন্যভাবে কুরআনকে সাজিয়ে সংকলন করা হয়েছিল। আর এই পদ্ধতির পাঠের মাধ্যমেই আমরা 'ঐশী' এবং 'যুক্তি' এতদুভয়ের মধ্যকার সেই বিধ্বংসী সংঘর্ষ ও বিতর্ক এড়াতে পারবো।

চ. কুরআনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি আভ্যন্তরীণ বিরোধমুক্ত এবং এর আয়াতসমূহ পারস্পরিকভাবে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুসমন্বিত, স্বতঃস্পষ্ট এবং পরস্পর পরিপূরক। অতএব কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে 'Topical Context' অর্থাৎ আয়াতকে বিশ্লেষণাধীন বিষয়ের আলোকে বুঝতে হবে' এ মূলনীতিকে যথাযথভাবে রক্ষা করতে হবে এবং এতেই কুরআনের তথাকথিত বিরোধ (تعارض) এড়ানো সম্ভব হবে। হযরত উমর রা. একবার ইবনে আব্বাসকে মুসলমানদের মধ্যকার বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি এই Topical Context বা শানে নুযূল-এর মূলনীতি সংক্রান্ত অজ্ঞতাকেই কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

ছ. নাস্‌খ (نسخ) সংক্রান্ত ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্মূল্যায়ন করে এর অপব্যবহার থেকে কুরআনের তাফসিরকে মুক্ত করা দরকার। মূলত নাস্‌খ-এর সাথে শুধু কুরআনের ব্যাখ্যাই নয়, বরং গোটা ইসলামি শিক্ষা-সভ্যতার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এটি এতোটাই ব্যাপকতর আকার ধারণ করেছে যে, আগেকার কালের আলেমগণের অনেকেই কুরআনের তথাকথিত তরবারির আয়াত (آية السيف)-এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী صبر/ الموعظة الحسنة/ لا إكراه/ لست عليهم بمسيطر জাতীয় সব আয়াত মানসূখ হয়ে গেছে বলে দাবি করেন। যেমন ইবনুল আরাবী ও ইবনে

সালমান মনে করেন, এ আয়াতটি মোট ১২৪ টি আয়াতকে, আর মুস্‌তাফা আবু যায়েদ বলেন, এটি মোট ১৪০টি আয়াতকে মানসূখ করেছে। আবার কারো মতে মদিনার আয়াতসমূহ মক্কার অধিকাংশ আয়াত ও তাহার বিধি-বিধানকে রহিত করে দিয়েছে। মুহাম্মদ আসাদ বলেন, নাস্‌খের প্রচলিত ধারণা আমাদের মনে একজন মানুষ লেখকের প্রতিকৃতি জন্ম দেয়, যে কিনা তার পাণ্ডুলিপির কোনো কোন অংশ পুনঃনিরীক্ষণের সময় সংশোধন করে নেন এবং এক বাক্যকে অন্য বাক্য দ্বারা পরিবর্তন করেন, যা আল্লাহর বাণীর সাথে সঙ্গতিশীল নয়।

জ. কুরআনের নির্দিষ্ট কোনো আয়াত অথবা সূরাকে কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কিত করে ব্যাখ্যা করা দরকার, যাতে আলোচ্য বিষয়টি একটি জীবন্ত রূপ পায়। আল্লাহ্ পাক বলেন :

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ • نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ • (القرآن الكريم، يوسف : 3-2)

ঝ. প্রতিটি সূরার আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্যকে আলাদা করে দেখিয়ে সেই ভিত্তিক তাফসির করা দরকার । অতীতের তাফসির গ্রন্থসমূহে সূরার প্রতিটি শব্দ ও আয়াত নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। (এমনকি শুধু বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম-এর ব্যাকরণগত বিষয়টি বুঝাতে সাত দিন পনের দিনের পর্যন্ত উক্ত আলোচনা হয়েছে)।

ঞ. বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে কুরআন তাফসিরের ক্ষেত্রে খোলা মন নিয়ে এগুতে হবে এবং কুরআনের বক্তব্যের সারমর্ম অনুসারে নিজের মতামত, সিদ্ধান্ত বা উপসংহার সাজাতে হবে।

ট. কুরআনের ব্যাখ্যাকে আধুনিক পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটের সাথে সম্পর্কিত করতে হবে এবং স্থান-কাল-পাত্র প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে কুরানের ব্যাখ্যার মাধ্যমেই বর্তমান সময়ের সমস্যার সমাধান দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, কুরআনে বর্ণিত অনেক বিষয় ‘স্থান-কাল-পাত্র ’ প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। নিম্নোক্ত আয়াতটিই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ • الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ • (القرآن ٨ : ٦٥-٦٦)

এ আয়াতের প্রাচীন তাফসিরমতে যুদ্ধে মুসলিম-অমুসলিমদের আনুপাতিক হার প্রাথমিক পর্যায়ে নির্দ্ধারণ করা হয়েছিল ১:১০। কিন্তু পরবর্তীতে মুসলমানদের মাঝে দুর্বলতাহেতু মহান আল্লাহ তাআলা ঐ অনুপাত কমিয়ে এনে ১:২ নির্ধারণ করেন। তাই যদি কোনো যুদ্ধে মুসলিম-অমুসলিম সেনাবাহিনীর অনুপাত ১:২ হয় তবে কোনো মুসলিম সেনাসদস্যের যুদ্ধের ময়দান থেকে কোনো অবস্থাতেই পলায়ন করা নিষিদ্ধ।

এটিই ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মত। আর বিংশ শতাব্দীতে সাইয়েদ সাবিক এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুসলিম সৈন্যদের দুর্বলতাকে সংখ্যায় সীমিত না করে তাদের সামগ্রিক সক্ষমতা ও শক্তির ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন:

'Weakness (mentioned in the above-mentioned verse) is not a matter of numbers alone. Therefore, it is allowed even in a one on one situation, that the Muslim flee if the enemy has a better horse, or sword, or a stronger body. Evidently this is the correct opinion.'

তাছাড়া সমসাময়িক বিশ্বে যুদ্ধ-বিগ্রহ সৈন্যসংখ্যার উপর ভিত্তি করে হয় না এবং শক্তি বলতে শুধু সৈন্যসংখ্যাকেই বুঝায় না, বরং সৈন্যসংখ্যা, সামরিক শক্তি, প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক উপাদানসমূহও এর অন্তর্ভুক্ত।

ঠ. কুরআন ব্যাখ্যার সময় কুরআনের পরিবর্তনশীল ও অপরিবর্তনশীল (Constant and Changeable) অংশগুলোকে আলাদা করে দেখাতে হবে। কারণ আল্লাহর বিধান (سنة الله) অনুসারেই পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান-পতন ঘটে। আর এসব বিধানের কতক হলো পরিবর্তনশীল আর কতক অপরিবর্তনশীল।

ড. কুরআনের ব্যাখ্যাকারীকে অবশ্যই কিছু শর্তাবলী পূরণ করতে হবে এবং কিছু যোগ্যতা ও গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে। যেমন ইসলামি জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা: আকীদা, আরবি ভাষা ও ব্যাকরণে দক্ষতা ইত্যাদি।

৮. মুফাস্‌সির হওয়ার যোগ্যতা

যিনি আল কুরআনের ব্যাখ্যা করতে চান তার মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তাবলী বিদ্যমান থাকতে হবে এবং তাকে বিশেষ কিছু গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে। যেমন :

ক. সঠিক আকীদা-বিশ্বাস: একজন মুফাস্‌সিরকে অবশ্যই সহীহ ইসলামি আকীদা-বিশ্বাসসম্পন্ন হতে হবে এবং এ বিষয়ে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। অন্যথায় সে কুরআনের অপব্যাখ্যা করে ভুল আকীদা প্রচার করতে পারে, যেমন খারেজী সম্প্রদায় করেছে।

খ. কুরআনের ব্যাখ্যা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কুরআন, হাদিস ও সাহাবি-তাবেঈদের বক্তব্যের আলোকে করতে হবে। তাই এ বিষয়গুলো সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

গ. আরবি ভাষা ভিত্তিক সকল জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, যেমন: علم النحو، علم الصرف وعلم البلاغة والفصاحة ইত্যাদি। কারণ আরবি ভাষায় নাহু, ছর্‌ফ্ ও বালাগাত ফাছাহাতগত পরিবর্তনের সাথে সাথে শব্দ বা বাক্যের অর্থের পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। তাইতো ইমাম মুজাহিদ রহ. বলেন :

لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إن لم يكن عالما بلغات العرب •

ঘ. ইলমুল কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল জ্ঞানের শাখা-প্রশাখায় যথেষ্ট পাণ্ডিত্য থাকতে হবে। যেমন ইলমুত তাওহীদ, শানে নুযূল, নাসেখ্-মানসূখ, ইলমুল কিরাআত ওয়াত-তাজবীদ ইত্যাদি।

ঙ. ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হ সম্পর্কে পাণ্ডিত্য থাকতে হবে। তাতে ভাষ্যকার ফিক্‌হী মাসআলা বর্ণনায় কোনো ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটানো থেকে রক্ষা পাবেন।

সমসাময়িক যুগের মুফাস্সিরদের আরো অতিরিক্ত তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে। যেমন:

০১. আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখার পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জন।

০২. প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত দার্শনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শনের সাথে পরিচিতি, যাতে এসব মতবাদ সম্পর্কে কুরআনী দৃষ্টিভঙ্গি এবং এসব বিষয়ে ইসলামি বিকল্প উপস্থাপন করতে পারা যায়।

০৩. যুগের সমস্যাদি ও সংকটসমূহ সম্পর্কে অবগতি, যাতে এসব সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এসব সংকট উত্তরণের কুরআনী উপায় প্রস্তাব করা যায়। كتاب المباني গ্রন্থকার এ দিকেই ইঙ্গিত করে বলেন :

والثالثة أن يكون عالما بأبواب السر من الإخلاص والتوكل والتفويض والإذكان الباطنة التي افترضها الله تعالى، وبالإلهام والوسوسة وما يصلح الأعمال وما يفسدها، وبآفات الدنيا ومعايب النفس، وسبل التوقي من فسادهما ليتأتى له تفسير الآيات المنتظمة لهذه المعاني •

৯. উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম জাতিসহ গোটা মানবতাকে শতভাগ কুরআনী দর্শনের আওতায় নিয়ে আসতে একটি বিশ্বজনীন ও শাশ্বত তাফসিরের একান্ত প্রয়োজন। এ তাফসির হবে 'ঐশী ও যুক্তি' এতদুভয়ের সমন্বয়ে। তবে তা অবশ্যই খামখেয়ালীপূর্ণ ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে হবে না। ড. আলওয়ানী-এর ভাষায় তা নিম্নোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্য সম্বলিত হবে :

1. Restricting it to the understanding of the obvious meanings of words.
2. Deducing concept implied by the obvious meaning of the words....
3. When the interpreter makes use of the intellectual, scientific and cultural resources of his own time and applies them to the ayat to see how compatible they are with the pointers of the Qur'an.

অর্থাৎ এ তাফসির 'শব্দের স্পষ্ট অর্থের' ভিত্তিতে হবে, শব্দের স্পষ্ট অর্থের আলোকেই কোনো ধারণায় (Concept) উপনীত হতে হবে। তবে এক্ষেত্রে কাজটি করবেন কোনো সুদক্ষ ব্যাখ্যাকার সতর্ক চিন্তা-ভাবনা, ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনা ও কুরআনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের আলোকে এবং ব্যাখ্যাকার তার যুগের সকল বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক উপকরণের ব্যবহারের মাধ্যমে এ তাফসির সম্পাদন করবেন।

কিন্তু যে তাফসির একান্তই ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে এবং যাতে আরবি ভাষার বৈশিষ্ট্য, মাকাছিদে শরীয়াহ, নাসেখ-মানসূখ, শানে নুযূল ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়নি এবং যাতে ত্রুটিপূর্ণ চিন্তা-গবেষণার প্রতিফলন ঘটেছে, অর্থাৎ আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে বিবেচনায় না এনে কোনো একটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে উপসংহার টানা হয়েছে এবং যেখানে ব্যাখ্যাকার কোনো বিশেষ মতবাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কুরআনের আয়াতকে ব্যাখ্যার প্রয়াস পেয়েছেন (যথা: বায়ানিয়্যা সম্প্রদায়, কাদিয়ানী সম্প্রদায়, বাতেনিয়া সম্প্রদায়, হাদিস অস্বীকারকারী সম্প্রদায় ইত্যাদি) তাদের তাফসির প্রত্যাখ্যাত হবে।

***